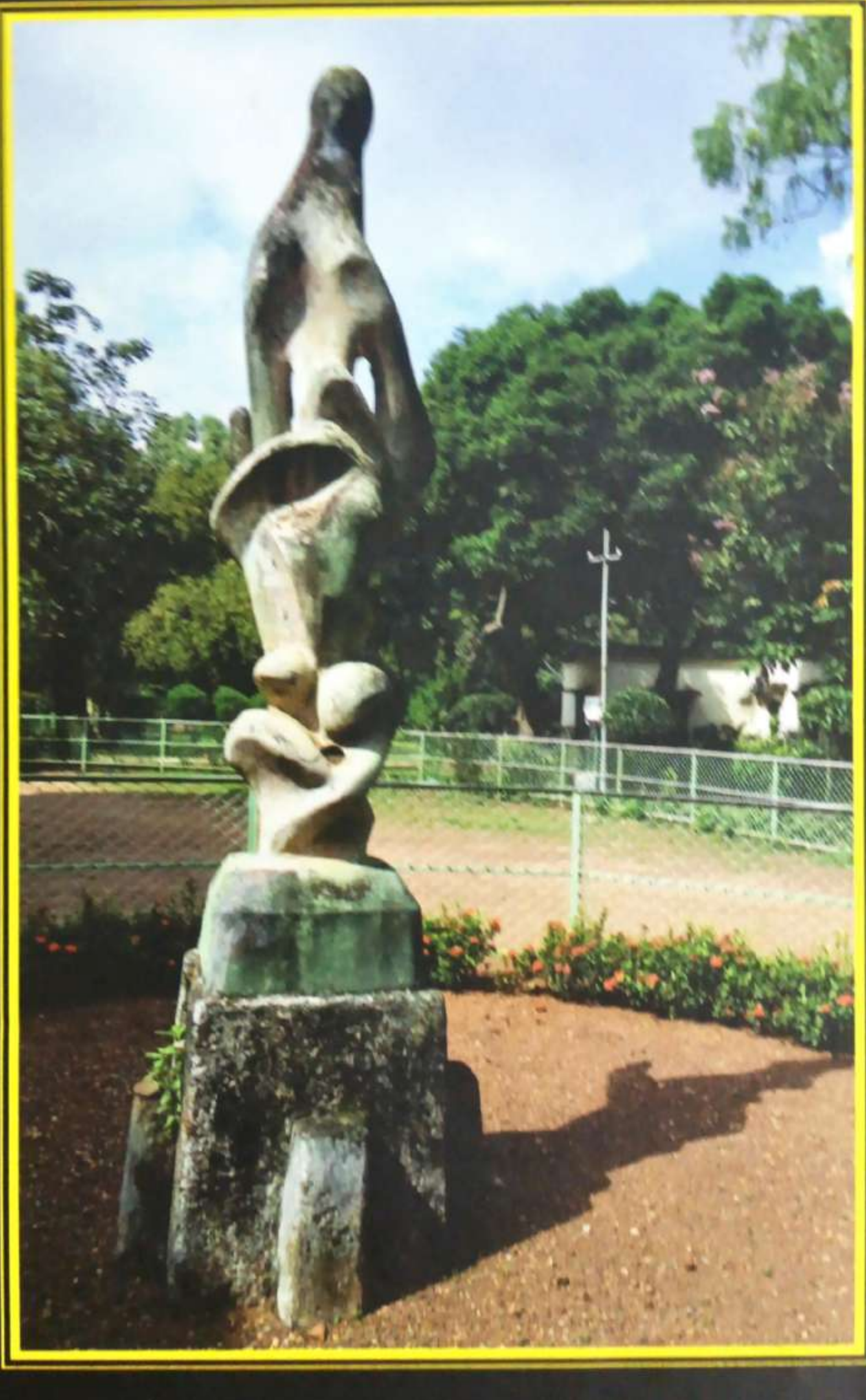
প্রসঙ্গ ঃ রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা



শিবপ্রসাদ বেইজ



প্রাপ্তিস্থান

দে'জ, দে বুক স্টোর, মহেশ লাইব্রেরী,
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, সংস্কৃত বুক ডিপো



প্রসঙ্গ : রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা

শিবপ্রসাদ বেইজ

তথাগত
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষা-৯৮৩০১৮৮৭২৪/(০৩৩) ২৩৫১ ৪৩৭৮
ই-মেল tathagatabama@gmail.com



Prasanga : Ramkinkar Beij
By Shibaprasad Beij

ISBN-978-93-87603-44-8

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪২৭, সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ : রামকিঙ্কর বেইজ।। **নামপত্রের রেখাচিত্র :** পূর্ণেন্দু পত্রী
গ্রাফিক্স ও অক্ষর যোজনা : রাকেশ ব্যানার্জী

প্রকাশক : অপর্ণা বসাক। তথাগত প্রকাশনী
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯
মুদ্রণ ঃ জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯

বিনিময় ঃ ২৫০ টাকা

উৎসর্গ পত্র

বন্দে যুগপুরুষোত্তম
শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম্

লেখকের অন্যান্য বই

কাব্যগ্রন্থ

কাগজকুচি

গদ্যগ্রন্থ

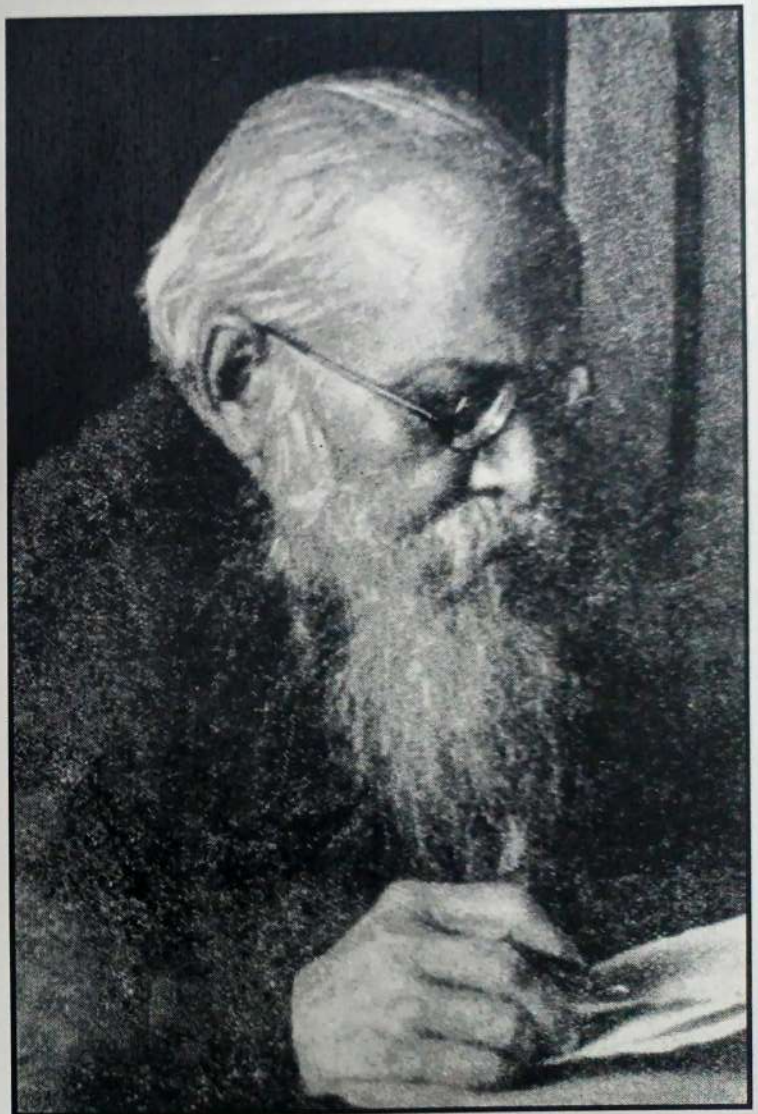
~~কী[illegible]র্মী~~ অপাংক্তেয় রামকিঙ্কর বেইজ



রামকিঙ্কর বেইজ ।। ১৯৭৮ সালে গৃহীত আলোকচিত্র



নন্দলাল বসুর সঙ্গে ছাত্র রামকিঙ্কর



প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



কাগজের ওপর ড্রয়িং



রবীন্দ্রনাথ ।। ভাস্কর্য



রামকিঙ্কর ও চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক



সৃজনরত রামকিঙ্কর



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। ভাস্কর্য



রামকিঙ্কর অনান্যদের সঙ্গে



রামকিঙ্কর ও রাধারাণী দেবী



সম্পূর্ণা বেইজ।। শিল্পীর মা (জলরঙ)



পুলিনদা (পেনসিল ড্রয়িং)



ভূ মি কা

রামকিঙ্করের শিল্প ভাবনা লেখার ধৃষ্ঠতা নয়, তবে বিভিন্ন বইতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকা রামকিঙ্করের শিল্পমানসিকতার নানান দিকগুলি নিয়ে বিভিন্ন গুণীজনের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা এবং রামকিঙ্করের শিক্ষা উপদেশ শিল্পবিষয়ক সুচিন্তিত ধারণার সাথে অনিবার্য ভাবে চলে আসা তাঁর মূল মাটি যাঁরা—অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্পচিন্তা, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও তাঁদের নতুন উদ্ভাবনার নানান বিষয়গুলি যদি এক পাত্রে আনা যায় এমন এক পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল রামকিঙ্করের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'কালজয়ী চিত্রী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর' বইটির প্রস্থনা চলাকালীন। অবশেষে সে ভাবনা বাস্তবায়িত হল বহুদিনের পরিশ্রমে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের নানান প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে। যদিও এ ধরনের কাজে বিশেষ যোগ্যতার দাবি করি না, তথাপি সহজ সাধ্য হলেও বহুবিধ তথ্য ও তত্ত্বের রত্নরাজি সমাহৃত এই বই শিল্পরসিক মহলে না হলেও নতুন শিক্ষার্থী এবং সাধারণ শিক্ষকদের কাছে যে এক উপাদেয় বিষয় হবে তা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন। রামকিঙ্করের জীবনে সৌভাগ্যের নানাবিধ আয়োজন যেমন উপর্যুপরি এসে দাঁড়িয়েছে তেমনি পরবর্তীতে দুর্ভাগ্যও তার বিবিধ প্রকার মারণাস্ত্র দিয়ে তাঁর পরিণত মস্তিষ্কের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত বিভিন্ন শিল্পবিষয়ক অভিনব খসড়াকে বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দাঁড়াবার আগেই চিরতরে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। রামকিঙ্কর অন্তরের অসীম কষ্ট নিয়ে বলেছেন : কটাই বা কাজ করেছি। হ্যাঁ বহু কাজই তিনি সহযোগিতার অভাব ও বিভিন্ন বাধায় সমাধান করতে পারেন নি। নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে তাঁর জীবনে অনুকূল বাতাস আর বইতে পারেনি। হাজার হাজার ছবি এঁকেছেন কিন্তু সে সব ছবি তাঁর জ্ঞানত ও অজান্তে হরির লুট হয়ে গেছে দিকবিদিকে। যে তিনটি স্কেচ খাতা ও চল্লিশটি খুচরো ছবি ভাইপো

দিবকরকে দিয়ে নিজের মা-বাবার সেবার ঋণ শোধ করেছিলেন রামকিঙ্কর, সে সবও মূর্খতা ও দূরদর্শিতার বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো মানুষের চতুর হাতে চলে যাওয়া ও পরে নানান হাতেও চলে যাওয়ার প্রমাণ হামেশাই মিলতে থাকায় বোঝা যায় রামকিঙ্করের নানান ভাবনা ও করণ কৌশলের ছবিগুলির একটি বিশিষ্ট ধারা তৈরি হওয়া কেন আর সম্ভব হয়ে উঠল না।

তবু সৌভাগ্যবশত যেগুলি তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে, সে সুর[redacted] মণিমুক্তায় কালজয়ী তকমা যে মহাকালই দেবেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর ভাস্কর্যের কথা তো বলাই বাহুল্য সেখানে তাঁর যুগান্তকারী ভাবনা এবং বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব পেরিয়ে চূড়ান্ত সাফল্যের শীর্ষে পৌছানোর তথা সিদ্ধিলাভের মানপত্র আগে ভাগেই নন্দলাল দিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর প্রগাঢ় মেধা ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যে ক'টা মূর্তিশিল্প আমরা পেয়েছি নিঃসন্দেহে তা বিশ্বের দরবারে অনন্য এবং অগ্রগণ্য।

রামকিঙ্কর নিজে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁর শিল্পের চরিত্র বাস্তবে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁধন হারা আবেগের হিল্লোলে ভেসে যাওয়া যেমন আছে, তেমনি আছে সংহত সংযত আবেগের অন্য এক শিল্পরূপ। রামকিঙ্করের ভিতরের তাগিদে জন্ম হওয়া অসামান্য সমস্ত রূপকল্পনায় মিশে আছে তাঁর জীবন ভাবনারও জগৎ। বলতে গেলে এই জীবনই ছিল তাঁর কাছে প্রথম কথা, যেহেতু সার্থকতার প্রশ্নে তিনি শিল্পে বাস্তবতার অনুপ্রবেশকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চিত্রে ও ভাস্কর্যে লৌকিক রূপটিই ছিল তাঁর কাছে পছন্দের। প্রাণশক্তির চেতনায় ভরপুর তাঁর ভাস্কর্যের এই নান্দনিক মূল্য প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজনীনতার আবেদনে পরিপূর্ণ। ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যোগ রেখেই দেশ ও কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়া তাঁর শিল্প যাবতীয় বিভেদসৃষ্টিকারী প্রচেষ্টাকে মূল্যহীন করে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে নিজের মধ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠার আত্যন্তিক চাহিদাই তাঁকে শিল্পের এই সার্বজনীনতার চূড়ায় এসে দাঁড়াতে সক্ষম করেছিল যেখানে ধ্যানই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন ও সর্বক্ষণের সাথী। কারণ তিনি জানতেন "ধ্যান ঠিক হলে ফিলিং হবে, ফিলিং যদি দুর্বল হয় তবে শুধুই নিরাশা।" পরমব্রহ্মের নিরাকার রূপের সুর ঐ পথ ধরেই তো উঠে এসেছিল তাঁর দু'হাতে। এও বুঝেছিলেন শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে রহস্যময়ী মিথ্যামায়া। কিন্তু জীবনকে তা ভরপুর ও সার্থক করে তোলে।

ফল্গুধারার মত সর্বগ্রাসী প্রগাঢ় আত্মনিমগ্নতা আত্মনিবেদনময়তা ছিল তাঁর শিল্প কাজের প্রতি। শিল্পের মাধ্যমে উপাসনায় রত থাকাটাই বুঝি তাঁর জীবন দেবতার অভিপ্রায়– এমনটাই ছিলো তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব। সেই অনুভবে জীবন দেবতাকেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিভিন্ন শিল্পকাজের ভিতর ঠারে ঠোরে নানান ভাবনায়।

রামকিঙ্করে তাঁর সহধ্যায়ী শান্তিনিকেতনের অন্য এক দুরন্ত প্রতিভা বিনোদ বিহারীর মতো ছবি আঁকার পাশাপাশি কলম ধরেননি তেমন, তথাপি বিভিন্ন বইতে তাঁর সাক্ষাৎকারের অমূল্য আলোচনা জ্ঞানগর্ভবাণী ও উপদেশ নির্দেশিকাগুলি আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম সত্যিকারের পথ-প্রদর্শক হয়ে থেকে যাবে বহুকাল– একথা সর্বজনসম্মত।

একবার আলোর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরনিঃসৃত প্রগাঢ় বোধের কথাই তাঁকে উপদেশ করেছিলেন : দেখ যখন যা পাবি দেখবি– একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরবি তারপর তাকে নিংড়ে ছিবড়ে করে হজম করে ছেড়ে দিবি।

রামকিঙ্কর চমকে উঠেছিলেন শুনে, সাংঘাতিক কথা। ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং পিছন ফিরে আর না তাকানোর আরেক উপদেশের মতো এই নির্দেশ বাণীকেও দৃঢ়ভাবে মনে রেখে পথ চলেছিলেন রামকিঙ্কর। কিন্তু যখন তিনি কোনো এক সাক্ষাৎকারের বৈঠকে তাঁর সাফল্যের অন্তরালের গোপন কথাটি–সেই অমূল্য উপদেশকেই তাঁর সরল অন্তরকরণে তুলে ধরলেন, 'জীবনে অনেক নারীই এসেছে।... কাউকে ছাড়িনি। ধরেছি হজম করেছি– হজম করার মানেটা তোমার বুঝবে না।'

তখন আমাদের ইনটেলেকচুয়াল শিল্পরসিক মহলের একাংশ ইচ্ছা করেই তা বুঝলেন না এবং তাঁকে চূড়ান্ত রকমের বিকৃত ও হেয় প্রতিপন্ন করার একটা ফিকির পেয়ে গেলেন এবং ফলও পেলেন ভালই। বস্তুত এ ভাবেই এবং অন্য নানা ভাবেই রামকিঙ্করের এক পচাগলা প্রতিকৃতি মানুষের সামনে ফলাও করে হাজির করা হয়েছে এবং আজও কৌশলে তা হয়েই চলেছে যা তিনি আদৌ ছিলেন না। এ হল রামকিঙ্করের প্রতি প্রতিশোধের তীরবৃষ্টি। তাঁর কিছু অপ্রিয় সত্যকথা বলার চরম শাস্তি।

রামকিঙ্কর তাঁর জীবদ্দশাতেই তা বুঝেছিলে। বুঝেছিলেন খুব ভুল হয়ে গেছে। হয়ত বা প্রভাবশালী মানুষদের কাজের ভুল ধরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বৈকি। তাই জীবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি বলেছেন, 'কী জানেন বয়েস হয়েছে অনেক এখন সেয়ানা হয়েছি। এটা বুঝেছি সব কথা বলতে নেই। বুঝলেন সত্যিকথাটা বলতে নেই। না না না।' যাঁরা ঘটাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিতে ও মননে ঐ স্রষ্টার অসীমত্বকে বোঝার চেষ্টাই করছেন। তাঁদেরই একজন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর চোঁয়ান কথা : মানুষটির সম্পর্কে যে ভাবে আমাদের ভাবনা কাজ করছে তা কেবলই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও হেয় করেই বলেছি। যতদিন কাটছে ততই বুঝছি সাধারণ মানুষের কাছে ঐ অসাধারণ মানুষটির সত্যিকারের ছবি এখনো পৌছায়নি। পরিশেষে এখানে একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই বা ভারতবর্ষের মানসিক কাঠামোকে

মনে রেখে জোর গলাতেই বলা যায় যে, এত দিনে নিশ্চয়ই রামকিঙ্করের সত্যিকারের ছবিটা পেয়ে যেতাম আমরা, যদি তিনি অভিজাত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসতেন।

যে অসামান্য সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় ফুটে ওঠা নানান শিল্পরূপের প্লাবনে ভারতবর্ষ ফের সঞ্জীবিত হল বিশ্বের দরবারে, আপন গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করায় সমর্থ হল– সেই বিস্ময়কর গাঢ় এবং জোরালো উৎকর্ষের বিপুল সমাবেশের আবিষ্কর্তা তথা স্রষ্টা রামকিঙ্কর কেন যে একটি সাধারণ জায়গা থেকে উঠে এল এমন একটি জিজ্ঞাসা এবং বিরাট খেদ ভারতবর্ষের অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মনের অন্তরালে থেকে যাবে চিরকাল।

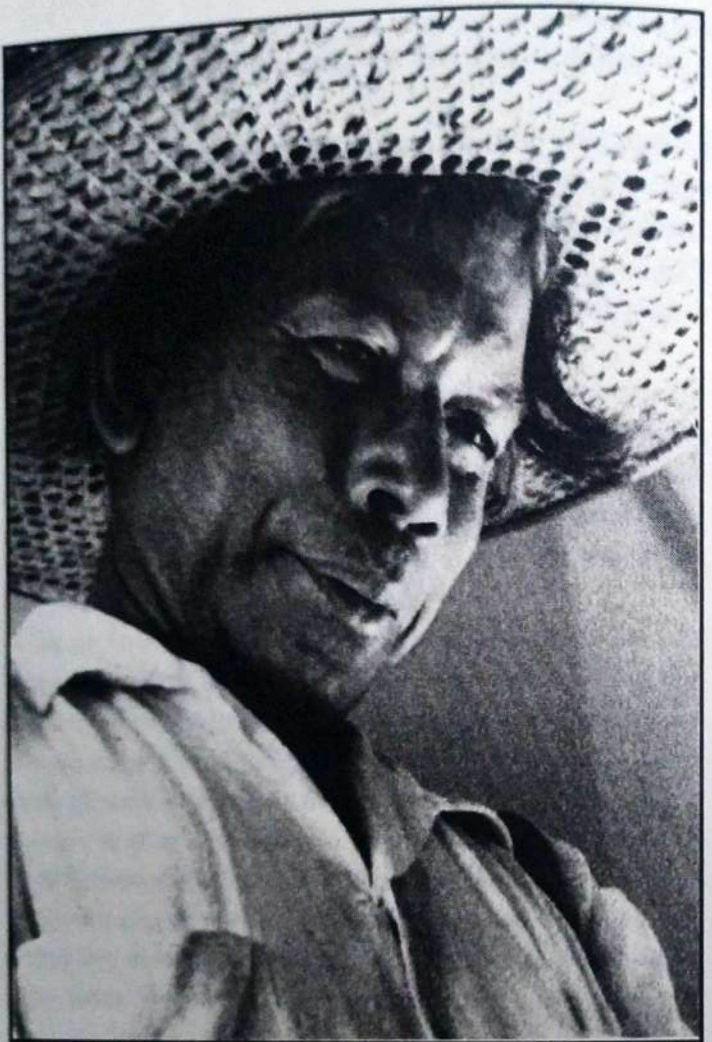
এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা সেখানে দেখতে পাবেন দারিদ্র্য কি ভাবে তাঁর প্রতি এক জঘন্য ও বিশ্বাসঘাতকতার যাবতীয় স্বচ্ছ প্রমাণাদি প্রকাশ্য আমজনতার সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও ন্যায় বিচার অভাবে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে হাহাকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহানুভূতি সহমর্মিতার সাহসী মুখ দেখতে পাওয়া দূরের কথা বরং পরোক্ষে অন্যায়কারীকেই সমর্থনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

এই বই লেখার কাজ যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক সুতনু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। রামকিঙ্করের শিল্প ভাবনার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বহুবিধ তত্ত্বের বিষয়ে অবগত হতে পেরেছি তাঁর কাছে। এ জন্য কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। সহযোগিতা পেয়েছি শিল্পী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও দুটি অসাধারণ শিল্প বিষয়ক নানান তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহারে সমৃদ্ধ অমূল্য বই পেয়ে। বই দুটি হল– অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এবং বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত 'চিত্রকথা'। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁকেও। বই প্রকাশ করা বিশেষত ছবির বই প্রকাশ করা বর্তমানে কঠিন বিষয়। তবু তথাগত প্রকাশনী যে সাহস নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বিশেষত জয়শ্রী প্রেসের কর্ণধার শ্রীকান্ত বসাক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানালে ছোট করা হবে তাই সে ব্যাপারে বিরত থাকছি।

বইটি শিল্প শিক্ষার্থী ও শিল্পানুরাগী পাঠ করে উপকারে এলে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে মনে করি।

শিবপ্রসাদ চৈত







শিল্প-সঙ্গীত ও সাহিত্যে সুর বা ছন্দের এক বিশেষ দিক রয়েছে। শিল্পী, সঙ্গীতকার, সাহিত্যিক নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ছন্দের যে ইমারত গড়ে তোলেন, পাঠক দর্শক বা শ্রোতা সেই ছন্দের অবগাহনে তৃপ্তি লাভ করেন এবং নিজের অজান্তে পথ চলার ক্ষেত্রে একটা নিটোল ভারসাম্যের দিকে এগোতে থাকেন। সুর ছন্দহীন মানুষ যন্ত্রের মতো। সেখানে সে ক্রমশ দেবভাবকে হারিয়ে পশুভাবের দিকেই চলে যায়। ফলে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে সমাজ তথা দেশে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে হিংসা-বিদ্বেষ-শঠতা-ক্রুরতা-খলতা-দাঙ্গা-রাহাজানি, খুন-ধর্ষণ প্রভৃতি নানান বিকৃতির বিপুল সমারোহ। বিপরীতে এই সুর-তাল-লয়ের অনুশীলনে পড়ে একটা মানুষ মানুষ্যত্বের তথা মহত্বের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হতে পারে যার উদাহরণ আমাদের দেশে মোটেই নগণ্য নয়।

আজকের এই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যাপী মানুষ্যত্বের বিপর্যয়ের দিনে যথার্থ শিল্প ও সাহিত্যের অনুশীলন একান্ত জরুরী– কেন না যথার্থ সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনে ভালোবাসা সৌভ্রাতৃত্ব, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মত মানবিকগুণের বিকাশ ঘটতে পারে আশা করা যায়। শিল্পী বিনোদবিহারী বলছেন– 'শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য সমগ্র ভাবে সমাজের হৃদযন্ত্র রূপে কাজ করছে। এগুলিকে নষ্ট করে দিলে সমাজ জীবনে মনুষ্যত্ব লোপ পাবে। ব্যক্তি জীবন মমত্বহীন যন্ত্রে পরিণত হবে।' রামকিঙ্কর বলেছেন– 'মানুষ বেঁচে থাকে পেট এবং মন নিয়ে কিন্তু পেটের কথাই খালি যদি ভাবো তবে মনের কথাটা বাদ পড়ে যাবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না। পশু হয়ে যাবে।'

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে রূপশিল্প, সঙ্গীতশিক্ষা ও কথোপকথন শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আর সে জন্যই রবীন্দ্রনাথ কেতাবী বিদ্যার পাশাপাশি সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিল্প-সাহিত্য উৎসব ইত্যাদিকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সূচনা করেন। দেখা যায় যে, শিল্পী, সঙ্গীতকার ও সাহিত্যিকরা সমাজের সংবেদনশীল মানুষ। সমাজের প্রতি তাঁদের একটা দায়বদ্ধতার বোধ অনুভব করে থাকেন তাঁরা। ফলে সমাজের দুঃখ, গ্লানি, হতাশা ও নিগ্রহের ব্যাপারে তাদের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে; নিজেকে তার সাথে একাত্ম বোধ করেন। তাই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের কাজের দ্বারা সেই সব বিকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ফলে সমাজের পরিবর্তন আসে মানুষের রুচির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা সমাজের কোনো সমস্যারই সুরাহা করেন না। তাই সমাজ জীবনে এই সুস্থ সংস্কৃতির মূল্য অপরিসীম। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের রুচি বদল হয়। সমাজেরও পরিবর্তন হয়। সমাজ পরিবর্তনে শিল্পীর ভূমিকা আছে এবং থাকা উচিত।' আরো বলেছেন 'দাঙ্গা দেশভাগ ও মন্বন্তর যুদ্ধ যেখানে যত মানুষের প্রতি অপমান শিল্পীকে আন্দোলিত করবেই। রবীন্দ্রনাথ বারবার আন্দোলিত হয়েছেন। যে কোনো মহান শিল্পীই হবেন। শিল্পীর উচিত তাই আলোর কথা ক্লেদ উত্তীর্ণ জগতের জীবনের কথা ঘোষণা করা।'

রামকিঙ্কর তাঁর সারাজীবন ব্যাপী তাই-ই করে গেছেন। তাঁর শিল্প আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে সমাজের ব্রাত্যজনেরা। দীন দরিদ্র বুভুক্ষু মানুষজন। তাঁর করা অন্নপূর্ণা সিরিজ বা দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি ছাড়াও অন্যান্য নানা ছবিতে বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মরত দারিদ্রসীমার নিচের মানুষজনদেরই পরিলক্ষিত হয়। তেমনি দেখা যায় সিমেন্ট কংক্রিটেও– যেখানে তাঁরা কেউ ধান ঝাড়ে, কলের বাঁশি শুনে ছুটে যায় অথবা দিনাবসানে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফেরে। এছাড়া বড়ো মাছ ছোট মাছকে গিলে খাচ্ছে, হাঁড়ি কাঠে বলি দিতে ছাগলকে টেনে নিয়ে যায় যেখানে দারিদ্র্যপিষ্ট দুর্বলদের প্রতি নিপীড়নও বোঝাতে তিনি ছাগলের মুখের বদলে মানুষের যন্ত্রণাকাতর মুখাবয়ব বসিয়েছেন।

বাঁকুড়ার থাকাকালীন কংগ্রেস নেতা অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন ছবি আঁকা, লেখা, পোস্টার ছাপানো এসব কাজে যুক্ত ছিলেন রামকিঙ্কর। দেশ স্বাধীন হলে মানুষ পেট ভরে দু-মুঠো অন্ন, পরনের কাপড় ও থাকার ঘর পাবে, এমনটাই ছিল তাঁর নিশ্চিত ধারণা। অনিলবরণের নির্দেশ ছিল তাঁর শিল্পকাজের মধ্য দিয়েই দেশের কাজ করা। তিনি বলেছেন 'আসলে অনিলবরণ বলেছিলেন– আমি নিজে তো বুঝেই ছিলাম, আমি বাবা আর্টিস্ট,

রাজনীতির লোক নই। আমার কাজ ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া। দেশের কাজ আমাকে যদি করতে হয় আমার কাজের মধ্যে দিয়েই করতে হবে।'

'কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনোত্তর কালে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচেনি। জীবনের উপান্তে এসে তিনি তীব্র হতাশা ও মর্মব্যথা প্রকাশ করে বলেছেন 'কত প্রাণ গেলো ফাঁসি কাঠে, গুলিতে-জেলে, পচে দ্বীপান্তরে। খালি হয়ে গেলো কত মানুষের বুক। কী হলো শেষ পর্যন্ত। বলো দেখি কী হলো!'

তাই তিনি তাঁর জীবনব্যাপী ওই সব দরিদ্রসীমার নিচে বেঁচে থাকা অর্ধমৃত বুভুক্ষু ও নিরন্ন মানুষদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার কথা তাঁর শিল্পাঙ্গনে বেছে নিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন শিল্পরীতির মাধ্যমে তাঁদের দুঃখ-হতাশা, নিপীড়ন-হাহাকার, আর্তি ও ক্ষোভকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশের আমাদের সমবন্টনের ভাবনা ও বিভিন্ন জাতিগত বিদ্বেষ, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বা গর্জে উঠেছেন তাঁর নানান ছবিতে ও কংক্রিটের কাজে। তিনি বলেছেন– 'আশপাশে যাদের দেখেছি তাদের সুখ দুঃখের কথাই বলেছি। সারা জীবনের কাজে।' উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নামক ছবিতে অত্যাচারী কংসের তলোয়ারের সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়– যার সামনে অসহায় এক গর্ভিনী নারী। বিদ্যুতের তীব্র ঝলক ও হাড় কাঁপানো আকাশ ফাটানো মেঘের গর্জনের মাঝে এক আকাশ ভয়ের চিহ্ন মুখে মেখে কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেবের ত্রস্ত পলায়ন, পায়ে তাঁর অসীম শক্তি ভর করেছে যেন ঐ মহাদুর্দৈবকে পরাজিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'এখনও কৃষ্ণ জন্মাচ্ছে কারাগারে। এখনও তেমনি তেড়ে আসছে কংস, বসুদেব পালাচ্ছে ভয়ে, দেবকী বন্দী। ওটাকে একালেরই ছবি বলতে পারো।' রামকিঙ্কর নিজেও রবীন্দ্র পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত জীবনে বহু নিগ্রহ ও অপমানের শিকার হয়েছেন।

সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়ার রামকিঙ্করের এই ইম্প্রেশনিজম ও এক্সপ্রেশনিজম অন্তর্ভূক্ত ছবির নির্মাণ। এইরকম প্রতিবাদী রামকিঙ্করের মুখ আমরা দেখতে পাই উত্তরায়ণে সিমেন্ট কংক্রিটে করা পম্পা সরোবরে মাৎস্যন্যায় ভাস্কর্যে। সেখানে একটি বড়মাছ ছোট মাছকে গিলে খাচ্ছে– বা দুর্বলের প্রতি সবলের এক মর্মন্তুদ প্রতীকী ভাস্কর্য। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেই এই ভাস্কর্য নির্মাণ হলেও দ্ব্যর্থবোধক ভাবনার এ কাজে উপরোক্ত কথাও বলে। তিনি এই ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বলেছেন– লোকটিকে সারাজীবন চেঁচাতেই হয়েছে চারদিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, হিজলি তারপর দেখো বাইরেও কত অঘটন। আফ্রিকায় এখানে ওখানে। ওঁর কথা কান দিচ্ছে না কেউ। রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পাননি তেমন। দূরে দূরেই থেকেছেন, তবে প্রখর দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁকে। অনুভব করেছেন অনুসরণ করেছেন দূর থেকে একলব্যের মত তাঁকে আদর্শ মেনে

নিয়ে। তাঁর আদর্শ শিরোধার্য করে আর পিছন ফিরে তাকাননি কোনোদিন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন– 'দেখিস না য়ুরোপ কেমন বড় কাজ করে, বেশ জোর প্রকাশ পায় তাতে।' একথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নজনকে তাঁর চিঠিপত্রেও লিখেছেন 'বড়ো করে আঁকা, জাপানে কেমন বড়ো করে আঁকো বেশ জোরালো তুলিতে।'

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ মাথায় রেখেই রামকিঙ্কর বড় বড় কংক্রিটের ভাস্কর্য আশ্রম প্রাঙ্গণের অনেকাংশই ভরিয়েছেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় আরও অনেকগুলি বড় কাজের পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করতে পারেননি নানান বাধা ও অসহযোগীতার কারণে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তৎকালীন 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাঁকুড়ার মানুষ, রামকিঙ্করকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাবার পথ বাতলে চিঠি লিখেছিলেন। বাঁকুড়ায় একটি সভার কাজে এসে রামকিঙ্করের আঁকা ছবি তাঁর নজরে এসে পড়ার পর। সেই চিঠি নাকি রামকিঙ্কর বাসে চড়ে দামোদরের চুনপোড়া ঘাটে এসে কিছুটা হেঁটে ও কিছুটা নৌকায় নদী পেরিয়ে দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছে রেলগাড়িতে চড়ে খানা জংশনে নেমে গাড়ি পাল্টে লুপ লাইন ধরে বোলপুর। সেখান থেকে হেঁটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচার্য আশ্রমে পৌঁছান। সেটা ছিল ১৯২৫ সাল। রামকিঙ্কর তাঁকে নন্দলালের কাছে নিয়ে গেলে নন্দলাল তাঁর ছবি দেখে হতবাক। বলেছিলেন 'তুমি তো সব জান, এখানে আর শিখবে কী? তবু এসেছ যখন দু-তিন বছর থাকো।'

এর পরবর্তী কোনো একসময়ে ছাত্র রামকিঙ্করের রিলিফের কাজে দক্ষতা দেখে নন্দলালের বুক কেঁপে গিয়েছিল। সেটা ছিল কালোবাড়ির দেয়ালে মাটি দিয়ে মূর্তি করার কাজ। আচার্য নন্দলাল দুপুরবেলা ছাত্র বিনোদবিহারীর স্টুডিও ঘরে এসে উপস্থিত। বলেছিলেন 'বিনোদ গিয়ে দেখো রামকিঙ্কর মাটির কাজ করছে। তার হাতের dexterity দেখে বুক কেঁপে যায়। এ কি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।'

১৯১৯ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২০ সালের নন্দলাল কার্যভার গ্রহণ করেন। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি কাশীনাথ দেবলের অধীনে মূর্তিকলার অনুশীলনও শুরু হয়েছিল সেখানে। রামকিঙ্কর স্মরণ করেছেন, 'কলাভবনে একসময় মূর্তিগড়ার কাজ হয়েছে দেবলদা ছিলেন, শুনেছি তিনি মূর্তি গড়তেন।' ১৯২৫ সালে যখন রামকিঙ্কর গিয়ে পৌঁছান তখন এই কলাভবনটি সদ্য ফোটা ফুলের মতো পাপড়ি মেলেছে। এই সময় থেকেই কলাভবনের নতুন পর্যায় শুরু হয়। জয়পুরের নরসিংলালকে দেওয়ালে ভিত্তিচিত্র নির্মাণের জন্য আনা হয়। নন্দলালের আতিথ্যরূপে শিল্পী দেবীপ্রসাদ এসেছিলেন। তিনি ছাত্রদের মূর্তি

নির্মাণের উপদেশ দেওয়ার সাথে ল্যানটেরি রচিত (Lantery) বিখ্যাত মডেলিং বইটি তাদের দেখতে বলেন। কায়রোতে পরিচয় হওয়ার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ভিয়েনার লিজা ফনপট নামে মহিলা ভাস্কর আসেন। তিনি আমের্চার তৈরি ও ছাঁচ নেওয়ার কাজ হাতে কলমে শেখাতেন। তাঁর একটি হাতের কাজ জগদীশ বোসের বাস্ট বোস ইন্সটিটিউটে আছে। লিজা ফনপটের বিদায়ের পর আসেন ফরাসী শিল্পী মিস মার্গারেট মিলওয়ার্ড। তিনি বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রঁদার বেলজিয়াম শিষ্য বুরদেলের শিষ্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছেই মূর্তি গড়া ও ছাঁচ নেওয়ার কাজে রামকিঙ্কর পারদর্শী হয়েছিলেন। রামকিঙ্কর বলেছেন ইংলণ্ডের মেয়ে– ইয়া লম্বা। ওঁর রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা এখানেই করা। এই মূর্তি বিষয়ে রামকিঙ্করের উক্তি– 'খেটেছেন। আন্তরিক চেষ্টাও আছে। কিন্তু কোথাও পৌঁছল না শেষ পর্যন্ত। আসলে মিল ওয়ার্ডের সে ক্ষমতাই নেই।'

লিজা ফনপট ও মার্গারেট মিলওয়ার্ড দু'জনের কাছেই রামকিঙ্কর করণকৌশল শিখেছেন ও শাগরেদি করেছেন। মিলওয়ার্ড চলে গেলে আসেন বের্গম্যান নামে ইংরেজ ভাস্কর। মাটির টালিতে তিনি রিলিফের কাজ শেখাতেন। এই সময় স্টেলা ক্রামরিশ এসেছিলেন। রামকিঙ্কর স্টুডেন্ট থাকাকালীন তাঁর দ্বিতীয়বার আসা। তিনি আর্টিস্ট নন। আর্ট ক্রিটিক। খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর লেকচারের ক্লাসে শিক্ষক ছাত্র সকলেই উপস্থিত থাকবেন অবশ্য এমনটাই অবশ্য পালনীয় নির্দেশ ছিল রবীন্দ্রনাথের। চেকোশ্লোভিয়ান এই অতিথি অধ্যাপিকা ১৯২০ সালে প্রথম আসেন। পশ্চিমী নব্যশিল্পের বিভিন্ন আন্দোলনের বিষয় অবহিত করান কলাভবনের শিল্পীদের। ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। ক্রামরিশের বক্তৃতায় ইম্প্রেশনিজম ও কিউবিজমের বিশদ আলোচনা থাকত। তাঁর আদর্শ ছিল পোস্ট ইম্প্রেশনিজম যুগের শিল্পীরা। শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন 'স্টেলা ক্রামরিশ লেকচার দিয়েছিলেন সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে– তাতে ডাডাইজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম সবই ছিল। 'রামকিঙ্কর বলেছেন প্রথম যখন আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে তখন আমি ছিলাম না। বিনোদবাবুরা ছিলেন পরে আবার যখন এসেছেন দেখেছি কথাও হয়েছে'। রামকিঙ্কর কি ক্রামরিশের বক্তৃতা শুনেছেন? তবে বিনোদবিহারীর সাথে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতার সম্পর্কের দৌলতে ক্রামরিশের বক্তৃতা ছাড়া পাশ্চাত্যের শিল্পঅঙ্গনের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য ও নানান ইজমের বিষয় এবং স্টাইল-টেকনিক-ট্রিটমেন্ট ও এপ্লিকেশন বিষয়ে অবহিত হন তাঁর কাছেই। কেন না বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর ও নন্দলালের শিল্প বিষয়ক আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের কথা রামকিঙ্করের জবানী থেকেই জানা যায়। বিনোদবিহারী অধ্যায়নে পটু ছিলেন। পাশ্চাত্যের শিল্প জগতের শিল্প পটভূমিতে

কী পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ভারতবর্ষে কী ধরনের ভাবনাচিন্তা বা প্রয়োগ হচ্ছে সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকায় আধুনিকতার বহু বিষয়ই তিনি জানতে পেরেছিলেন।

সে প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের সাথে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। আচার্য নন্দলালও থাকতেন। সে সব হত যোগীনের চা-দোকানে লাল চায়ে চুমুক দিতে দিতে। রামকিঙ্কর বলেছেন— 'বিনোদবাবু শিল্পতত্ত্বের বই পড়ে তাদের ভাবনা চিন্তা, তারা কি করতে চাইছে তার সারমর্ম আমাকে বোঝাতো, পড়ে শোনাতো আবার মাষ্টার মশাই বিনোদবাবু এবং আমার মধ্যে তর্কাতর্কিও হত। এইসব রীতির কথা শোনা ও মন দিয়ে তাদের কাজের ছবি দেখার পর নিজেকেই প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম মনে করে ছবি এঁকেছি। শুধু শিল্পের জন্যই শিল্প এই ছিল যার শেষ কথা সেই একনিষ্ঠ শিল্পসাধক রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবন ও বিশ্বভারতীর বড় লাইব্রেরিতে বহু বিদেশী ছবির বই দেখছেন। নিবিড় অধ্যয়ন করেছেন, বুঝে নিয়েছেন শিল্পের মূল বক্তব্য তথা সারসত্যকে এবং এর সাথেই নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করার প্রেরণা ও উপায় পেয়ে গিয়েছে। তাঁর পুঁথিগত বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা হল বাঁকুড়াতে ঠেলাঠেলি করে মেট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছি। কিন্তু তা একাডেমিক নয়। ইচ্ছে মতন পড়তাম। আরো বলেছেন আচার্য বসু মহাশয়ের উপদেশ ছিল— কলাভবনে ছবির বইয়ের অনেকগুলি আলমারী থাকতো সে সব ভালো করে দেখতে বলতেন তাছাড়া হ্যাভেলের লেখা বইগুলি পড়বার জন্য নিয়মিতভাবে ইংরাজির প্রফেসার জাহাঙ্গির বকিল সাহেবের কাছে পড়তে বলতেন। সে হতো সন্ধ্যের সময়। তাছাড়া বড় লাইব্রেরিতে আমার নিজের পছন্দ মতন পড়তেম। ইংরাজি ছাড়া রুশিয়ার ইংরাজি অনুবাদ। ইংরাজির মধ্যে তখনকার সময় বার্নাড শ'র বইগুলি আমার বেশি পছন্দ হত।

রামকিঙ্করের জীবনে বিদেশী অধ্যাপিকা-অধ্যাপক বা শিল্প সমালোচকের সংসর্গ, তাঁদের কাজ দেখা, আলোচনা শাগরেদী করা ও বিদেশী নানান ছবির বই দেখার মধ্যে দিয়ে শিল্পী মানসিকতার এক উচ্চভূমিতে আরোহন করতে পেরেছিলেন ঠিকই তথাপি আচার্য নন্দলালের ঘনিষ্ট সান্নিধ্য তাঁর চিত্রবিদ্যার নানান পদ্ধতি শেখা, শিল্প বিষয়ক নানান জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, আলোচনা ও অবনীন্দ্র ধারার বিশেষত ওরিয়েন্টাল আর্টের বহু বিষয়ের জ্ঞান হাতে কলমে তাঁর কাছেই তিনি আয়ত্ত করেন। ছবির জগতের অঙ্কন কৌশলের অন্তরাত্মাটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ করে নন্দলালকে শান্তিনিকেতন কলাভবনের জন্য নিয়ে এলে ১৯২০ সালে নন্দলাল কলাভবের কার্যভার গ্রহণ

করেন। নন্দলালের গুরু অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা সরকার আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ গিলার্ডির কাছে ছয়মাস জলরঙ ও প্যাস্টেলের কাজ শেখেন এছাড়া সে সময়ের কলকাতার নামাজাদা অয়েল পেন্টার মিঃ পামারের কাছে একাডেমিক রীতি অনুযায়ী দু-বছর শিক্ষা করেন। জাপানী শিল্পের তাৎপর্য আয়ত্ত করেন জাপানী শিল্পী ওকাকুরার কাছে। ওকাকুরা সে সময় স্বামী বিবেকানন্দের অতিথি হয়ে এসেছিলেন। ওকাকুরার সাথে ঠাকুর পরিবারের স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রতনপল্লীতে রামকিঙ্করের প্রতিবেশী হৃষীকেশচন্দ্র মহাশয়ের 'আমার প্রতিবেশী রামকিঙ্কর' প্রবন্ধে রামকিঙ্করের বলা একটা ঘটনার কথা স্মরণে এসে যায়। ঘটনাটি এইরকম : অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতীর আচার্য হয়ে এসেছেন। প্রায়ই কলাভবনের বারান্দায় এসে বসেন। তাঁর সাথে ওয়াল ছবি বিষয়ে কিছু কথোপকথন চলে এইরকম—

—'কিঙ্কর তুমি ওদের (কলাভবন ছাত্র-ছাত্রীদের) ওয়াশের কাজ শেখাও না কেন?'

—'ও আর শিখে কী হবে।'

—'তুমি হয়তো নিজেই ভালো পারো না শেখাবে কি করে।'

—'না পারি।'

—'ঠিক আছে আজ তোর সাথে আমার কম্পিটিশান হয়ে যাক।'

এরপর একটি দোলন চাঁপার ঝাড় রোজ এক ঘন্টা করে তিনদিন আঁকবেন স্থির হল। নন্দবাবু বিচারক। তিনদিন পর রামকিঙ্করের ছবিখানা হাতে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বলছেন— 'বাঃ বেশ হয়েছে। আমাকে হারিয়ে দিয়েছিস।' হাসিতে ভেঙে পড়ে মাস্টার মশাই নন্দলালকে ডেকে বললেন— 'ও নন্দ ও আর (তুমি) দেখবে কি? ও আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তৎকালীন শান্তিনিকেতনের এমন এক ঘরোয়া ও নিবিড় শ্রদ্ধা ভালবাসা স্নেহমিশ্রিত রম্য মধুর পরিবেশের সাক্ষাৎ পাই যেখানে আমাদের মনের কোণে মহত্ব শব্দটিরই অনুরণন শোনা যায়। যাই হোক আবার আগের কথায় ফিরে আসি।

কলকাতা আর্ট কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে ইংরেজ হ্যাভেল ১৮৯৬ সালের ৬ জুলাই যোগদান করেন। এর আগে তিনি মাদ্রাজে অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতবাসীর শিল্পীরুচিকে জাগ্রত করতে তিনি নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে ছবি আঁকার সাথে হ্যাভেলের কাছে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে হ্যাভেলের ভারতবাসীর রুচি পরিবর্তনের চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের সহায়তায় সার্থকতা পায়। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের শিল্পবোধ

এ রসবোধকে জাগিয়ে তুলেছেন যার একটা বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেশী ও বিদেশী অঙ্কনরীতির মিশ্রণে এক প্রাণবন্ত রূপ। শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন– 'বর্ণের কাব্যরে ফুটে ওঠা রূপ'। শিক্ষাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা ছিলেন নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভেঙ্কটাপ্পা, অসিত হালদার, হাকিম মহম্মদ, শৈলেন্দ্রনাথ দে, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার ও সমিউদ্দিন প্রমুখেরা। রামকিঙ্করের গুরু নন্দলাল ছিলেন তাঁর যথার্থ উত্তর সাধক। ছাত্র হিসেবে নন্দলাল অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর বর্ণের চাইতে রেখাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐতিহ্য ও পরম্পরার কথা ভেবেছেন। তিনি তাঁর রচনায় ছোট বা বড়তে একটা বিরাটত্বের রূপ আনতেন। জাপানি শিল্পী কম্পু আরাই-এর কাছে কালিতুলির কাজ অভ্যাস করেছেন নন্দলাল। তাঁর রচনাতে ইজিপ্ট অ্যাসিরিয়া, চীনা ক্যালিগ্রাফী ও প্রাচ্যশিল্পের বিভিন্ন উপাদান দেখা যায়। রচনার মধ্যে মৌলিকতা ও পরম্পরা থাকবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থাকবে এটাই ছিল তাঁর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য। তিনি বর্ণের উজ্জ্বলতা ও গভীরতা বিষয়ে সচেতন থাকতে বলতেন। এজন্য মৌলিক রচনায় নিয়ম বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের ছবির পাশে উজ্জ্বল রঙের ফুল, কচি বা শুকনো পাতা, ঘাসের কলা রেখে দিতেন যাতে তারা রঙ ও রেখার তরতাজা ভাবের প্রতি সচেতন হয়।

রামকিঙ্কর বলেছেন– 'অতবড় একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি আমার সৌভাগ্য। শিল্পী হিসেবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। অবন, স্কুল অব আর্ট যা বলা থাকে, তার সবচেয়ে সার্থক ধারক। এতবড়ো পেন্টার, এতো নিখুঁত স্ট্রোক, প্রায় সমস্ত ছবির বিষয় বা ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র, যেমন ল্যান্ডস্কেপ, একেবারে গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেক্টার নিয়ে ওঁর ছবি। এই সাদামাটা সুরটাই আমাকে তীব্র টানে। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশে ক্যারেক্টারই যে খুব সাধারণ তা অনেকটা নন্দলালবাবুর পরোক্ষ প্রভাব।'

বিশাল শিল্পব্যক্তিত্বের অধিকারী অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল তাঁর বিপুল গ্রহণ ক্ষমতায় বিরাটত্বের জায়গায় পৌঁছে ছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর সহজাত প্রতিভায়। সে সবই তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। নন্দলাল তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শিখিয়েছেন, 'গাছের সঙ্গে গাছ, জলের সঙ্গে জল, সাঁওতালের সঙ্গে সাঁওতাল বনে না যাওয়া পর্যন্ত এদের চিত্ররূপ কৃত্রিম হতে বাধ্য। রামকিঙ্কর শুনেছিলেন সে কথা মন দিয়ে– এর সত্যতা তাঁর কাজের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি আরও বলতেন– 'স্মরণে রেখো শুধু বুদ্ধিগত পরীক্ষা বা টেকনিকের মারপ্যাঁচ দিয়ে সার্থক সৃষ্টি কখনো হতে পারে না।' এছাড়া তিনি বোঝাতেন 'শুধু মাত্র প্রকৃতি বা কেবলই জ্যামিতির অনুশীলনে সার্থক শিল্পরূপ সৃষ্টি করা যায় না।' পরবর্তী

কালে তাই কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ্চাত্যের কিউবিজমকে অনুকরণ নয় পরন্তু আত্মীকরণ করেছিলেন এবং শিক্ষন করেছেন এক্সপ্রেশনিজমে। ধ্যানের জগতের মতই ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধির জগৎকেও যে জানতে ও চিনতে হবে–রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এনাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝে তিনি ছাত্রদের মধ্যে এনাটমি চর্চার প্রবর্তন করেন এবং নিজেও চর্চা শুরু করেন। রূপের বিচিত্রগতি ও স্থাপত্য সুলভ নির্মাণই ছিল তাঁর সৃষ্ট শিল্পের বৈশিষ্ট্য। বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি, নন্দলাল প্রথম জীবনে স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর সহজ সরল ব্যবহারে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেই তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রামকিঙ্কর লিখেছেন– 'শিক্ষক হিসাবে তিনি স্বাধীন চিন্তার কখনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। যেটা যার অভিরুচি, সেটারই উৎসাহ দিতেন এবং সেইভাবে নিজেকে ভাবিয়ে তার গলদ, কোথায় স্বাদের অভাব ঘটেছে সেটাই বোঝাতেন। তর্ক-বিতর্ক অনেক হত। আবার পর মুহূর্তে বন্ধুর মতো ব্যবহার থাকতো। সেজন্য আমরা বারবার ঠকেছি তাঁর কাছে।'

আরো লিখেছেন– 'মঞ্চশিল্পে তাঁর অভিনবত্ব দেখে একদিন আমি অবাক হয়েছিলাম।... তাঁর পরিকল্পিত রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চও সাজসজ্জা আমার মনে একটি সৌন্দর্যবোধের বেদনা জাগিয়েছে।' নন্দলালের মঞ্চসজ্জা অনুকরণ ও অনুসরণ করে রামকিঙ্করও পরবর্তী সময়ে মঞ্চশিল্পে সৌন্দর্যবোধ ও নানান কিউবিক ও এ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনা বিষয়ে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন– সেকথা আমরা সুখেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের 'মঞ্চশিল্পী রামকিঙ্কর' প্রবন্ধ থেকে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি।

যাই হোক রামকিঙ্করের গুরু নন্দলালের শিল্পপ্রতিভা বিষয়ে লিখতে গিয়ে তাঁর বিশালতার থৈ পাওয়া যায় না। শিল্পী রবি পাল রামকিঙ্করের এক ছাত্র লিখেছেন– 'নন্দলাল জীবনে বহু জিনিস দেখেছিলেন বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছবিতে যেমন গ্রীক, মিশরীয়, বাইজানটাইন, গথিক প্রভৃতি শিল্পশৈলীর সূক্ষ্ম প্রভাব দেখতে পাই তেমনি আর একদিকে চীন-জাপানের করণ কৌশল বিষয় নির্বাচনের গোপন রহস্য খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।'

নন্দলালের এই বহুমুখী শিল্প-ব্যক্তিত্ব রামকিঙ্করকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনিও তাঁর ছবি ভাস্কর্যে বহু বিষয় ও বৈচিত্রের সমারোহ এনেছেন। মূর্তি গড়া বিষয়ে রামকিঙ্কর নন্দলালের কাছে একটি মহান উপদেশ পেয়েছিলেন যা রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মনে রেখেছেন দেখা যাবে। তাঁর ঐ বাণীটি হল– 'মূর্তি হচ্ছে একটি স্রোতের ধারে ঘূর্ণির মতন– ঘুরে ঘুরে আর শেষ হচ্ছেই না। দেখতে দেখতে আর একটা ঘূর্ণি শুরু করে।'

রামকিঙ্করের মূর্তিশিল্পগুলি প্রকৃত অর্থেই রসিক দর্শককে অবিরাম ঘোরাতেই থাকে। রামকিঙ্করের কাজের প্রতি নন্দলালের একটা বিশেষ আস্থা ও সমর্থন ছিল। তিনি বলতেন– 'জানি নৃত্যের ছন্দ আয়ত্ত করা হাঁটা থেকে অনেক উঁচুস্তরের জিনিস। আমি বলব, আগে কয়েক পা সোজা হেঁটে দেখাও। তারপরে মেনে নেব তুমি খোঁড়া নও, সত্যিই নৃত্যে পারদর্শী। কিঙ্করের কাজে হাঁটাও আছে আবার নাচের ভঙ্গীও আছে।'

রামকিঙ্কর পরিবেশের চারপাশের জীবজন্তু মানুষজনের ড্রইং এতটাই আয়ত্ত করেছিলেন যার উদাহরণ দিতে গেলে দু-ধারে বাঁশের মাথা দড়ি বেঁধে তার উপর হাঁটা, ছোটা বা নানান কসরত দেখানোর পারদর্শী কোনো পেশাদার খেলোয়াড়ের কথা বলতে হয়। তাই নন্দলাল কারো কোনো কাজের মধ্যে ড্রইং-এর অভাব আবার ডিসটরনের প্রভাব দেখলে বলতেন, 'আগে কিঙ্করের মতো আঁকতে শেখো, চোখ তৈরি হোক, তারপর যা কর মেনে নেব।'

বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর নন্দলালেরই দুই পৃথক শাখা। শিল্পী রবি পাল লিখেছেন– "কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় রবীন্দ্রনাথকে সাংস্কৃতিক প্রেরণার পীঠস্থল করে শান্তিনিকেতনের শিল্পসঙ্গমে নন্দলাল, বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর মিলিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারী নন্দলালের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনটি পৃথক বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়ে অনন্তে গিয়ে মিশেছে।' গুরু নন্দলালের রচনা বিষয়ে বিনোদবিহারীর বক্তব্য– 'নন্দলালের সৃষ্টিতে বৈচিত্রের অভাব নেই। উপকরণ আঙ্গিক উপলব্ধি তিনের সংযোগ নানা পথে নানাভাবে প্রবাহিত হয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।' তাঁর শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেছেন– 'পাঠক্রমরূপ কাঁচি দিয়ে নন্দলাল গাছের ডালপালা কেটে সব গাছকে এক ঢঙে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করেননি। রামকিঙ্কর তাঁর 'মাস্টারমশাই' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্পস্রোত নানাভাবে নানারূপে এসেছে তীব্রভাবে কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়। প্রাচ্য ও ভারতীয় ঐতিহ্য শিল্পের ভাব যেন তাঁর মজ্জাগত ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী এঁরা সকলেই ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তথাপি তাঁরা পাশ্চাত্য প্রভাবকে আত্মীকরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র আসা ছাত্র-ছাত্রীরা যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠুক, তাদের সক্রিয় চেষ্টার মধ্য দিয়ে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। তিনি নিজে কখনও কারুর কাজে নাক গলাতেন না। অন্যদের করাটাও পছন্দ করতেন না। এমন কি নন্দলালকেও বলতেন সকলকে নিজের মত করে কাজ করতে দিও। আশ্রমটাতো ওদেরই। এখানে ওরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। রামকিঙ্কর স্মরণ

করেছেন একথা। সারাজীবন রামকিঙ্কর সে কথা মেনেই স্বাধীনভাবে কাজ করে গেছেন, অন্যকেও তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একমাত্র যক্ষযক্ষী ছাড়া তিনি কখনো অর্ডারি কাজ করেননি। ছাত্রছাত্রীদের নিজের মত করতে বলতেন আর মাঝে মধ্যে গিয়ে একটু আধটু যা দেখিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভাবনা নন্দলাল মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন ও সেইমত যেটুকু না দেখালে নয় ততটুকুই মাত্র বুঝিয়ে দিতেন এবং নিজে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছাকাছিই সৃষ্টিশীল কোনো কাজে নিমগ্ন থাকতেন। রামকিঙ্কর স্মরণ করেছেন আমরা কাজ করতাম নিজেদের ইচ্ছে মতন। যখন যা ইচ্ছে হতো তাই করতাম। নন্দবাবু নিজের কাজ করতেন। একবার করে ঘুরে যেতেন। বিশেষ কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতেন না। ঐ শুধু দেখে যাওয়াটাই। মাঝে মাঝে বলতেন, কিন্তু চেঞ্জ-টেঞ্জ বিশেষ কিছু করতেন না। সাজেস্টও করতেন না। সে রকম কিছু দেখাতেন টেখাতেন বলে তো মনে তো মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ একটু আধটু যা না বললেই নয়, তা কি আর বলতেন না? কিন্তু নিজে কিছু ইমপোজ করতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।'

পরবর্তী কালে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারী মধ্যে নন্দলালের এই মানসিকতারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পী বিনোদবিহারী লিখেছেন– 'যে শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকদের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির আবেগ হ্রাস পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে শিল্পরীতি পদ্ধতি আশ্রিত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি প্রলাভ একমাত্র উপায় সজীব শিল্পী মনের সান্নিধ্য।' নন্দলালের ছাত্র রামকিঙ্করও গুরুর পথ অনুসরণ করেছেন। ক্লাসে এবং আউটডোর স্টাডিতে ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিজেও কোনো সৃষ্টিশীল কাজ করে গেছেন। দরকার মতো ছাত্র-ছাত্রীদের শুধরে দিয়েছেন। রামকিঙ্করের ছাত্র প্রভাস সেনের লেখা থেকে আমরা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রের সুন্দর ও সঠিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন– 'মাষ্টারমশাই নন্দলাল বসু ছিলেন কলাভবনের কর্ণধার। তাঁর সহকর্মী সবাই তাঁরই ছাত্র-ছাত্রীরা ছিলেন। এঁরা কেউই নিজেদের মাষ্টার মনে করতেন না। মোটামুটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবারই রিসার্চ স্কলারের মতো। আমরা ছাত্ররা ছিলেম রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট। গুরু রামকিঙ্করেরও শিক্ষাদানের একটি বিশেষ ভাবনার দিক শঙ্খ চৌধুরীর– আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন– 'উনি শুধু বলতেন করে যাও করে যাও আর মাঝে মাঝে এসে ভেঙে দিতেন। আসলে উনি দেখতে চাইতেন যেটা হয়েছে সেটা কি হঠাৎ হয়ে গেছে না এর পিছনে সচেষ্ট প্রয়াস কাজ করেছে।'

আমরা জানি নন্দলালের সৃষ্টিতে বৈচিত্রের অভাব ছিল না। তাঁর ছাত্র রামকিঙ্করও এই বিশিষ্টতাকে তাঁর শিল্পঅঙ্গনে বিষয় ও বৈচিত্রের সমারোহ এনে রসিক দর্শকদের হৃদয় ও মনকে বিশেষ দুলিয়ে দিয়েছেন। একটা বিষয় নিয়েই অন্তত দশরকম

ভাবে মূর্তি গড়ার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ দিতেন। নন্দলালের কালি তুলির কাজেও রামকিঙ্কর বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর জলরঙের বহু ছবিতে এই রেখার একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তন করেছে সন্দেহ নাই। লিনো খোদাই-এর কাজ হাতে কলমে গুরু নন্দলালের কাছে শেখার মধ্য দিয়ে ছাপচিত্রের স্বাধীন মাধ্যমটির প্রতি রামকিঙ্করের বিশেষ আগ্রহ জন্মায় এবং এচিং, লিনো, লিয়ো, সিমেন্ট ব্লক প্রভৃতি কাজ করে সবিশেষ চমক সৃষ্টি করেন।

ঐতিহ্যকে অটুট রেখে পশ্চিমীশৈলী, করণকৈশল ও ভাবনাকে আত্মীয়করণ করার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় শিল্পীদের বাইরে এসে জীবনকে দেখার কথা বলেছেন বারেবারে। অনুযোগ করেছেন অবন-গগনের ছবি মন ভরায় না। শেষ মেশ তিনি নিজেই আঁকতে শুরু করে দেন এবং জীবনের শেষ দশটা বছর ছবি এঁকে প্রচলিত শিল্পধারা থেকে প্রথম অন্যপথে গেলেন ও দেখিয়ে দিলেন ছবি কাকে বলে। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'অন্য অনেক বড় কবি ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তাঁদের ছবি অত্যন্ত একাডেমিক। কারণ গুরুদেবের মতো দৃষ্টিশক্তি অনুভূতির গাঢ়তা তাঁদের ছিল না। এই দুটির গুণ না থাকলে গুরুদেবও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে ফেল করতেন।' আরও বলেছেন– 'সব মিলিয়ে অদ্ভুত রস।'

প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্র-নন্দলালের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের কাজ দেখা ও হাতে কলমে শেখা শিল্পবিষয়ক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক এছাড়া লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিদেশী বই পড়া ও ছবি দেখা ও বিদেশী শিল্পীদের কাছে করণকৌশল শেখা, বিদেশী সমালোচকদের ভাষণ শোনার মধ্য দিয়ে রামকিঙ্করের মনোজগতে শিল্প ভাবনার বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ে, প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁকে বড় হয়ে উঠতে তথা তৃতীয়নয়ন খুলে দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে কলা-কৈবল্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আধুনিক ভারতবর্ষের ভাবধারার উপর দাঁড়িয়ে ঐতিহ্য অটুট রেখে চিরায়ত দর্শন ও লৌকিকতার চিহ্ন বুকে নিয়ে রামকিঙ্কর স্বতন্ত্র হওয়ার কথা ভাবতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'শিল্পীর তিন অবস্থা, প্রথমে গুটিপোকার মতো যে খেয়ে যায়। তারপরে নিজের রসে নিজেকে সে আবদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত গুটি কেটে বেরিয়ে আসে প্রজাপতি হয়ে। যে গুটি কাটতে পারে না সে মরে।' বলা বাহুল্য যে রামকিঙ্কর গুটি কেটে বেরিয়ে এসেছেন পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি হয়েই।

স্রষ্টা হতে গেলে চাই ভাষাজ্ঞান। আধুনিক কিছু বলতে গেলে আধুনিক ভাষাতে বলতে হবে। সেই ভাষাজ্ঞান আসে একনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণার পথে উপলব্ধির মাধ্যম। কোনো আকার প্রকার দেখে শিল্পীর মনে যে উদ্দীপনা স্মৃতির ধ্যানের পথে ধারণায় পৌঁছে যে বিমূর্ত উপলব্ধি আসে সেখানে প্রচণ্ড আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তি বা Intellect

-এর একান্ত যোগ থাকতেই হয়। সেখানেই উপযুক্ত ভাষা দিয়ে ঐ ভাবকে ছবিতে বা মূর্তিতে আরোপ করাতেই সার্থক বা শাশ্বত-শিল্প সম্ভব হয়ে উঠে। প্রকৃত পক্ষে রামকিঙ্কর তাঁর দীর্ঘ দিনের শিল্প আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষাকে মাথায় রেখে বাস্তবের দেখাকে স্মৃতির ভাণ্ডারে তুলে নিয়ে দুরন্ত আবেগের তাড়নায় একনিষ্ঠ ধ্যানের মধ্য দিয়ে যে রূপ উপলব্ধির ধারণায় পৌঁছেছেন, তা যখন ছবিতে বা মূর্তিতে ফুটে উঠত, হয়ে উঠত শুদ্ধ বাস্তবও নয় বা খাঁটি বিমূর্ত উপলব্ধি। তাঁর সেই রচনায় বিমূর্ত উপলব্ধি ও বাস্তবের সংযোগে আত্মপ্রকাশ করত যথার্থ ভাবনামূলক সাদৃশ্য। এখানে এর সমর্থক সূচক রামকিঙ্করের একটি মন্তব্য স্মরণে এসে যায়। তিনি বলেছেন– "কংক্রিট অ্যাবস্ট্রাক্টকে একেবারে আলাদা করে ফেলা যায় না। কংক্রিটের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্টের, অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে কংক্রিটের লুকোচুরি চলে।"

শিল্পচার্য অবনীন্দ্রনাথ সাদৃশ্যের তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। তা হল 'এক ঘটনা সাদৃশ্য– যা নিছক প্রতিরূপ। দুই কল্পনা সাদৃশ্য– অর্থাৎ যেখানে মন কল্পিত রূপসৃষ্টির দেখা মেলে। আর তিন নম্বর হল ভাবনামূলক সাদৃশ্য– যা অন্তর্নিহিত ছিল প্রকাশ্যে এল এবার।' তিনি আরো বলেছেন– 'জগৎ শিল্প এই তলিয়ে থাকা রূপ এবং ফুটে ওঠা রূপ এই দুই তটের মধ্যে ধরা।'

প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের ছবি ও মূর্তিতে সেই তলিয়ে থাকা রূপটিকে ফুটে থাকা রূপের সাথে মিশে এক অরূপ রূপের দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যেখানে রসিকের মেজাজটিও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করে। অবনীন্দ্রনাথের লেখাতে পাই– "রসশাস্ত্রকার বলেছেন– 'মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় তাহাকে লাবণ্য বলি।' এতে করে বোঝাচ্ছে যে রূপের প্রমাণের, ভাবের অন্তর্নিহিত হয়ে বর্তমান থাকে লাবণ্য। শুধু শিল্পীর অপেক্ষা রচনার কৌশলে সেটি প্রকাশ করা।"

এ বিষয়ে তাঁর আরও প্রাঞ্জল বক্তব্য, "বিশ্বকর্মা লাবণ্য দিচ্ছেন সকল রূপে সকল ভাবে নানা উপায়ে আলো ছায়া দিয়ে রঙ বেরঙ মিলিয়ে কঠোরে কোমলে একত্রে বেঁধে।. . . যেখানে দেখি ভয়ঙ্কর শক্ত পাথর, তার উপর দিয়ে বইছে তরল ঝর্না নয়তো সবুজ শেওলাতে কোমল হয়েছে পাথরগুলো।"

বস্তুত লাবণ্যের এই যে বিশিষ্টতা বা নিয়ম যেখানে সূপকারের লবণ মিশিয়ে খাবারটি স্বাদু করার মতো রূপকারও লাবণ্য যোজনা করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলেন রচনাটি। বিভিন্ন অংশে সামঞ্জস্য তৈরি করে একটা ইউনিট এনে দেয় এবং মূর্তি বা ছবির গঠন কাঠামোর ব্যালেন্স নিয়ে আসে আর এক বিশেষ কোয়ালিটির কথা ঘোষণা করে। এইসব কিছুই বলাবাহুল্য রামকিঙ্করের যে কোনো ছবি, তা তেলরঙ

জলরঙ বা স্কেচের ক্ষেত্রে কিংবা সিমেন্ট কংক্রিটের পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে বা পোর্ট্রেটে ওই লাবণ্য যোজনার দেখা মেলে বলা যায় পূর্ণ মাত্রাতেই। সিমেন্ট কংক্রিটে তাঁর গ্রেইং প্রোসেসের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেন যে জৈব টেক্সচার বা অন্য ভাবে করা মৎস্য মহিষের পিঠের যে চাকাচাকা দাগ– যাকে তিনি তবলার চাটি বলেছেন– সে সবই কার্যত তাঁর বিশ্বকর্মার শক্ত পাথরের উপর তরল ঝর্না বা নরম সবুজ শেওলার মত এক অনবদ্য লাবণ্য যোজনার প্রচেষ্টা বলেও ধরা যায়। যা রসিক দর্শককে যুগপৎ আমোদিত ও স্তম্ভিত করে।

রামকিঙ্কর তাঁর সাঁওতাল দম্পতি নির্মাণ কালের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর আমার কথা প্রবন্ধে। যেখানে একজন সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষ ভাবনা মূলক সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। যখন সেই সাঁওতাল মাঝি লোকটি রামকিঙ্করের নির্মিয়মান মূর্তিটি ঘুরে ফিরে, এগিয়ে পিছিয়ে দেখছিল মন দিয়ে। কি করছিস বাবু এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রামকিঙ্কর তাকে 'এই তোদের মতন একটি মাঝি করার চেষ্টা করছি।' বলায় সে হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ খেতাবটা মাঝি বটে কিন্তু হইচে দেবতা।'

একটি সাধারণ মানুষের মুখ থেকে এই সুচিন্তিত মন্তব্য জ্ঞানে রামকিঙ্কর যারপরনাই আনন্দ পেয়েছিলেন– সাঁওতালও যে আর্ট বোঝে এই অজানা তথ্যটি জেনে এবং মনে করা যায় সাঁওতাল গোষ্ঠীর সামগ্রিক দিকের নমুনামূলক একটি সংহত রূপ ভাস্কর্যে আনতে পেরেছেন এই সাফল্যের কথা ভেবে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'সদৃশকরণের কৌশল দিয়ে মানুষ দেবতাও সৃষ্টি করেছে, রাক্ষসও সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধের নিজের মূর্তিটা কেমন ছিল না দেখা থাকলেও নানা লক্ষণক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটোন দিয়ে যেমন পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধের বুদ্ধত্বটিকে পরিষ্কার ধরে ফেলা হয়েছে, তেমনি সাঁওতাল দম্পতি বা কলের বাঁশিতে রামকিঙ্কর সদৃশকরণের কৌশল দিয়ে সাঁওতাল গোষ্ঠীর জীবন-যাপনের হাসি আনন্দ গান বাজনা কাজকর্মের যে উজ্জ্বল দিকটি সামগ্রিকভাবে রসিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিখুঁত মুন্সিয়ানায় তা এককথায় অনবদ্য। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের পোর্ট্রেট, বিনোদিনীর বা অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষের ছবিতেও ঐ একই কথা বের হয়ে আসে যথার্থ রসিকের অন্তর দুয়ার থেকে। যেখানে তিনি আলাউদ্দিনকে যন্ত্রে মানুষে একাকার দেখিয়েছেন বা বিনোদিনীর অন্তর্নিহিত রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ওয়েল পেন্টিংয়ে তাঁর নিজস্ব নানান কৌশলে বা কারিকুরিতে।

"কোনো কিছুর হৃদয়গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গি দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে, সুরের ভঙ্গিতে ওঠা বসা চলা-ফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়লো ভাব তবেই তো পেলেন মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা।" ভাবযোজনা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থ সার্থকরূপ দেখতে পাই

রামকিঙ্করের বিভিন্ন রচনায় দেশি বিদেশি নানান টেকনিক স্টাইল ও ট্রিটমেন্টের প্রয়োগে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অয়েল পেন্টিংয়ে তিনি তির্যক খাড়া ও অনুভূমিক লাইনের কারিকুরি ও শাস্ত্রোক্ত 'বর্ণিকাভঙ্গম' অর্থাৎ যেখানে রূপে ও রঙে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যথারূপ যেখানে রঙ সেখানে, সেই ভাবরূপ দিয়ে ফলানো রঙের রূপক দিয়ে কৃষ্ণজন্মের বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত চরম মুহূর্তটিকে দর্শকের সামনে অত্যন্ত বিশ্বাস যোগ্যতায় জীবন্ত ভাবেই এনে দাঁড় করিয়েছেন ঘটনাটির সমগ্রতায়। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানে পরিমাণে ও ভাবলাবণ্য যোজনার সাথে সদৃশ্যকরণের কৌশল এবং বর্ণিকাভঙ্গ নিয়মের সঠিক বর্ণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রোক্ত–

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্
সদৃশং বর্ণিকাভঙ্গী ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গীকম্"

এই ছয়টি রীতিই যে তিনি অত্যন্ত দক্ষতায় প্রয়োগ করে সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে উৎরে গেছেন বিশেষ ভাবে তা বুঝতে রসিক দর্শকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা বা সময়ের ব্যাপ্তি লাগে না।

সত্যি কথা বলতে কি রামকিঙ্করের জীবনব্যাপী ছিল শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ, মনন, চিন্তন ও ধ্যান। কার্যত ধ্যান-ধারণার পথেই বিশেষ উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সার্থক তথা শাশ্বত তাঁর সৃষ্টিগুলি ওই ধ্যানের পথেই রামকিঙ্কর উপলব্ধি করেছেন– ছবিতে ও মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া তাঁর জীবনব্যাপী লেগে থাকা হরেক বাধা ও অসহযোগিতার মনঃকষ্ট, ঈর্ষা, বিদ্বেষের চোরাগোপ্তা মার, অপমানের তীব্র জ্বালা, নতুন নতুন উপলব্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারা অথচ বিচ্ছিন্ন হয়েও না থাকতে পারা, আক্ষরিক অর্থেই বিস্ময়কর প্রতিভাধর বোহেমিয়ান বাউল শিল্পী রামকিঙ্কর। অচেতন, অবচেতন এবং চেতন এই তিন স্তরের মধ্যে অবচেতনের সাথে শিল্পীর ব্যাক্তিত্ব ও তাঁর সৃজনীশক্তির একটা সম্বন্ধ আছে– একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন। শিল্পী বিনোদবিহারীর এই গূঢ় কথা আমরা রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম বিশ্লেষণে গিয়ে দেখতে পাই এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর শিল্পরূপের যোগ রয়েছে। যেমন রামকিঙ্কর বলেছেন– "আমাকে ঠায় সাক্ষীগোপালের মত দাঁড় করিয়ে রেখে যে ছবিটা এঁকে গেলো সে লোকটা থাকে কোথায়?"

এখানে এটা স্পষ্ট, যে বস্তুত রামকিঙ্কর ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মার্গের যোগীদের মত কোনো বিষয়ের ধ্যানের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে সাব-কনসাস ও আন-কনসাস মাইণ্ডে ধাক্কা দিতে দিতে সেখানকার বদ্ধ দরজা খুলে পেয়ে যেতেন তাঁর অভীপ্সিত চূড়ান্ত রূপটিকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনো বিশিষ্ট যাজকের বেলায় যেমন যাজন

ক্রিয়ার কোনো [illegible] অদৃশ্য শক্তি থেকে কথার রাশ ঠেলে দেওয়ার অনুভূতির কথা শোনা যায়, অনুরূপ রামকিঙ্করের বেলায়ও তাঁর মনে হয়েছে যে সাক্ষীগোপালের মত তাঁকে ঠায় করিয়ে রেখে কারো এঁকে দেওয়ার অনুভব।

বিনোদবিহারীর অন্য একটা কথা থেকে রামকিঙ্করের এই অনুভূতির সাযুজ্য পাওয়া যায় যেখানে তিনি বলেছেন– 'শিল্পীর জীবনেও এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা Mystic-এর পর্যায় ভুক্ত। এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সঙ্গে শিল্পরূপের যোগ থাকে বলেই যুক্তির পথে এই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সমকালীন শিল্পীদের উক্তি থেকে অনুরূপ Mystic অভিজ্ঞতারও সমর্থন পাওয়া যাবে। শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার সকলেই এক বিশেষ চেতনা নিয়েই জন্মায়। ধ্যান-ধারণার পথে সেই চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিণতির সাথে সাথে এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করে সার্থক তথা শাশ্বত সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে, যা রামকিঙ্করের শিল্পের জন্যই শিল্প এই দৃঢ় মানসিকতা লালনের ভিতর দিয়ে উঠে আসা অভিজ্ঞতার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের লেখা থেকে জানা যায় যে রামকিঙ্কর প্রতিটি মুহূর্ত শিল্পচিন্তাতে অতিবাহিত হত। এমনকি গ্রীষ্মের অবকাশের দিনগুলিও তাঁর কাছে কোনই গুরুত্ব পায়নি। বরং দ্বিগুণ উদ্যমে শিল্পসৃজনের উপযুক্ত সময় ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টয়লেটে গিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে এসে, আবার কাগজ কলম হাতে তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া কোনো শিল্পরূপের সুলুক সন্ধানটি নথিবদ্ধ করতে।

কোনো বিষয়ের একনিষ্ঠ ধ্যানের মধ্য দিয়ে গেলে যে বোধ জন্মায় তার রূপটি ঐ একই বিষয়ের উপর পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো ব্যক্তির গবেষণার ফল বা বোধ একই রকম হওয়া সম্ভব– এই যুক্তিতে রামকিঙ্কর তাঁর ইনট্যুইশান বা স্বজ্ঞা থেকে পশ্চিমী শিল্পকলার চরিত্রের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন। শিল্পের তো কোনো গণ্ডী হয় না, দেশ-কাল-পাত্রগত দিক দিয়ে। তাই একই বিষয়ে ধ্যানে ভিন্ন প্রান্তে একই আবিষ্কারটি ঘটে যায়। রেডিও বিষয়ে আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু ও ইউরোপের মার্কনীর ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে। এ বিষয়ে রামকিঙ্করের একটি গূঢ় কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'আমার প্রকৃতির মধ্যে যা দেখি আমাদের অভিজ্ঞতা এসথেটিক ট্রেনিং, আবেগ, অনুভূতি, নৈঃসর্গিক সচেতনতা ইত্যাদির মিশ্রণে যা হয় সেখানে ওয়েস্টার্ন ইস্টার্নের কোনো তফাত নেই।'

নৈঃসর্গিক সচেতনতা বলতে রামকিঙ্কর বুঝিয়েছেন সূর্য দেখছো চন্দ্র দেখছো, তারকারাজি– তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি ধারণা। তাদের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অনুভব করছো? সেটা কী ব্যাপার, তার সম্বন্ধে তোমার

অনুভূতি আছে কী? সেই কথাটাই একটি কুল, গাছ, মানুষ এবং সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান।

রামকিঙ্কর গণেশের মাথার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন– বিমূর্ত ভাবনার মূর্তি প্রসঙ্গে। এছাড়া শিবলিঙ্গ বা রাবণের দশটা মাথার অর্থ কি– এই প্রশ্নও করেছেন। তাঁর মতে– 'ও সবই হল গিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনার ফসল। যা আমাদের দেশে সৃজন হয়েছে বহুকাল পূর্বেই।' তাই কোনো কিছু গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়ে তাঁকে কখনো কোনো দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ আর্ট হল বিশ্বজনীন।

কিউবিক, ইমপ্রেসেনিস্টিক ও এক্সপ্রেসেনিস্টিক রীতির ভাবনায় তিনি ছবিতে তীব্র আর্তি, সংঘাত, দুর্যোগের ঘনঘটা ও গতিময়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য জোর করে কোনো টেকনিকের প্রয়োগ তিনি করেননি। কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করতে যা হবার তা হয়েছে এমন কথাই তিনি বলতেন। তাঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তি বিষয়ে বলেছেন– 'হ্যাঁ একটু ডিভিয়েশন এসে গিয়েছে বটে, ভিস্যুয়াল ফর্মাল থেকে। সেটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে চাইছেন সবাই।'

প্রকৃতপক্ষে সব দিকে দেখাটাকে একসাথে ধরে রাখার তাগিদে কম্পোজিশন অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেছে এমন কথাও বলেছেন কোথাও। তিনি একই ক্যানভাসে অনেকগুলি ছবিকে চাপাচাপি উপস্থাপিত করেছেন, ক্যানভাসের জমিকে কিউবিক রীতিতে বিভাজন করে। যাকে জ্যাকস্টাপোজিশন বলা হয়। কোথাও দুর্ঘটনার ছবিতে মৃত গাই গরুর গর্ভকে ভূমণ্ডলের আদলে দেখিয়েছেন। অন্নপূর্ণা সিরিজে মিথোলজিকে নতুন আঙ্গিকে আধুনিকতার আঙ্গিনায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। দণ্ডায়মান নারী ও পুরুষের মৈথুন দৃশ্যে লিঙ্গকে গাছের গুঁড়ির আকারে দেখিয়েছেন শস্যদানা কেটে অঙ্কুরিত গাছের উপমা বোঝাতে। কখনো মা ও সন্তানের প্রথাগত বাৎসল্যকে চুরমার করে বিরোধ বিভংসতা ও নবীনের হাতে প্রবীণের হত্যালীলার উল্লাস দেখিয়েছেন। কখনো আবার স্বর্গীয় মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই দ্বেষদীর্ণ পৃথিবীর রক্ত মাংসের নারীমূর্তি।

দুটি মেয়ের ছবিতে ডিসটরসন প্রসঙ্গে বলেছেন– 'মুখের ডিসটরসন এসে গিয়েছে, ইচ্ছাকৃত নয়। কিছু কিছু ডিসরটরসন যেমন ধরুন গলাটা খুব বেশি লম্বা এই রকম আর কি। না থাকলে সমস্ত বিষয়টা পয়েন্টলেস হয়ে যায় না কি?'

তিনি মানুষ এবং ইতর জীবনের মধ্যে কোনো সীমারেখা দেখাননি যেমন কাকের, কুকুরের অথবা শুয়োরের স্নেহময় মাতৃরূপকে দর্শকের সামনে হাজির করেছেন। বস্তুত এ সবই তাঁর ইম্প্রেশনিজম ও এক্সপ্রেশনিজম অন্তর্ভুক্ত ছবি ও ড্রইংয়ের দৃষ্টান্ত। ইম্প্রেশনিজম সম্পর্কে রামকিঙ্কর বলেছেন– 'তুমি যা দৃশ্য দেখাছো, তোমার চোখে তারই আভাস নিয়ে যেটা কাজ হলো সেটাই হচ্ছে ইম্প্রেশনিজম।'

সেইটা আবার রকমারি আছে। ইম্প্রেশনিজম বলতে যেটা সেটা ফটোগ্রাফিতেও করেছে। কিন্তু তার মধ্যে তোমার যে বিশেষত্ব একটা তোমার মানসিক এফেক্ট সেটা এসে যাবে ওর ভিতরে। সেইজন্য ফটোগ্রাফির সঙ্গে তফাত হয়ে যাচ্ছে একটু। এই হচ্ছে ব্যাপার।'

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'যারা এতবড় যে শাস্ত্রের নিষেধ বিধির উপরে চলে গেছে এবং যারা এত ছোট যে শাস্ত্রের বাইরে পড়ে গেছে এদের দু'জনের জন্যই শাস্ত্র নয়। যারা মাঝারি রকম মানুষ কেবল তাদেরই জন্য শাস্ত্র।'

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ছবিতে বসুদেবের ঘাড়ের জায়গায় যে জোরালো ডিস্টরসন যা গ্রামারের তোয়াক্কা না করেই। এখানে তিনি শাস্ত্রের নিষেধবিধির উপর চলে গেছেন, বসুদেবের মনে নিদারুণ আশঙ্কা ভয় ও চরম সতর্কতার উপস্থিতি বোঝাতে। ভীত সন্ত্রস্ত বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে কিভাবে পালাতে পারবে কিংবা আদৌ পারবে কিনা এই টানাপোড়েনের ভীষণ দুশ্চিন্তায় ও অতি সাবধানতায় তাঁর মুখ সম্পূর্ণ পিছনে ঘুরে যাওয়াকে রসিক দর্শক বা বোদ্ধাদর্শকের কাছে বিশেষ সন্তুষ্টি ও যৌক্তিকতায় গৃহীত হয়ে গেছে। তাঁর পায়ের পেশিতে ভর করেছে শরীরের সমস্ত শক্তি ও একাগ্রতা। যেন অংশত পরুষকারের এক মূর্ত রূপ সেখানে। কংসের হাতে ছুটন্ত তলোয়ারের ঝিলিক, বিদ্যুতের চমক, মেঘের আকাশফাটা গর্জন, অসহায় গর্ভিনী সব মিলিয়ে এক বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত ভয়াবহ এক মুহূর্তকে তিনি দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতায়।

আবার কোথাও তিনি দেখিয়েছেন তিনটি উলঙ্গ যৌবনদীপ্ত নারীমূর্তি শুয়ে বসে ও দাঁড়ানো অবস্থায়। যেখানে তিনি উর্বর নারী সৌন্দর্যের কথাই বলেছেন। কিছুমাত্র দেখা মেলে না লালসার পূতিগন্ধময় ছায়ার ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির গাত্রের নারী-পুরুষের নিষ্কলুষ আলিঙ্গন দৃশ্যের রিলিফের মতো। রামকিঙ্কর তাঁর উক্ত রূপব্যঞ্জনায় রচিত নগ্নমূর্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন– ''সব কিছুর মধ্যেই সেক্স আছে, সেক্স ছাড়া সবকিছুই অসাড় প্রাণহীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহান শিল্পীরা মনে রাখার মতো বিখ্যাত বিখ্যাত কাজ করে গেছেন যেহেতু তাঁরা কোন রকম যৌন বিধিনিষেধ এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।''

এখানে রামকিঙ্কর ফ্রয়েডীয় গবেষণার কথা স্মরণ করিয়েছেন। অবশ্য তিনি যে ফ্রয়েডের মতের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন না সে কথা তাঁর সৃষ্ট নানান শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যেই পাওয়া যায়। অতলস্পর্শী অচেতন মনের অনুসন্ধান ফ্রয়েড চূড়ান্তভাবে করতে সক্ষম হননি। পরবর্তী কালে ইয়ুংয়ের স্বপ্নবাদ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। জীবনের মহৎ আদর্শ সম্বন্ধে ফ্রয়েড ছিলেন অনেক পরিমাণে উদাসীন।

রামকিঙ্কর মহৎ আদর্শ বা হৃদয়বৃত্তির কথা বুঝেছিলেন। তিনি এও বুঝেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ সংযোগেই শিল্প পূর্ণাঙ্গ হয়। তাই তিনি তার শিল্প প্রচেষ্টায় হৃদয়বৃত্তির কথা বারবার বলেছেন।

'ভালোবাসাই জীবন ভালোবাসা মহান আবার ভালবাসা ভয়াবহ ধ্বংসাত্মকও।' একথা রামকিঙ্করের। তাই তাঁর এই ধারণায় কোথাও তাঁর ছবি এক মনোরম সৌন্দর্য্য নিয়ে জেগে উঠে আবার যেন হারিয়ে যায় আতঙ্কের আবছায়ায়। রক্তমাংসের সৌন্দর্য যেমন রূপান্তরিত হয়েছে ভয়ঙ্কর পৈশাচিকতায়, তেমনি অনৈসর্গিক মাতৃমূর্তিতেও। ছবিকে তিনি শক্তির প্রাচুর্যতায় ভরিয়ে দিতে পারতেন। রেখার গতি বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়েছে ছবিতে। এই গতিকে ধরবার জন্য ব্রাসের ডায়গোনাল ব্যবহার করেছেন। তুলির পিছনে কাঠের ডাটিটি কালো কালির দোয়াত থেকে তুলে সরাসরি কাজ করেছেন গতির সাথে তীক্ষ্ণতাকেও ধরবার জন্য। রঙ কোনো বাধ্যবাধকতার সীমা মেলেনি। স্থানীয় পরিবেশের উপর তাঁর কিছু ছবিতে একটি প্রতীক বা মিথিক্যাল বিমূর্ততার মাত্রা যোজনা করেছেন তিনি। তাঁর ছাত্র কে. জি. সুব্রামনিয়াম বলেছেন– ''ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রাম– এক গভীর বিমূর্ততার মধ্যে নিয়ে যেতে দেখি। যেখানে ঝলকে উঠা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ রেখার ভিতর দিয়ে রাত্রিঘেরা বাড়িগুলির চাল আলোকিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। মেয়েটির ছাগল টেনে আমার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে বীরাঙ্গনার রণভঙ্গী। ঘরামী বা বিল্ডার্স-এ দেখা যায়– নারী পুরুষ, শিশু সহ খুঁড়ে বার করা একটি কঙ্কাল। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ঠিক যেন মধ্যযুগীয় প্রতীক এটি। এমন কী 'ধানকাটা', 'ধানঝাড়ার' মধ্যেও একটি এপিক মাত্রা যোজনা করেছেন তিনি।''

স্থবিরতার পাশে জঙ্গমতার সহাবস্থান, বাড়ির পরিপ্রেক্ষিতে পাখি তাদের ডানার তীব্র গতি ও ছন্দের নানান রূপ এবং সজীবের পাশে নির্জিবের বৈপরীত্য ও সহাবস্থান তাঁর বোধের আরেক অনন্য উজ্জ্বল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'পুরাকালে আমাদের যাঁরা শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তাঁরা নিয়ম করতেন, নিয়ম ভাঙতেন।' রামকিঙ্কর ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে পাশ কাটিয়ে ছবিতে এনেছেন অন্য এফেক্ট– যথা ভাস্কর্যের ঘনত্ব ও হেভিনেশ। তাঁকে চেনা যায় রেখার বলিষ্ঠতায় ও তীক্ষ্ণতায়। নেপালে আঁকা তাঁর পাহাড়ের জলরঙের ছবিগুলিতে ভাস্কর্যধর্মী গুণের প্রকাশে ঘন কাঠিন্যতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে তাঁর ইনডিগো রঙের প্রয়োগে ছবিতে এক স্বতন্ত্রতা ও ক্লাসিক মেজাজ বয়ে আনে। জলরঙে যেখানে তিনি সহজে সিদ্ধান্ত নিতেন, হয়ে উঠত আবেগের প্রকাশ ও অভিব্যক্তিময়তা। বিপ্রতীপে তেলরঙে তিনিই আবার বিশেষ অনুসন্ধানী এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে যা বের করে আনতেন তা বলা যায় ধারণাত্মক।

এইভাবে ছবিতে যেমন, মূর্তির বেলাতেও তিনি নিয়ম ভাঙলেন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। যেমন সুগোল সুডৌলের বদলে বিভিন্ন তলের বিন্যাস ও তাদের তীক্ষ্ণ সরল রেখায় মিলিত করা। লোকায়তিক জীবন প্রবাহকে আধুনিক ও চিরায়তের মূলমানে রূপ দেওয়া ইত্যাদি। তো উপরোক্ত ধারণাত্মক বিষয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে অবনীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন– 'কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনে ভাবা জগতের মিলন না হলে যে আর্ট হবার জো নেই।' রামকিঙ্কর তদ্রূপ চোখে দেখা দৃশ্যের সাথে তাঁর মনে ভাবা দৃশ্যের মিলন করতেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে।

জলরঙের ছবিতে তাঁর অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঞ্চরন, আত্মপ্রত্যয় ও স্পষ্টরূপ দর্শকের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশেষ ঝংকার তোলে। এইভাবে বিনোদিনীর জলরঙের ছবিতে বেশ তাজা ভাব, যেখানে তেলরঙে তিনি তাঁকেই করে তোলেন জটিল রহস্যময়ী এক নারী। এ প্রসঙ্গে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা স্মরণে এসে যায়। সোমা যোশীর ছবিতে এক হৃষ্টপুষ্ট পুতুল পুতুল নারী মূর্তির অবয়ব। যে ছবিকে অয়েল পেন্টিং বলেই মনে হয় না। সত্য ও সুন্দরের মধ্যে সত্যের উপর জোর দেওয়া রামকিঙ্কর অন্যান্য কাজের মতোই তিনি সোমা যোশীর চেহারার পুতুল পুতুল বৈশিষ্ট্যটি ছবিতে ফুটিয়ে তুলেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

রামকিঙ্কর বলেছেন– 'পোর্ট্রেটে সৃষ্টির সুযোগ সবচেয়ে বেশি। মুখের এ্যানাটমির নকল নয় ক্যারেকটারের দিক থেকে। প্রথম আবিষ্কারের করতে হয় সেগুলো। তারপর ফুটিয়ে তুলতে হয় জোর দিয়ে। আণ্ডার লাইন করা আর কি। তবেই পোর্ট্রেট হয়। নকল আর ভুল জায়গায় জোর দু-ই হলে সমান বিপজ্জনক।'

রামকিঙ্কর সারাজীবন এ কথাই বিশ্বাস করে গেছেন। এজন্য ছবিকে বার বার মুছে ফেলেছেন, মূর্তিকে ভেঙেছেন বিষয়ের মূল সত্তাকে ফুটিয়ে না তোলা পর্যন্ত। তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপের একটা বড় জিনিস হল মিনিমাইজেসন, অর্থাৎ খুব কম কথা বলা। তিনি এক আলোচনায় বলেছেন– 'বেশি বলায় কি লাভ, ক্ষতিই তো।'

ওয়াটার বা ওয়েল উভয়তই ছিল তাঁর ঐ মিনিমাইজেসন। কখনো তাঁর ছবি শুধুই রঙের ব্লক, রেখাহীন। আবার কখনো তাঁর ছবি উজ্জ্বল রঙ দিয়ে কালো কড়া লাইন। ঘন নীল বা অন্য উজ্জ্বল রঙের পাশে কাগজের সাদা উজ্জ্বলতা এনেছেন সঙ্গে তীব্রতাও। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'একসঙ্গে সব রঙ মিশিয়ে দিলে রঙটা ডার্টি হয়ে যায়। সেই জন্যেই তফাত করে দেওয়া।'

আরও বলেছেন– 'দুটো রঙের পাশে একটা সাদা লাইন– ক্যানভাসের বা কাগজের অংশ থাকে। না হলে সব মিলে মিশে একটা থার্ড কালার হবে, সেটা জবরজং হয়।' তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ছবিতে বিভিন্ন রঙ মিলেমিশে

এক রহস্যময়তায় শুয়ে থাকতেও দেখা গেছে। তাঁর প্রিয় রঙ ইনডিগোর অনবদ্য ব্যবহার দর্শককে সবিশেষ চমকিত করে। তাঁর পাহাড়ের ছবিতে সেজানীয় গন্ধ থাকলেও তা অনেক বেশি ভাস্কর্যধর্মী। তিনি বলেছেন– 'এই শতকের পাশ্চাত্য শিল্পকলা আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। নিজের মনের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছি।'

আরো বলেছেন– 'পাশ্চাত্য ছবি অনেক দেখেছি। সেজানকেও ভালো লাগে। তা কিন্তু না। নট নেসেসারিলি। তবে সেজান কিউবিজমটাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পিকাসো আমার চিরদিনই ভালো লাগে।' তাঁর অন্য এক বক্তব্যও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। বলেছেন– ''যেহেতু কখনো বিদেশে যাইনি ডাইরেক্ট কোনো কাজ দেখিনি বই পড়েছি জেনেছি ওদের সম্পর্কে।. . . সে অর্থে প্রিয় বলতে আমার কেউ নেই। ভ্যান গখ, গঁগা, গেইয়া, রেমব্রান্ট আমার ভালো লাগে। এঁরা অনেকেই নমস্য।. . . পিকাসো আমার ফেবারিট ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ভাস্কর বলতে ম্যুর বা রঁদা আছেন। রঁদাই আমার প্রিয়। ওঁর কাজের সঙ্গে আমার মিল আছে প্রচ্ছন্ন।"

এছাড়াও বলেছেন– 'বিদেশের শিল্পীদের মধ্যে দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রঁদা খুব ভালো লাগে। মাতিস, সাগাল আরও অনেকের কাজই ভালো লাগে।' পাশ্চাত্যের সাথে তিনি নিজের মনের একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন তেমনি নীল রঙটির সাথে ছিল তাঁর আবাল্য সখ্য। নীলের প্রতি তাঁর মনের এই টান বা আকর্ষণ থাকায় তিনি যক্ষযক্ষীর পাথরের খোঁজে ছোটাছুটি করেছেন নেহাত কম নয়। শেষে কুলুমানালীর থেকে ধূসর নীলরঙের শিবালিক স্যাণ্ড স্টোন বেছে এনেছেন যক্ষযক্ষীর জন্য। তাঁর এই নীল প্রিয়তা তাঁকে বহু ছবিতে নীলের ব্যবহার করিয়েছে। লালরঙ সাবধানে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। ঋতু অনুযায়ী বর্ণ এসেছে তাঁর ছবিতে। ধূসরবর্ণ, পাংশু হলুদ, কালচে নীল, মাটি ঘেঁষা লাল এসবই। পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে রঙের প্রয়োগ তাকে ভাবাত। এছাড়া স্বচ্ছতা ও মূলবর্ণের উজ্জ্বলতাও বিশেষ লক্ষণীয়। আকারের ডৌলগুলিতে রঙের প্রয়োগ ফ্ল্যাট হলেও সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বলেছেন– 'প্রত্যেক ঋতুরই নিজস্ব রঙ আছে। নিজস্ব আবেদন এমনকি রাতদিন দু'টোরই আলাদা রূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। প্রতিটি ঋতুই সে অর্থে ইমপরট্যান্ট। ছবি আঁকতে গেলে তা মনে রাখতে হবে। আমার জলরঙে বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপে এসব ধরার চেষ্টা করেছি। ফাঁকা মাঠ, পুকুরপাড়, ঝর্না, খোয়াই, নিঃসঙ্গ তালগাছ, জ্যোৎস্না, বিভিন্ন ঋতুতে এদের বিভিন্ন মুড আমার প্রিয় সাবজেক্ট। ছবিতে ওরা আছে।'

অয়েলে তিনি ক্যানভাসের জমিটাকে জিওমেট্রিক্যাল নানান ফর্মে ভাগ করতেন,

ভাগের এই নকসাটাকে কিউবিস্টিক বলেছেন গবেষকরা। অবশ্য তাঁর মতে ওটা এক ধরনের নিজস্ব টেকনিক। শেষের দিকে স্পন্দ-ছন্দ ও সংবেগের উপর জোর দেওয়া তাঁর ছবি মূলত রেখাপ্রধান হয়েছে। রঙ, কালো রেখার ঘেরে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। তাঁর ছবিতে চমৎকারিত্ব সেন্টিমেন্টাল বা বাস্তবিকতার কোনো স্থান ছিল না। তাই বারবার মুছে ফেলে আবার আঁকতেন। বাস্তবের দেখাটাকে যথাযথ পটে বা ক্যানভাসে স্থাপন করলে কিম্বা মাটি সিমেন্টের কাজে আরোপ করলে তাকে ছবি বলে না ছাপা বলে আর মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে তা মূর্তি বলে না, পুতুল বলে। ক্যামেরায় তোলা ফটোর মতোই নির্জীব তা।

শিক্ষাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'আর্টিস্টের লেখা পাহাড় যেমন মনে গিয়ে পৌঁছায় ফটোতে লেখা পাহাড় ঠিক তেমনি ভাবে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না।' আরও বলেছেন 'ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিলন হল, তবেই হল একটা শিল্প রচনা।'

শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– 'পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবধর্মী জানাকে পটে যথাযথ স্থাপন করলে সেটি স্টাডির পর্যায়েই থাকার কথা। সেই যথাযথ দেখা শোনার পর শিল্পী নিজের ভাবনার দেখাকে যোগ করে যখন আরবার পটে স্থাপন করেন তখনই তা ড্রইংয়ের সৃষ্টির পরিচয় পূর্ণ হয়। রামকিঙ্করের ছবিতে বা মূর্তিতে বাস্তবের ছাপ নয় বরং ড্রইং বা মূর্তিই বলা চলে। কেন না তিনি তাঁর দেখাটাকে হুবহু না তুলে নিজের ভাবনার রসে জারিত করে রূপান্তর ঘটিয়ে কাগজে বা ক্যানভাসে অথবা মাটি সিমেন্টের ব্লকে স্থাপন করেছেন দেখা যায়। বীরভূমের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া রূপোলী রঙের গোরুর গাড়ি যাকে ইমপ্রেশনিজমের উদাহরণ বলতে পারি। এখানে আমরা তাঁর কল্পনার দেখাটির সাথে সমগ্র ছবিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার দুরন্ত গতিকেও দেখতে পাই। কোথাও আবার অনেক বিশ্বাসযোগ্যতা ও গতির দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত করেছেন পরিপ্রেক্ষিতের বিকৃতি যা দর্শককে ভাবায় ও নাড়া দেয়। কোথাও তিনি মুহূর্তকে ধরবার জন্য জোর দিয়েছেন সারফেস এবং ডেনসিটি ট্রিটমেন্টের উপর। অনেকগুলি ল্যাণ্ডস্কেপে গঠন সমৃদ্ধ ও ছন্দ প্রধান রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কখনো সাবজেক্ট ও লোকেশনের ভিন্নতার সঙ্গে ছন্দেরও পরিবর্তন হয়েছে। ছন্দময় কিছু ড্রইংয়ে তিনি কিউবিস্ট ধারণার পাশাপাশি ইমপ্রেশনিস্টিক বা পয়েন্টেলিস্টিক রঙের প্রয়োগ করেছেন। কখনো রোমান্টিক বিবরণধর্মীতাকে পেছনে ফেলে তাঁর কাজ ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে অনেক বেশি কিউবিস্টিক এবং এক্সপ্রেশনিস্টিক।'

তো এইসব দুরূহ ভাবনার বিষয়গুলি যা রামকিঙ্কর তাঁর এসথেটিক ট্রেনিং অভিজ্ঞতা, আবেগ, অনুভূতি, নৈসর্গিক সচেতনতার মিশ্রণের ধ্যানলব্ধ রূপসমূহকে

রসিক দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন– তার ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি সৌভাগ্যবশত তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সতীর্থ ছাত্র-ছাত্রী, বিশিষ্ট শিল্পবেত্তা ও শিল্প-গবেষকদের কাছ থেকে– যাঁরা হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, কে. জি. সুব্রামনিয়াম, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ চৌধুরী, জনকঝংকার নার্জারী, আর. শিবকুমার, অমিত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু দাস, অরুণ পাল, সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি পাল প্রমুখ। যদিও এইসব গুণীজনেরা রামকিঙ্করকে যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন এবং উৎসুক পাঠকদের সামনে তাঁর সুচিন্তিত ভাবনার শিল্পরূপের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তথাপি মনে হয়, মনের যে অবচেতন ও অচেতন স্তর থেকে তুরীয় ভাবনার যে ছবি ও মূর্তিগুলি তিনি আমাদের সামনে হাজির করেছেন– তা আরও বহু বিশ্লেষণ ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে সন্দেহ নেই। রামকিঙ্কর ড্রইং , চিত্র, ভাস্কর্য যাই হোক না কেন তাঁর প্রায় সমস্ত কাজেই কিউবিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও তিনি কিউবিজমের মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে আরও বড় সীমানার দিকে চলে গিয়েছিলেন,– সেখানেও তাঁর শিল্পকলায় প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল এবং মৌলিকতায় পরিপূর্ণ এক চূড়ান্ত রূপের খোঁজ মেলে। শিল্পী কে. জি. সুব্রামনিয়াম বলেছেন– 'মূল কিউবিস্ট এথিকসকে এড়িয়ে গিয়ে অবজেক্ট এবং স্পেসের সঙ্গে একটা স্টিরিও ভিউসিয়াল সম্পর্ক তৈরি করে। অবজেক্ট স্পেস কমপ্লেক্সের ইমেজকে বিশ্লেষণ করতে করতে যা পূর্ণগঠিত করে অবজেক্ট ইমেজ অথবা স্পেস ইমেজ, যা পূর্বাপর সমস্ত ভিউসিয়াল লজিককে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারায় সৃষ্টি করে এবং মাত্রা ও অভিব্যক্তিকতায় তাকে এক নতুন জায়গায় পৌঁছে দেয়।' বস্তুত রামকিঙ্কর তাঁর শিল্পকর্মকে কোনো ইজমের আওতায় ফেলতে রাজি ছিলেন না। বলেছেন ইমোশনের ধাক্কায় হয়ে যাওয়ার কথা। এজন্য তিনি অজন্তার উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন– 'অজন্তাতে দেখবেন আয়নাতে চুল আঁচড়াচ্ছে মেয়ে। তিনটে ফিগার। তার পা টা উল্টে দিয়েছে তলার পা দেখা যাচ্ছে. . .। ওখান সব দিকের ডাইমেনশন এক সঙ্গে ধরতে হয়েছে। কিউবিজমেও এটা করা হয়।' আরও বলেছেন– 'ধরুন এই বইটা তিনটে সাইডে দেখা যাচ্ছে। তার এই ধারটা একরকম, ওধারটা অন্যরকম। আবার আরেকধার আরেক রকম। বইটা আঁকতে গেলে তিনটে ধারের শেপ কি রকম হবে তাহলে ভাবুন। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীতেও কিউবিজম এসে যায়।'

অন্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'স্পেসটাকে নিয়ে এমন করে ভাগ করবো এটা আগে ভাগে ভাবিনি। মাথাতেই ছিল না একদম। কিন্তু আঁকতে গিয়ে ইমোশনের ধাক্কায় হয়ে গেলো ঐ রকম।. . . জিওমেট্রিক্যাল নানা ফর্ম দেখবে সেই ভাগে।' ছবিতে ভাগের এই নকসাটা নিশ্চয়ই নজরে পড়েছে। কেউ কেউ আবার বলে

কিউবিস্টিক/না না কিউবিস্টিক নয়। কিউবিজমের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? তাহলে
কিউবিক কী? "কিউবিক আর্ট হচ্ছে আমরা যা দেখছি সেটারই একটা কিউবিক
ফর্মের মধ্যে ফেলছি। যেমন একটি গাছ। গাছটা। তার মধ্যে আমি সব দেখছি
অবশ্য। তার নিচের যে গাছ, তার ডালপালা সবই দেখছি। কিন্তু সেটি একটি ফর্মের
মধ্যে ফেলা হচ্ছে। সেটি কিউবিক ফর্মে ফেলেছি। এখনো কিউবিক ফর্মটা কী
দেখতে হবে। সেটা কী? সেটা হচ্ছে আবার কিউব। সেটা চতুষ্কোন হচ্ছে, ত্রিকোন
হচ্ছে। সেটাকে ফেলে একটা সলিডিটি আনা হচ্ছে। একটা সলিড ফর্মে ফেলছি।
আসল প্রতিফলিত। আসল ফরম্‌টা আসছে, তার মধ্যেই আসছে।" রামকিঙ্কর
বলেছেন একথা।

এ সম্পর্কে অন্য অরেক কথায় তিনি বলেছেন– 'কিউবিক কেন করছি? যেমন
রস দিয়ে মিছরি তৈরি হল। তুমি যখন মিছরিটা গলিয়ে দিলে রস পেয়ে গেলে।
কিউবিক হলো ঠিকই কিন্তু ওর ভিতরে রসিকের যে ইয়েটি, সেটি কিন্তু থাকা চাই
বাবা। তা না হলে কিউবিক হবে না বুঝলে? ওটা তার মধ্যেই সেই রসিকতা,
রসিক মনের প্রতিফলনটা হওয়া চাই। যা তুমি গলিয়ে দিলেই সেটি আবার সেই
রসে পরিণত হবে। সেই রস কিউবিকের মধ্যে অন্য কিছু মেশানো যায় কি না
যেমন গোল বা অন্য কিছু। যাই করো না কেন রসিক মনের পরিচয় থাকা চাই। তা
না হলে অন্য লোক, দর্শক বুঝবে না তুমি রস পাবে।'

শুধুমাত্র কিউবিজম করার জন্যই রামকিঙ্কর কিউবিজম করেন নি। কাজ করতে
গিয়ে যা হবার হয়েছে। আর এভাবেই তিনি এ্যাবস্ট্রাক্ট-এ চলে গেছেন। তিনি
কিউবিজমের মধ্যেই আটকে থাকেন নি। কিউবিজমকে ছাড়িয়ে আরো বড় কোনো
সীমানার দিকে চলেগেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। অবজেক্ট ও স্পেসের রূপরীতি
বিশ্লেষণ করেছেন, ভেঙেছেন জন্ম দিয়েছেন এক স্বকীয় মণ্ময় শিল্পভাষার। ঘনকবাদী
কায়দায় বিভিন্ন ছবিতে খাঁড়া রেখা, অনুভূমিক রেখা ও তির্যক রেখার ব্যবহার
তাঁর বক্তব্যকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করেছে। ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই তিন
প্রকার রেখার মিলনে কোথাও ছবি কমপ্লেক্স চরিত্র পেয়েছে। রামকিঙ্কর বলেছেন–
'কিউবিজমের মধ্যেও আবার একটু ভাঙন। আবার দু-তিনটে জিনিস স্ফিয়ার এবং
কিছু লাইন বা টোনের কম্বিনেশন পারমুটেশন একটু অন্যরকম যাতে হয় আর
কি? তখন নিছক কিউবিকটা উড়ে গেল। একেবারে বন্ধ। পিত্তর কিউবিক বলতে
কিছুই রইল না। অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেল। কিউবিজমেরই একটু এদিক ওদিক বদলে
অ্যাবস্ট্রাক্ট হল। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টকে তিনি রেখা ও ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত বলেছেন।
বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর যেমন অনুভূতি ও আবেগের স্পিয়ার সিলিন্ডার, শোওয়া
লাইন, খাঁড়া লাইন, বাঁকা রেখা বা তাদের উর্দ্ধগতি, নিম্নগতি এই নিয়েই কাজ।
কোনো রূপের অনুকরণ না করে কেবল সুরটিকে ধরার চেষ্টা।

বর্ষার মেঘে যেমন অনেক সাবজেক্ট একজায়গায় মিলেমিশে সংহত অবস্থায়
আবার একটাই ফর্ম দেখা যায় তেমনি অনেক বিষয়কে একজায়গায় ধরে বক্তব্য
প্রকাশের যে মুন্সীয়ানা, সেখানে প্রত্যেক বিষয়ের সবটা না থাকলেও বোঝা যায়
এই ভাবে কম্বিনেশন করার যে ফ্রিডম পাওয়া যায়, তা ঠিক ঠিক প্রয়োগের মধ্য
দিয়েই যে নতুন একটা ফর্ম যা চেনা যাচ্ছে না অথচ চেনা চেনা লাগছে, এই নতুন
ডাইমেনশনে একটা মিস্টিক ভাব, একটা অহেতুক ভাব পেতেন রামকিঙ্কর। যার
কোনো হেতু নেই, শুধুই আনন্দ, থাকে পয়সা দেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর
বলেছেন– 'তাই হয়তো শিল্পীরা এতো বোহেমিয়ান। পয়সা নেই খাওয়াও নেই
তাই বোহেমিয়ান বৈকি। ভারি মজা কিন্তু।'

মোটের উপর বিদ্বৎজনের বক্তব্য থেকে জানা যায়, রামকিঙ্করের অবদান হল
মিথিক মানসিকতাকে ভেঙে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে জীবনকে
বড় করে দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় করণকৌশলগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন
ভাবধারায় এক অনন্য শিল্প নৈপুণ্যের সাথে পরিচয় করানোর। এ প্রসঙ্গে তিনি
বলেছেন– 'ভারতীয় শিল্প ভালো লাগত না তা নয়, কিন্তু বাস্তবতার ভিতর দিয়ে
না গেলে সেটা সার্থক হবে না এটাই ছিল মূল ধারণা। বলেছেন– "I happened
to believe firmly that a realistic the approach was the sole
guarantee of success in the world of art." তো এজন্য রামকিঙ্কর নিজেকে
স্বতন্ত্র করেছেন। কোন আঙ্গিকে বা মিডিয়াম বা বিষয় বা শৈলী ব্যবহৃত হয়নি।
শিল্পের কোন অঞ্চলে এখনো একটিও আঁচড় পড়েনি তা ভেবেছেন। ইস্টার্ন বা
ওয়েস্টার্ন ট্রাডিশানকে পাশ কাটিয়ে বিশেষ শৈলীর বিশেষ টেকনিকের প্রয়োগ
করেছেন, যেখানে ভারতবর্ষের চিরায়ত লোকায়তিক রূপটিও বাদ যায়নি। শিল্পের
জন্য শিল্পের তাগিদে, আর্ট ওয়ার্কের ক্ষতি হবে ভেবে বিয়ে করেননি। নিজের
ন্যূনতম সুখ-সুবিধার বিষয় মাথাতেই রাখেননি। প্রেম এসেছে কিন্তু লেপ্টে যাননি।
মদ খেয়েছেন কনসেনট্রেশন ও ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্তে কিন্তু মাতাল হননি।
শুধু সৃষ্টি ও সুখের উল্লাস নয় রবীন্দ্রনাথের মতই এক বিরাট প্রয়োজনবোধ থেকে
ট্রাডিশন বজায় রেখেই এক অভিনব শিল্পচেতনা আমাদের উপহার দিয়েছেন।
কোণারকের পর সাতশোর বেশি বছর পেরিয়ে আকণ্ঠ পিপাসা মেটানোর মত সেই
অমৃত পান করে আমরা তৃপ্ত হয়েছি। গর্বিত ও সম্মানিত হয়েছি বিশ্বের দরবারে।

যাই হোক অতঃপর রামকিঙ্কর অন্যান্য মাধ্যমের উপর করা যেমন লিনো
খোদাই এবং এচিং লিথো ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় আসি, যেখানে আমরা দেখতে
পাবো সেই সব মাধ্যমের অন্তরস্থিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করে সেখানেও
তাঁর অনন্য নিজস্বতার স্ফূরণ এনেছেন, এক একটা জগতের উন্মোচন করেছেন।

১৯৩০ সালে এক বর্ণের লিনো খোদাই 'সহজপাঠ' আত্মপ্রকাশ করে। রামকিঙ্কর নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে ছাপাচিত্রের সৃজনধর্মীতা দেখেছেন এবং নিজ প্রতিভাবলে ছাপাচিত্রের অন্তরস্থিত মৌলিক চরিত্রটি উপলব্ধি করেছিলেন। বুঝেছিলেন ছাপাচিত্রও শিল্প প্রকাশের অন্য এক মাধ্যম বলে। তিনি মূল খসড়াটি করবার সময় মাধ্যমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করে সেইরূপ বিষয়ের পরিকল্পনা নিতেন। তার ফলে বিষয় ও ছাপাচিত্রের মাধ্যমটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হত। ফলস্বরূপ ছাপাচিত্রগুলি চিত্রধর্মী না হয়ে ছাপাচিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন যাঁরা, তাঁরা নকলনবিশ না হয়ে বরং প্রধান প্রধান শিল্পী হওয়ায় তাঁর কাজগুলি বিশেষ সার্থকতায় উৎরে গেছে খুব সহজেই। প্রতিটি প্রক্রিয়ার সহজাত গুণগুলিকে তিনি হৃদয়লীন করেছিলেন। মূল চিত্রটির সম্ভাব্য রূপটিকে উপলব্ধি করে বা মানসচক্ষে দেখে নিয়েই তিনি মূল খসড়ার পরিকল্পনা করতেন। বেড়ালের তুলতুলে ভাব ফোটাতে পিকাসোর মত লিথো করেছেন। কালবৈশাখীর তাণ্ডব রূপটিকে দেখাতে এচিং এবং ড্রাই পয়েন্টের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 'ধানকাটা', 'ধানবোনা', 'হলকর্ষণের' জন্য এটি যে উপযুক্ত তা বুঝেছেন। আবার দিনের শেষের পরিস্থিতি আনতে বেছে নিয়েছেন ড্রাইপয়েন্ট। সিমেন্ট ব্লকে কেয়াঝোপ করেছেন। পাখির ছানা লিনোতে। এছাড়া গোরুরগাড়ির কোলাজ তাঁর আরেক অনন্যসুন্দর নজিরবিহীন সৃষ্টি। যেখানে দেখতে পাই আরেক নতুন দিগদর্শন। ছাপাচিত্র প্রসঙ্গে এক আলোচনায় তিনি বলেছেন— 'মানসিকতার তফাৎ হয় উইথ দ্য মিডিয়াম'; একই সাবজেক্ট করি, কিন্তু কপি হয় না। কম্পোজিশন একই কিন্তু দেখ তফাৎ আছে অনেক। তিনটি তিনরকমের।' তিনটি ছবি তিনি করেছিলেন জলরঙে, তেলরঙে ও রঙিন লিথোতে। উপাদান ও প্রক্রিয়ার তারতম্যে একই বসন্তের ছবি তাঁর ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রতিটিতে গঠনরীতি ও বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। লিথোতে এনেছে রৈখিক অনুভূতি, স্পর্শনাভূতি ও সারফেস টেনশনে পরিবর্তন তথা অন্য দৃশ্যপট ও আমেজ।

তাঁর ছাপ চিত্রচর্চা শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের পোস্টার ছাপার জন্য সিমেন্ট ব্লকের থেকে রাবিং পদ্ধতিতে ছাপা নেওয়া থেকে। এই রীতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি কিছু ছবি ছেপেছিলেন। 'কেয়াঝোপ' তার মধ্যে একটি। তো মোটের উপর আমরা দেখতে পাই যেখানেই তিনি হাত লাগিয়েছেন তাঁর প্রতিভার পরশ মণির ছোঁয়ায় সেখানেই স্বকীয়তার অনন্য নজির গড়েছেন। ভারতের ইতিহাসে তিনি এক বিরল বিস্ময়কর ঘটনা। আমাদের জন্য রেখে গেছে শিল্পের এক অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার যার প্রত্যেক পরতে পরতে গ্লানিহীন আনন্দ উল্লাসের ছড়াছড়ি। প্রবল রসনাভূতিতে সান্দ্র।

রামকিঙ্কর মানসিকতায় বাস্তববাদী ছবি করায় একটা সুচিন্তিত পছন্দের কারণে সামাজিক গ্লানি, অসাম্য ও নিপীড়নের কথাই বার বার উঠে এসেছে। তাঁর প্রাথমিক ও প্রধান বিষয়ই ছিল নিচুতলার খেটে খাওয়া দারিদ্রপীড়িত বুভুক্ষু মানুষজন। এছাড়া দুর্ভিক্ষ পর্বের বিভিন্ন ছবিগুলি তাঁকে মূলত সমাজবাস্তববাদী শিল্পী হিসেবেও বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে। তাঁর ছবিতে কিউবিজম, ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, রিয়্যালিজম, সুর্যারিয়ালিজম এর কোনটাই বাদ যায় না। অত্যন্ত দক্ষ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে করা তাঁর কাজগুলিতে নানান ইজম ছড়িয়ে আরো বড়ো কোনো বক্তব্যের শিল্প সৌন্দর্যের গঠন কাঠামোর দিকে চলে গেছে। এক নতুন ধারার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শিল্পী মনের গভীরে একটা ছন্দের চেতনা স্থায়ী ভাবে থাকে। সেই চেতনার দ্বারা শিল্পী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করে থাকেন। এই প্রকাশ ব্যাপারটি ব্যক্তিগত, যেহেতু একই বিষয়কে শিল্পীরা বিভিন্ন রূপে দেখে থাকেন। শিল্পী তাঁর এসথেটিক ট্রেনিং জীবনের অভিজ্ঞতা সৌন্দর্য অনুভূতি, আবেগ নৈসর্গিক সচেতনতার মিশ্রণে যে উপলব্ধিজাত রূপের প্রকাশ ঘটান তাকেই শিল্পের ভাষায় আর্ট বলা চলে। রামকিঙ্কর এই শিল্পীত রচনাকে একটি অহৈতুকীর প্রকাশ বলেছেন। অহৈতুক বলতে অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় যে রচনার হেতু মাত্র আপনা হতে রসের উদয় তাকে বলতে পারি অহেতুক রচনা। না হলে হেতু নেই কারণ নেই কোনো কিছুর মিমিত্তও নয় অথচ রচনা হল কিছু এমনটা হয় না। রামকিঙ্কর বলেছেন— 'আমার কাছে কিন্তু আর্ট হচ্ছে অহেতুক। যার কোনো হেতু নেই। শুধুই সৌন্দর্য শুধুই আনন্দ। যাকে পয়সা দেওয়া যায় না।'

প্রকৃত অর্থে বলা যায় যাবতীয় সৃষ্টির কাজে এই আনন্দই প্রধান তা সৃষ্টির পুরস্কার। আনন্দ না থাকলে খেতে না পেলেও শিল্পী তাঁর সৃজনকর্মে মগ্ন থাকেন কি করে? এই আনন্দই তো ছিল রামকিঙ্করের জীবনে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র অর্জন ও প্রেরণা। দিল্লীর যক্ষযক্ষী নির্মাণে পাওয়া পাঁচলক্ষ টাকা সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টাই করেননি তিনি। সে সবে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না থাকায় হরির লুট হয়ে গেছে। তিনি পুনরপি নগণ্য পেনশনের টাকায় নির্ভরশীল দরিদ্রের দিনাতিপাত করেছেন। তাঁর সারাজাবীনের মডেল তথা সঙ্গিনী রাধারাণীর স্থূলদেহটা স্টাডি করে যক্ষী বা লক্ষ্মীর প্রতীক রমণী জাতির সূক্ষ্ম ইনার স্পিরিটকে ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য রাধারাণীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ছিল তাঁর। ঠিক সময়ে রাধারাণীর সাথে পরিচয় হওয়ায় ভগবানকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তারই ছাত্র রবি পালের সাথে কথা প্রসঙ্গে। তিনি যক্ষযক্ষী নির্মাণের প্রায় সব টাকাই তুলে দিয়েছেন রাধারাণীর হাতে। বলেছেন আমাদের ঘর থেকে কখনও যাবে না, তোমারি টাকা অনেকগুলো

পেলাম। তোমার যত দরকার হয় নাও। এ কথা রাধারাণীর কাছে পাওয়া। রাধারাণী বলেছেন বহু টাকা দিয়েছিল আমাকে যে কত টাকা দিয়েছিলেন হিসেব কিছু নাই।'

যাই হোক রামকিঙ্কর ভারতবর্ষের প্রকৃতযোগীর মানসিকতায় কোনো লাভালাভির হিসাব মাথায় না রেখেই মূলত শিল্পের জন্যই শিল্প সাধনা করে গেছেন। আবার বলি আনন্দই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন ও পথ চলার সাথী ও প্রেরণা। শিল্প সাধনায় সৃষ্টির মুহূর্তগুলিতে শিল্পী যে পরমানন্দের স্বাদ পেয়ে থাকেন সেখানে তুচ্ছ লাভালাভের কোনো আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'আমি যদি আনন্দ না পেতাম তবে কাজ করতাম না।' বস্তুত ঐ আনন্দের ফল্গুধারায় ভেসে বহু কাজই তিনি করেছেন। অথচ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেকাংশই যা দেশের পক্ষে মর্মান্তিক ক্ষতির কথা।

কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'চার বছর ধরে আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে জেনেছি যে তিনি গড়ে একটি করে জলরঙ ড্রইং করেছেন প্রতিদিন। গোড়ার দিকে ইতিমধ্যেই প্রচুর ড্রইং করেছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তাঁর এই ধারা মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছুটি কিংবা অল্প সময়ের জন্য যখনই তিনি শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও গেছেন কাঠমাণ্ডু, শিলং, রাজগীর, ভীমবাঁধ কিংবা বৈজনাথ, গয়া, পুরী, প্রভৃতি জায়গা থেকে সঙ্গে করে এনেছেন গাদা গাদা ড্রইং এবং জলরঙের কাজও। এই ড্রইং এবং জলরঙের ছবি ছাড়াও তেলরঙের বহু ছবিও নষ্ট ও বেহাত হয়েছে। এবং এই হারিয়ে যাওয়ার গণনায় বহু প্রতিকৃতি ভাস্কর্যও আছে।' এ সম্পর্কে কোনো এক আলোচনায় কে. জি. সুব্রামনিয়াম বলেছেন– 'এইসব প্রতিকৃতিগুলি তাঁর ভাস্কর্যের সামান্য অংশমাত্র। তিনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশি কাজ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত যার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। এমনকি ফটোগ্রাফেও ধরে রাখা হয়নি।' তিনি দুঃখের সঙ্গে আরও জানিয়েছেন– 'তিনি তো বটেই, তাঁর নিকটতম কেউই এদিকে নজরে দেননি কোনোদিন। এ ব্যাপারে তাঁর দোষই বেশি। কারণ কোনো কাজ শেষ করার পর ভালোভাবে সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা খুব অল্প তাকিয়ে দেখতেন তা। সেই সমস্ত কাজের সম্পূর্ণ কোনো তালিকা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এই ভাবেই তাঁর অনেক কাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আক্ষরিক ভাবেই নির্বিকার নির্মোহ এই শিল্পী শুধু তাঁর কাজের প্রতিই যত্নবান ছিলেন কিন্তু 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এই গীতার বাণী মনে রেখে উদাসীন দার্শনিকের মতই গ্রহণ করতেন তার ফল।' তিনি সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন– 'ফল চাই না হে কোনো ফলই চাই না আমি।'

বর্ষার দিনে ফুটো খড়ের চাল বেয়ে বৃষ্টিধারা রুখতে তৈলচিত্রগুলোকে মশারির

উপর বিছিয়ে রাখার দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য এই লেখকেরও হয়েছে। চাওয়া মাত্র অমূল্য চিত্র, ভাস্কর্যগুলি বিলিয়ে দিতে পারতেন তিনি। এমনই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মানুষ তথা মহামানুষও বলা যায় যাঁকে, সেই আত্মসুখ বিসর্জনের শিল্পী যিনি শুধু শিল্পের জন্য শিল্পর সাধনায় তৎকালীন শ্মশানঘেঁষা বিদ্যুৎবিহীন বাড়িতে হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে নির্জনে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন।

তথাপি তাঁর জীবনী বিকৃত করতে, কালিমা লেপন করতে কিছু মানুষদের উৎসাহ শুধু নয়, বিশেষ উৎসাহ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যেতে হয়, মনে হয় সত্যি কী বিচিত্র এই মানুষ! কী বিচিত্র এই দেশ! আসলে কথায় আছে না জহুরী জহর চেনে। তাই জহর চিনতে গেলে কিছু বিদ্যার বুদ্ধির যে দরকার পড়ে। কুকুরের মানসিকতায় তো আর তুলসী গাছ চেনা বা বোঝা যায় না। মানুষ হতে হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের কিছু রূঢ় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন– 'সকল দেশেই কোনো শিল্পীর আপন রচনা প্রশংসার ব্যাপ্তি পেলে অন্য শিল্পীদের হিংসার অভিব্যক্তি দেখা যায় বটে কিন্তু তার চেহারা ও বিষ এখানকার মতো এত তীব্র নয়।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আজীবন আকর্ষিত এই শিল্পী প্রতি জন্মাষ্টমীতে ছবি এঁকেছেন কৃষ্ণের। বাঁকুড়া থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া 'গীতা' বইটি ছিল আত্মবিশ্বাস ও অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা। তিনি এক মহাযোগীর মতই আমরণ শিল্পের ধ্যানই করে গেলেন। এক আত্মকথনে বলেছেন– 'শিল্পের মাধ্যমে উপাসনায় রত থাকাটাই বুঝি আমার জীবন দেবতার অভিপ্রায়।'

আর তাই সে উপাসনার জন্য তিনি কোনো বাধাকেই বাধা মানেন নি। হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই দিয়ে একাগ্র চিত্তে ভক্তিভরে তাঁর নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। বাজারে কেনা শুকনো রঙ, তিসির তেলে গুলে, চটের উপর অথবা সাঁওতালী দু-সুতি চাদরের উপর মোটাসোটা রঙ লাগিয়ে কাজে মত্ত থাকতে শিল্পী শঙ্খ চৌধুরীর মত এই লেখকেরও দেখা। কাঠের তক্তাকে বারান্দায় খাড়া দাঁড় করিয়ে ইজেল আর একটা আস্ত টেবিলই ছিল তাঁর সুবিধাযুক্ত প্যালেট। আর্টওয়ার্কের ক্ষতি ভাবনায় বিয়েতে ভয় পেয়েছেন। একটি ভাষণের খসড়া লিপিতে তাঁর অন্তরের কথা জানা যায়। লিখেছেন গরীবের শিল্পী ছেলের কল্পনা। একটা পথ খোলা রয়েছে সংসারের মধ্যে না ঢোকা। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন বিয়ে করব ঘর সংসার করব– আমার এ ইচ্ছে কোনো দিনই ছিল না। খালি কাজ করব, এই লক্ষ্য ছিল।... বিয়ে করলে তা সম্ভব হত না। ঘর বাঁধার সুখ আমার শিল্পের কাছেই মিটে যায়।' আরেক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'বিয়ে করিনি, সময় পেলাম কই। বিয়ে করলে

কী হত? এক গাদা কাচ্চা বাচ্চা হত। বৌয়ের নানা ঝামেলা মেটাও। তারপরে হত অভাব চাল-ডাল-লকড়ি– সব কিছুর যোগান চাই। ব্যাস আর্ট ওয়ার্কের দফা ফতে।' আমি বাবু ও রাস্তায় যাই নি। আমি বুদ্ধ। আমি বুদ্ধ হয়ে গেছি। বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি।

রামকিঙ্করের বুদ্ধত্বের কথা অবশ্য সর্বাংশে সত্য। তাই তো তিনি তথাগতের ঐ ধ্যানস্থ রূপটিকে কংক্রিটের সুনিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ধ্যানীর মধ্যে দিয়ে ধ্যানকে। তো রামকিঙ্করকে বুদ্ধত্বে দেখার সৌভাগ্য এ লেখকের হয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে দু-বছর থাকা কালে। ভাবতে ভালো লাগে জীবনে এমন একজন প্রতিভাধর মহামনীষীর সংস্পর্শে তো থেকেছি। কথা বলেছি, তেল রঙে ওয়াটারে ও পেনসিলে এবং 'স্পিড' মূর্তিটির কাজেও সেখানে পড়ে থাকা দিল্লী থেকে আনা পাথরে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। নানা তালে ঘুরতে রাজি না থাকা রামকিঙ্করকে দেখেছি অর্জুনের মত লক্ষ্যে স্থির থাকতে। তাইতো লক্ষ্যভেদ করেছেন একের পর এক ঠিক অর্জুনের মতই। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'তাঁর জীবনে এক বৈরাগী বসবাস করত। এক আসক্তি শূন্য বৈরাগ্য তাঁকে সর্বক্ষণ ঘিরে থেকেছে। জাগতিক অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল না। এমন বৈরাগ্য না থাকলে অমন সৃষ্টিও সম্ভব নয়।'

আমরা জানি কিশোর বয়সে তিনি একটি ড্রপসিন এঁকেছিলেন থিয়েটারের জন্য। একটি উড়ন্ত হাঁসের পিঠে বসা শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। পরবর্তি [redacted]। পরবর্তীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ মুখাবয়বের একটি ক্রে রিলিফও করেছেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ কিশোর রামকিঙ্করকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। দীক্ষিত ভক্ত অনুরাগী বহু স্থানীয় জনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ মঠের আশু মহারাজ ও শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত শিষ্য লালবাজারের অধিবাসী বিভূতি ঘোষ মহাশয়ের খবরা-খবর জানানোর জন্য ব্যাকুলভাবে ভাইপো দিবাকরকে চিঠি লিখতেন। যার দু-একটি এখনও আছে। সে যুগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত সাধারণ কর্মী থেকে বিপ্লবী সবার কাছেই 'গীতা' বইটি ছিল প্রেরণা ও শক্তির উৎস। বলাবাহুল্য রামকিঙ্করও পথ চলার সাথী করে রেখেছিলেন তা। একথা জানা যায় কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে মগ্ন হয়ে পড়তেন তিনি। 'শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারী' গ্রন্থে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি জানাচ্ছেন– "কৃষ্ণের জন্ম এই সাবজেক্টটা নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই ছবি আঁকি। গত বছরেও এঁকেছিলাম 'বন্দী'– আর একটা এঁকেছিলাম বসুদেব পাশে বসে, দেবকী শোওয়া। বাচ্চাকে তখনও নিয়ে যায়নি। হ্যাঁ আর একটা মনে পড়ছে সে ছবিতে করেছিলাম কংস দেখছে কৃষ্ণ জন্মাচ্ছে।

বুঝলে বর্ষাকালটা এলেই খুব মনে পড়ে এই জন্মাষ্টমীর কথা। কী রকম জানো? দুর্যোগের রাতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাজ পড়ছে এসব দেখলে মনে হয় এই বুঝি জন্ম হচ্ছে কৃষ্ণের। কেন এমন হয় বলো দেখি?"

বস্তুত আমরা যাকে মনের মণিকোটায় জীয়ন্ত রাখতে সত্যই স্মরণে রাখার মধ্য দিয়ে, তিনিই তো সেখানে বিরাজমান থাকেন। রামকিঙ্কর ছিলেন বাইরের রাজসিক ভাবের আড়ালে অন্তরে অন্তরে একজন ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী নতজানু ভক্ত মানুষ। তাই তো মাথায় বিশাল জটা, পাতলা তেজযুক্ত মুখমণ্ডল যাঁকে দেখে শিহরিত হন রামকিঙ্কর ছাত্র মদন ভাটনগর। সেই 'মহাত্মা শ্রীরামকে' নত হয়ে প্রণাম করে রামকিঙ্কর বলেছিলেন আপনি রাম আমি রামকিঙ্কর। শুনে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন সেই যোগী পুরুষ– যাঁর নির্মাণের জন্য তাঁর শিষ্যদের অনুরোধে এই রামকিঙ্কর ও তাঁর ছাত্রের যাওয়া সেখানে। অবশেষে পোর্ট্রেটের কাজ সমাপান্তে দ্বিপ্রাহরিক আহারকালীন ভাটনগরের থালা থেকে পড়ে যাওয়া কিছু ভাত তুলে নিতে বলেন রামকিঙ্কর। বলেছিলেন মাটি থেকে ভাত তুলে নাও মহাত্মার প্রসাদ পায়ে লাগবে। তো রামকিঙ্করের মানসিকতার এই দিকগুলিও তাঁর শিল্পভাবনার অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এগুলি পর্যালোচনা না করলে তাঁর বিরাট শিল্পব্যক্তিত্বের উৎস বা মূল রহস্যটি কী? তা ঠিক ধরা যায় না বা পূর্ণতা পায় না। আজকের এই আত্মম্ভরী শ্রদ্ধাহীনতার যুগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৎ মানুষকে দিশা দেখাতে পারে এই ভাবনায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা। যদিও এর প্রাসঙ্গিকতা কারো কাছে বা অবান্তর লাগতে পারে তথাপি 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার' এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ রেখে শেষ করা যায় এর বিতর্ক।

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ সংসর্গ এই তিনের সংযোগ ছাড়া সিদ্ধি আসে না। আমাদের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের এই মতানুযায়ী রামকিঙ্করের জীবনেও শিল্প সিদ্ধিলাভ এসেছিল মূলত এই মহৎ তিনটির সংযোগের ফলশ্রুতিতেই। রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সান্নিধ্যে ও শিল্পসিদ্ধি লাভের প্রবল ইচ্ছার সাথে রামকিঙ্কর যে অবিসংবাদিত সত্য মানুষ্যত্বের যোগে শিল্পসিদ্ধি লাভের ক্ষেত্রটিকে ত্বরান্বিত করে কলাকৈবল্যের পীঠস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। সোমনাথ হোর বলেছেন– 'কিঙ্করদা পানাসক্ত ছিলেন।... কিন্তু আশ্চর্য ১৫/২০ বছরের ঘন পরিচিতি কালেও তাঁকে কোনদিন বেসামাল হতে দেখিনি। এমন ভদ্র শান্ত সমাহিত চরিত্র দুর্লভ। অথচ সাধারণ ধারণায় ভদ্রলোক বলতে যে চেহারা ফুটে ওঠে উনি ঠিক তা ছিলেন না। যাঁরা জানতেন তাঁরাই বলতে পারতেন কি অসাধারণ শক্তিধর এই মানুষ, প্রকৃতির মাঝে অবাধে বিচরণ করতেন সভ্যতার সমস্ত বাহুল্য বর্জন করে এবং কারও এতটুকু বিরক্তি উৎপাদন না করে। আরও

বলেছেন– 'রামকিঙ্কর দেবশিশু ছিলেন, পরিণত বয়সেও তিনি দেবতা হতে পারেননি; কারণ অসূয়া-পরশ্রীকাতরতা অথবা পরস্ত্রীগমনে পারদর্শীতা কোনটিই তাঁর আয়ত্তে আসেনি। এমন নির্মল চরিত্র স্বভাব শিল্পী বহু বছরের ব্যবধানে কোটি কোটিতে একজন আসেন।'

তথাপি মানুষটির সম্পর্কে যেভাবে আমাদের ভাবনা কাজ করছে তা কেবলই তাকে শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও হেয় করেই চলেছি,– বলেছেন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে সুকৌশলে অতীব ধূর্ততার সঙ্গে রামকিঙ্করকে মানুষের সামনে হেয় করে তুলে ধরার চেষ্টা, তার অমর সৃষ্টি জগতের বিস্ময় তাকে হাজির করার বদলে। রামকিঙ্করের জাতিগত কৌলিন্য ছিল না এবং অদূর ভবিষ্যতেও দারিদ্রপিষ্ট নিরক্ষর জাতটার থেকে কোনো সাপোর্ট পাওয়া দূর অস্ত এই নির্মম সত্যটি আজকের গুরু ঠাকুররা ভালভাবেই অবগত আছেন। তাঁর ছাত্র অনুরাগীদের থেকে কিছু প্রতিবাদের স্বর শোনা গেলেও তা অতীব ক্ষীণ। তবে তাঁর জীবিত সময়ে একবার একটা প্রতিবাদের ঝড় দেখা গিয়েছিল তাঁর ছাত্র অনুরাগী ও সুহৃদজনদের কাছ থেকে যখন ডঃ সুধীন ঘোষ নামে জনৈক নাট্য পরিচালক রামকিঙ্করকে বেত্রাঘাত করেন।

কারণ হিসেবে যা জানা যায় ১৯৫৭ সালে 'আন্তিগোনে' নাটকের শেষ মহড়ার দিন স্বাভাবিক সহৃদয়তায় পরিচালককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিঙ্করদা। হলো হিতে বিপরীত। উক্ত পরিচালক মহোদয় যিনি তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, অন্তত আরো একজন কর্মীকে প্রহার করেছিলেন এবং বর্বরতার অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনিই লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করলেন কিঙ্করদাকে। বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র আমিই এই শোচনীয় ঘটনায় দর্শক ছিলাম। পরিচালকটির হাত থেকে কিঙ্করদাকে উদ্ধার করি আমিই। লিখেছেন তৎকালীন বিশ্বভারতীর শিক্ষক শ্রীবিশ্বজিৎ রায় মহাশয়। এর পরের ঘটনা পরিচালকের পক্ষ নিয়ে হাস্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন একজন সাহিত্যিক এবং পরিচালকের সম্মান রাখতে অন্য এক সাহিত্যিক লিখলেন এক উপন্যাস। এছাড়াও পরিচালক অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষের পক্ষ নিয়ে সেই সময়ে ঐ ঘটনায় সোচ্চার হয়েছিলেন ডঃ ঘোষের গুণগ্রাহী সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার এগারো পৃষ্ঠায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত সংবাদ ছাপা হয়। ঐ সংবাদের সঙ্গে শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য ছাপা হয়। সেই বক্তব্যে তাঁরা প্রত্যেকেই এই ঘটনার নায়ক অধ্যাপক ডঃ সুধীন ঘোষকে দোষারোপ করেন এবং সত্য ঘটনার বিবরণ দেন। ফলত এখান থেকেই রামকিঙ্কর প্রতি বিদ্বেষের সূত্রপাত। পরবর্তী কালে



বিমূর্ত, ডোকরা ঢালাই



অনামা, তারিখহীন।। কাগজের উপর জলরঙ



অনামা (ধানঝাড়া)।। জলরঙ



অনামা (ধানঝাড়াই)।। তৈলচিত্র ১৯৬০



দুর্গের সামনে।। গানি কাপড়ের উপর তৈলচিত্র



শ্রীকৃষ্ণের জন্ম



স্বগৃহে আবদ্ধ ।। জলরঙ ।। আনুমানিক ১৯৪০



কোণারকের পথে ।। প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী, কলকাতা



কাজের অবসরে ।। তৈলচিত্র



কৃষক।। তৈলচিত্র



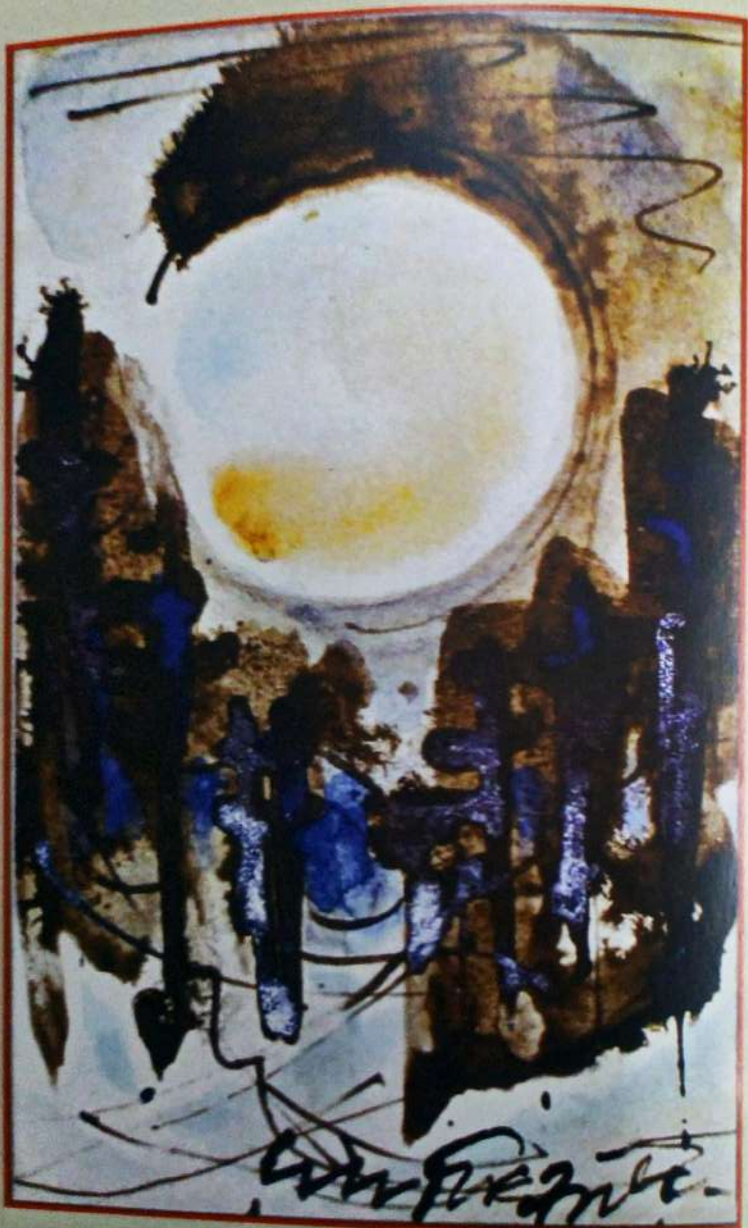
আরাকানের পাহাড়ে।। তৈলচিত্র ১৯৬১



অনামা (ইজিপসিয়ান বেবুন)।। বরোদা, ৩.০২.১৯৫৩



অনামা (বৈজনাথ ভূচিত্র) কাগজের উপর কালি ও জলরঙ।। ২২.০৬.১৯৬১



ভূচিত্র।। নন্দন মিউজিয়াম, কলাভবন

রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনের প্রায় সমাপ্তি পর্ব যখন, সে সময় কলকাতার আধুনিক ভাস্কর্যের চেহারাটা কি রকম জানার অভিপ্রায়ে রামকিঙ্করকে শহরের বিভিন্ন চৌমাথায় বসানো ভাস্কর্যগুলি দেখানো হয় আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে। কিন্তু তাঁর সরল নিরপেক্ষ মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কলকাতার ঐ সমস্ত ভাস্কর্যের স্রষ্টা থেকে বহু শিল্পী বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট মানুষজন সহ আরো অনেকেই। যুক্ত হয় বিদ্বেষের আরো এক বিস্তৃত পর্যায়– যার আক্রোশ থেকে সম্ভবত কোনোদিনই আর রেহাই পাবেন না রামকিঙ্কর। তাঁকে বিকৃত করা, দাবিয়ে রাখা ও তাঁর কাজ নানান অজুহাতে বিনষ্ট করার চেষ্টা চলতেই থাকবে। যেমন তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির পর এই সেদিনও গান্ধীমূর্তিকে গান্ধীজীর প্রতি অপমান বলে ভেঙে ফেলার কথা উঠেছিল, যেখানে ঐ মূর্তি বিষয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন– 'এই মূর্তিটার মধ্য দিয়ে আপনি একেবারে রিয়েল গান্ধীজীর অবদান মূর্ত করতে পেরেছেন।'

শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'আমরা ইদানীং তাঁকে নিয়ে যে চরিত্রের বর্ণনা দিই অমনটি ভেতর থেকে হলে কি কেউ অমন কালজয়ী শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন? তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে না পারলে আমরা কোনোদিন এমন দৃপ্ত রসময় কিঙ্করদাকে বুঝতে পারব না। মনন চাই, অধ্যবসায় চাই, নিজেকে অর্পণ চাই– তবেই এমন মাপের শিল্পীকে খানিক বোঝা যায়। আমাদের মধ্যে তাঁকে দেখার, সত্যকেই জানতে হবে, বুঝতেও হবে। তাঁকে যেন অসত্য দিয়ে ঢেকে না'ফেলি।'

রামকিঙ্কর সম্পর্কে রামানন্দের এই অন্তরনিঃসৃত অভিমত বিদ্বেষদুষ্ট মগজগুলোয় না ঢুকলেও তাঁরা এ কথা জানেন যে প্রতিভার একক অবদানে আধুনিককালে আমাদের ভাস্কর্য মুক্তির স্বাদ পেল যাঁর হাত দিয়ে, তিনি রামকিঙ্কর। চিত্র ও ভাস্কর্যে আধুনিকতার সঙ্গে সনাতন বা চিরায়তের সমন্বয়ই হল রামকিঙ্করের শ্রেষ্ঠ অবদান। তো আমাদের ভাস্কর্য প্রায় আট-ন'শো বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে যে মুক্তির স্বাদ পেয়ে আপন স্রোতের সাথে মিলে নবোদ্যমে চলতে শুরু করল রামকিঙ্করের হাত ধরে, ইউরোপ সেই মুক্তি দেখেছে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর পর মাত্র শ'তিনেক বছরের ব্যবধানে শিল্পী রঁদার হাত ধরে। রঁদা প্রকৃতির সত্য ও শিল্পের সৌন্দর্য এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে ফিরিয়ে এনেছেন। তাই তিনি বলেছেন– 'কিছুই আবিষ্কার করিনি আমি। আমি কিছু হারিয়ে যাওয়া সত্য ও পদ্ধতির পূর্ণবিন্যাস ঘটিয়েছি।'

রামকিঙ্কর হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে খাজুরাহো পর্যন্ত এবং তারও পরে যে বাংলার মন্দিরগুলোর আলোকিত ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য দেখেছিলেন তার সাথে রঁদা ও

তার পরবর্তী কালে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাভাবনা ও স্বদেশের সমকালীন বাস্তবতার চিত্রও ছিল— এই পশ্চাৎপটের উপর দাঁড়িয়ে তিনি লোকায়তিক জীবন প্রবাহকে একযোগে আধুনিকতা ও চিরায়ত ভারতীয়তার মূল্যমানে ভাস্কর্যের রূপ দিলেন। ভারতবর্ষের মানসিকতার যে পূর্ণতা বোধ, ঐক্য ও গতিময়তার বোধ– যার প্রতিফলন দেখা যায় ভারতীয় ভাস্কর্যের মসৃণ সুগোল সুডৌল আয়তনময় প্রবহমানতার রূপাবয়বে সেই নিটোল বর্তুলতাকে ভেঙে ঘনকবাদী রীতিতে কতকগুলি তলে বিন্যস্ত করে যেগুলি তীক্ষ্ণ সরলরেখায় পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে আয়তনিক পূর্ণতার মধ্যেও ঋজু তীক্ষ্ণতার ভাব আনা হয়েছে সেখানেই রামকিঙ্কর স্বতন্ত্রতা। ঘটেছে মুক্তির হিল্লোলে ভেসে যাওয়া জলকল্লোলের উচ্ছাসের প্রতিফলন।

এর সাথে সিমেন্ট কাঁকড়ের মিশ্রণ ছুঁড়ে লাগানোর পদ্ধতিতে ফুটে ওঠা যে টেক্সচার যার ফলে মূর্তির মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়, এখানেই তাঁর বিরাট এবং বিস্ময়কর কৃতিত্ব। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'যেমনি স্টাইল ভেঙ্গে গেলো অমনি সেটা জনে জনে, কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেলো– নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে। নতুন কবি নতুন আর্টিস্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন স্টাইল উল্টে-পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে।' আরও বলেছেন– 'পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা স্রোত বেয়ে আস্তে আস্তে বড় শিল্পরচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে।

রামকিঙ্কর সুন্দরের থেকে সত্যের উপর জোর দিয়ে বিশ্বভারতীর ও কলকাতার নব্য বঙ্গীয় ধারা ঠেলে বেরিয়ে এসেছেন। ক্যারকটারের প্রয়োজনে পেলবতা মুছে এনেছেন কর্কশ চারিত্রিক দৃঢ়তা। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এনেছেন ভারতীয় আদিমতায় এক সম্পূর্ণ আধুনিক আদল। তাঁর কাজে রদাঁ ও এপস্টাইনের কিছু ছাপ থাকলেও তিনি শিল্পরীতির ভাবনায় আরো বড়ো কোনো সীমানার দিকে চলে গিয়েছেন।

'মূর্তিগুলির অবয়ব রদাঁর মতো না হয়ে হয়েছে গাঠনিক এবং এইজন্য মূর্ত ও বিমূর্তের সমঝোতায় মধ্য দিয়ে এদের প্রকাশ ঘটেছে। আলম্বিত গঠন, অক্ষরেখার উপর ভারসাম্য রেখে মূর্ততার মধ্যে এটি নির্মাণের বিমূর্ত নীতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। শিল্পী কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন জলরঙ, তেলরঙ বা ভাস্কর্য যাই হোক না কেন তাঁর সবচেয়ে ভালো কাজগুলির একটি স্থির বৈশিষ্ট্যই হল আবেগময়

উত্তেজনা এবং গঠন বিন্যাসের মধ্যে একটি ডায়নামিক ব্যালেন্স। রামকিঙ্কর কাজ ক্রমশ হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি কিউবিস্টিক ও এক্সপ্রেশনিস্টিক। তিনি রোমান্টিক বিবরণধর্মীতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। দৃশ্যময়তা অবস্থান ও মাত্রার বিচারে পরিবেশীয় ভাস্কর্যগুলি তাঁর নিখুঁত সৃষ্টি। এগুলি বেশিরভাগই বিশাল মাপের মনুমেন্টালীয় এবং কর্ম ও ধারণায় নতুনত্বের স্বাদবহনকারী। সিমেন্ট কাঁকড়ের মিশ্রণ ছুঁড়ে লাগানোর পদ্ধতিতে এর ফুটে ওঠা জৈব টেক্সচারের ফলে পরিবেশের সাথে দ্রুত যুক্ত করেছে। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'এই টেকনিকের একটা বড় লাভের দিক কী জানো? ঐ রাফ সারফেস। খুব মনের মতো। বেশ টেক্সচারটা আসে। রাফ সারফেসে লাভ হয়। দুটো লাভ। প্রথমতঃ পালিশ করা মুখ বডি অনেকটা আন-ন্যাচারাল। আর দু-নম্বর হলো, এই রাফনেসে চমৎকার টেক্সচার আসে এই টেক্সচারের গুণে জোর প্রকাশ পায় আর মূর্তির সবটা টেক্সচারে বাঁধা থাকে। আবার আলোর খেলায় বিশেষ বিশেষ জায়গায় জোরও পড়ে। এই রাফনেসটা আপনি আসে করার সময়, ওটা জোর করে লাগানো নয়। ওর জন্ম ভিতর থেকে, ওটা প্রোসেসের মধ্য থেকেই জেগে ওঠে। আর থ্রোইংয়ে ওটা খব সহজেই হয়। তাঁর কাজ গাঠনিক গভীরতা ও জৈবতার মধ্য দিয়ে কর্মের মত্ততায় মেতে ওঠা এবং এক্সপ্রেশনিষ্টিক গুণ আর উপরিতলের অমসৃণ টেক্সচার যা ঘষা-মজা মসৃণ শিল্পের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আলো প্রতিফলিত না করে বরং আলো শুষে নেওয়ার ও আলোর খেলায় মেতে ওঠার আনন্দে ভরপুর এক দৃশ্যময় রূপ। রামকিঙ্করের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য যা শিল্পী জনকঝংকার নার্জারীর লেখা থেকেই বুঝে নিতে পারি আমরা।

তিনি লিখেছেন– 'তাঁর করা মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলি তা মূর্তই হোক বা বিমূর্ত এবং তাদের ফরম ও স্টাকচার যাই হোক না কেন এগুলির ছন্দে প্রাইমারি স্ট্রাকচারের প্রাধান্যই বেশি। যেমন লম্বালম্বি দাঁড়িয়ে থাকা সুজাতা, তির্যক ভাবে ছুটে যাওয়া কলের বাঁশি। স্থাপত্যগত শক্তিবান সাঁওতাল পরিবার অথবা ভারসাম্যতায় আড়া আড়ি দাঁড়িয়ে থাকা 'ধানঝাড়া' এগুলির প্রত্যেকটিই গাঠনিক উপবৃদ্ধি এবং অক্ষরেখার ভারসাম্যের (axis Line) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। এটাই তাঁকে আমাদের সময়ের অন্যান্য ভাস্করদের থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সরিয়ে আনে। এছাড়া তাঁর কাজে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে তিনি ইউরোপের কিউবিজমকে অনুকরণ না করে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতেই মাত্র ব্যবহার করেছিলেন।' সেই তথ্য জানাতে গিয়ে শিল্পী অরুণ পাল বলেছেন– 'পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পে কিউবিজম মূলত আকারের বিশ্লেষণ, বিভাজ্যকরণের প্রয়াস। সমতল পটে আকারে ঘনত্বকে স্ফটিকের স্তরে বিন্যস্ত করা বা পরস্পরকে সংগ্রথিত বা

সংবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী নক্সায় রূপকে বেঁধে ফেলাতেই কিউবিস্ট রীতির তাৎপর্য নিহিত। এভাবে বিশ্লেষিত আকার জড়, আবেগহীন এবং জ্যামিতিক বিন্যাস মাত্র। রামকিঙ্করের চিত্রে বা ভাস্কর্যে মানুষজনের দেহাবয়ব শক্ত সমর্থ। শ্রমে বিশ্রামে সেইসব মানুষজনের ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত করেছেন মেরুদণ্ডীয় অবস্থান অনুযায়ী এবং প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী অনুযায়ী সংবেগকে, যা ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যে বিশিষ্ট ভাবে বর্তমান এবং তাদের সহজ স্ফূর্তিদ্যোতক ভঙ্গিমার ইঙ্গিত সেখান থেকেই পেয়েছেন। অন্যদিকে শক্তিদ্যোতক উত্তলঘন শরীরি অংশগুলিকে আরও সৌষম্যে সমৃদ্ধ করতে কিউবিস্ট ধরনের ভারি এবং ঘনতল বা স্তরের সংঘবদ্ধতা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

রামকিঙ্কর কিউ বিজমের এই স্বতন্ত্র ব্যবহার বিষয়ে কে. জি. সুব্রমণিয়ামের বক্তব্যটিও আমাদের বুঝতে সাহায্য করে রামকিঙ্করের মানসিকতার মূল সুরটিকে। যেখানে তিনি ভাব অনুযায়ী নতুন ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন– 'ড্রইংচিত্র, ভাস্কর্য যাই হোক না কেন পরবর্তী কালে তাঁর সমস্ত কাজেই কিউবিজমের প্রভাব স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই প্রভাব ছিল স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল, তা মূল কিউবিক এথিকসকে এড়িয়ে গিয়ে অবজেক্ট এবং স্পেসের সঙ্গে একটা স্টিরিও ভিউসিয়াল সম্পর্ক তৈরি করে। অবজেক্ট স্পেস কমপ্লেক্সের ইমেজকে বিশ্লেষণ করতে করতে যা পূর্ণ গঠিত করে অবজেক্ট ইমেজ বা স্পেস ইমেজ বা পূর্বাপর সমস্ত ভিউসিয়াল লজিককে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। মাত্রাও অভিব্যক্তিকতায় তাকে এক নতুন জায়গায় পৌঁছে দেয়। তিনি কিউবিজমের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই তবুও তাঁর সেই সমস্ত কাজ যাঁ একমাত্র তাঁর কাজের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তা মৌলিকতায় উজ্জ্বল।'

শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন– 'তিনি কিউবিজম করছেন কি কি করছেন তাতে কী এসে গেল, যার এরকম কন্‌সিস্‌টেন্সি তিনি সবই করতে পারেন। কিউবিজম দেখুন না, সেটা তিনি এসিমিলেট করে দিয়েছেন। এখন যাঁরা স্কাল্পচারে, কিউবিজম দ্যাখে একবার তাঁদের রামকিঙ্কর বেইজকে দেখতেই হবে।'

সাঁওতাল পরিবার ও কলের বাঁশি এই দুটি ভাস্কর্যের মাধুর্যময় ছন্দ দৃঢ় গঠন স্বাস্থ্যময়তা ও কর্মচঞ্চলতায় ভরা আদিবাসী গোষ্ঠীর নমুনাগত নিখুঁত আদল। আকৃতির শক্তিশালী গঠনের জন্য শিল্পরীতির দিক দিয়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কেন্দ্রের অক্ষরেখার নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক ভারসাম্যতায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে স্থাপত্যগত শক্তিকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং চলমানতা ও গতিময়তাকেও এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে তোলে। শিল্পী জনকঝংকার

নার্জারী এই মূল্যবান বিশ্লেষণে আরো বলেছেন মূর্তিগুলির অবয়ব রদাঁর মতো না হয়ে হয়েছে গাঠনিক এবং এইজন্য মূর্ত-বিমূর্তের সমঝোতার মধ্য দিয়ে এদের প্রকাশ ঘটেছে। আলম্বিত গঠন অক্ষরেখার উপর ভারসাম্য রেখে মূর্ততার মধ্যে এটি নির্মাণের বিমূর্ত নীতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। এখানে যে গতির দ্যোতনা তা ব্যক্ত হয়েছে দেহবিন্যাসের সমান্তরালের সঙ্গে কৌণিক অবস্থানের রেখায়। এই কর্ম রেখার বিন্যাস পেয়েছেন রামকিঙ্কর ধ্রুপদী উত্তর ভারতীয় শিল্প থেকে। 'কলের বাঁশির' এই গতিময়তার বিশ্লেষণ ও কর্মরেখার বিন্যাস বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের খোঁজ জানিয়েছেন প্রণবরঞ্জন রায় মহাশয়। শিল্প সমালোচক মৃণাল ঘোষ লিখেছেন– 'এই মূর্তি দুটির অবয়ব বিন্যাসে আয়তনিক পূর্ণতার মধ্যেও এক ধরনের ঋজু তীক্ষ্ণতার ভাব আছে। শরীরের নিটোল বর্তুলতাকে ভেঙে কতকগুলি তলে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেই তলগুলি পরস্পরের সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরলরেখায় মিলেছে। এই দৃঢ় তল ও রেখা বিন্যাসই এই কাজটিতে পাশ্চাত্য প্রভাবিত খানিকটা ঘনকবাদী রীতির অনুরণন আনে। রামকিঙ্কর এই দুটি ভাস্কর্যের গুরুগম্ভীর আলোচনার সূত্রে আপাত লঘু অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক।

যেমন 'কলের বাঁশি' কাজটিতে রামকিঙ্কর যেভাবে বাতাসকে ধরেছেন কংক্রিটে যেখানে মেয়েদের শাড়ির আঁচল উড়তে দেখা যায়। দর্শক হতবাক হয়ে দেখতে থাকেন কিভাবে কংক্রিটে শাড়ির আঁচলও ওড়ে এবং পায়ের নিচে ধুলো। রামকিঙ্কর কংক্রিটে পতপত করে আঁচল উড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু ওড়াতে বেশ বেকায়দায় পড়েছিলেন তিনি। বলেছেন ওই মেয়েদের পিছনে উড়ন্ত শাড়ির কোণগুলো, ওগুলোর ভার জানো? ওর মধ্যে লোহা আছে, আর কংক্রিট আছে কতখানি ভাবো দেখি। ওকে উড়িয়ে রাখা মুস্কিল হে। তুমি তো দেখছো পতপত করে উড়ছে শাড়ির আঁচল। বেশ হাল্কা মেজাজেই দেখছো। আর আমি ঐ ক মনি ওজনের আঁচলের ভাঁজে চাপা পড়ে গেছি। ওকে উড়িয়ে রাখি কী করে? মেয়েদের আঁচল নিয়ে আমি একবারে নাস্তানুবাদ। হাঃ হাঃ শেষ দিলাম ওই ছেলেটাকে এড করে। ওটা সাপোর্ট। আমার বাঁশিটাও দিয়ে দিলাম ছেলের হাতে। থাক আঁচলটা ছুঁয়ে।'

রামকিঙ্করের এই কাজটিতে মেয়েদের ফিগারের উচ্ছলতা ও প্রাণের বেগ কখনো ভোলবার নয় আর তার সাথে ঐ ফুলের মতো হাসিটি। কঠিন কাঁকরেও যে ঐরকম হাসানো সম্ভব– তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই মূর্তিদুটির স্কেচ দেখা যায় দু'জনেরই মাথা সামনের দিকে ঘোরানো। আচার্য নন্দলালের উপদেশে একটির মাথা ঘুরিয়ে দিলেন পিছনে। দেখলেন অনেকখানি জোর এসে গেছে কাজটিতে। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন– 'মাস্টারমশাই যে কত বড় আর্টিস্ট সেদিন বুঝেছিলাম। আমার মূর্তিটা বদলে দিলেন একটি মাত্র সাজেশনে।

মুখ ঘুরিয়ে দিতেই অনেকখানি জোর এসে গেল কাজটিতে। দুটো মুখের ডিরেকসনের কনট্রাস্ট কী রকম হেল্প করলো। আমি তো অবাক।'

আধা-বিমূর্ত অথবা বিমূর্ত মূর্তি নির্মাণ করেছেন রামকিঙ্কর। কিন্তু সে সব প্রচেষ্টা নিছক আকারের নক্সা মাত্র নয়। গতি বা শক্তি সমন্বিত বিমূর্তি আকারগুলি নিতান্তই ভঙ্গিমা মাত্র না হয়ে দৃশ্য জগতে যে গতির চাঞ্চল্য তারই দ্যোতনায় এসব বিমূর্ত সৃষ্টিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থবহ। শিল্পী অরুণ পালের এই বক্তব্য থেকেই আধুনিক ভারতবর্ষের ভাস্কর্য জগতে প্রথম বিমূর্ত মূর্তির নিদর্শন 'দীপস্তম্ভের' আলোচনায় আসা যাক।

১৯৩৮ সালে সাঁওতাল পরিবারের পরেই ১৯৪০ সালে করা এই বিমূর্ত মূর্তিটির ভাবনা রামকিঙ্করের মনে হঠাৎ জন্ম নিয়েছিল রূপ ও ভাবের পূর্ণতা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম উপাসনা গৃহের চৌহিদ্দে অবস্থিত এই ভাস্কর্যটিতে পরমব্রহ্মের নিরাকার রূপের সুর ধ্বনিত হওয়া দেখতে পাই। প্রকৃতির সৃষ্টিজনিত পরমশক্তি ও তার বিকাশ বা বৃদ্ধির ছন্দ রূপায়িত হয়েছে এই ভাস্কর্যটিতে। দর্শক এর চারপাশে কেবলই ঘুরতে থাকবেন। কেউ দেখেন চুম্বনরত নরনারী কেউ বা যুগলপাখী আবার কেউ দেখেন স্বপ্নের দেবীকে। রামকিঙ্কর বলেছেন ওটার মধ্যেকার কাজগুলো ভাগ করা যায়। একটা দেখবেন নারীমূর্তি চুম্বনরতা। তারপর দেখবেন পাখি আছে কোর্টিং বাউস। নারী মূর্তি একপাশে দেখা যাবে এবং সেই নারী মূর্তির সবটা নেই। কিন্তু সবটা না থাকলেও বোঝা যায়। এই রকম ভাবে এ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কতকগুলো ফ্রিডম আসছে, ঠিকঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে একটা অন্য ফর্ম আসছে। যেন চেনা যাচ্ছে না, অথচ চেনা চেনা লাগছে, নতুন ডাইমেনশান এসে যায়। মিস্টিক ভাব আসে, অহেতুক ভাবটা বাড়ছে। আরও বলেছেন– 'ওটার মধ্যে তিনটে সাবজেক্ট মিলেমিশে রয়েছে নয় কি? সেজন্য দু-তিনটে প্রসেস এসে গিয়েছে। তার থেকে কিছু কিছু এলিমিনেট হয়েছে। কিছু কিছু এড হয়েছে। যে দু-তিনটে অবজেক্ট সেগুলো রিয়ালিস্টিক করতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যেতো। কিন্তু যে ভাবে রয়েছে সে ভাবে কম্বিনেশন করতে সংহত একটা ভাব বেশ নতুন জিনিস আসছে।'

শিল্পী জনকঝংকার নার্জারী-এর কনস্ট্রাকশনাল দিকটির বিষয়ে বলেছেন ভাস্কর্যের মাঝখানে আলম্বিত অক্ষরেখাটি স্থির ও জমিতে স্থাপন করা এবং যাকে কেন্দ্র করে নিরেট আকারের তল, অবতল সোজা ও বাঁকাল রেখা আরোহন অবরোহন করেছে। আবার কোনোটা আলোয় প্রকাশিত স্ফীত নিরেট আয়তন, কোনোটা বা ছায়ায় ঢাকা গভীর শূন্যতা। একটি বিভাজিত আকারের তল ক্রমশ ঘুরে গিয়ে আর একটি বিভাজিত আকারে তলের সাথে মিশে গিয়েছে অথবা

অবতলে পরিণত হয়েছে। আবার আর একটি বিভাজিত আকারের তলের গতি হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে বাঁক নিয়ে কোণের সৃষ্টি করেছে যা কখনো বহির্মুখী কখনো বা অন্তর্মুখী। ঠিক তেমনি ভাবেই ভাস্কর্যটির উপরিতলের রেখাগুলিও কখনো সোজা কখনো বাঁকা কখনো বাইরে থেকে বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে, আবার কখনো ঘুরে ঘুরে ভেতরে ঢুকেছে। অথচ আকারের এতসব বিভাজন তল-অবতল, আলোছায়া ও রেখার বিভিন্ন বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও ভাস্কর্যটি বেশ আঁটো সাঁটো কমপেক্ট বলে মনে হয় এবং যেখানে ঐক্যতার ছন্দপতন হয়নি এতটুকু। এই 'বাতিদান' ভাস্কর্যটি রামকিঙ্করের বিমূর্ততা চর্চার প্রথম প্রচেষ্টা। এটিকে কারো কাছে বৃক্ষের বেড়ে ওঠার ছন্দ অথবা একটি ফুলের ফুটে ওঠা কিংবা কেউ আবার একটি প্রদীপের মৃদু বাতাসে আন্দোলিত শিখার মতো দেখেন। আনন্দের ছন্দ প্রাণের ছন্দ কিংবা পরম ব্রহ্মের সুরের একটি মূর্তিমান রূপকে ধরতে চাওয়া বলেও অনেকে মনে করেন। সুর্যারিয়ালিস্টিক এই কাজটির মধ্য দিয়ে রামকিঙ্কর ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যে এক নতুন ভাবনার দিক যোগ করলেন যদিও তিনি নিজেকে কখনই মডার্ন বলতে চাননি। এ ব্যাপারে শিবলিঙ্গ, রাবণের দশ মাথা বা গণেশের মুখের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। বলেছেন রাবণের দশটা মাথা? পিকাসো মুখের উপর মুখ চাপান। রাবণ মডার্ন? জানি না। ফর্ম ভেঙেছি ভাঙার দরকার হয়। কি দেখছি কি দেখতে চাই তারই ওপরে ফর্ম ভাঙা না ভাঙা নির্ভর করে। ধান ঝাড়াই করবার সময় শরীরের যে গঠন আসে সেটুকু ধরতে অ্যাবস্ট্রাক্ট করেছি। আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব করতে চোখের বদলে বলের ব্যবহার করেছি। সবই গড়া আবার ভাঙাও।

এই প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর এই গঠন ব্যাপারে ক্লাসিক্যাল গানের সঙ্গে এ্যাটস্ট্রাক্ট আর্টের সামঞ্জস্যটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন– 'বসন্ত রাগিণী গাইতে তবে তো গাইয়ে কোকিলের মতো কু কু করতেন। সুরটাকে নিয়ে একটা টাইপ ধরে দেওয়া তার কাজ। কোকিলের ডাক, পাপিয়ার ডাক, আলাদা করে কিছু নেই। সব মিলেমিশে বসন্তের পরিবেশ রচনা। অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা। রাগিণীর এভাবেই সৃষ্টি। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টও সেই রেখা ও ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত। নানা ভাবে এই ডিজাইন সঙ্গীত রচনা করতে করতে দেখতে হয় সুরটা ঠিক হল কি না রচনা সুন্দর হল কি না। আমাদের ক্লাসিক্যাল গান একভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে শুধু সুর দিয়ে অনুভব দিয়ে কথা দিয়ে নয়।... সাধারণ মানুষও হঠাৎ কথা ছাড়া সুর [redacted] ভেজে চলে– তা করতে ভালোবাসে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিও তাই।'

প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের এই সহজ অথচ প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা শিল্পের জগতে স্বর্ণাক্ষরের তুল্য বলা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের ভাষা।

আধ্যাত্মজগতের দুরূহ জটিল কুটিল প্রশ্নের অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে, গল্প কাহিনীর উদাহরণ জুড়ে কি সুন্দর সাবলীল ছন্দে বুঝিয়েছেন তিনি, তাঁর ভক্ত শিষ্যদের।

আচার্য নন্দলাল এভাবেই ছোট ছোট দৃষ্টান্ত উপমা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতেন। দেখা যায় তাঁর অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মত রামকিঙ্করও সেই কথাকেই অনুসরণ করেছেন। যাই হোক এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বোধের কথা তুলে ধরে আপাতত এই আলোচনায় ইতি টানতে পারি।

তিনি বলেছেন– 'বিষয় বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধরূপ আমার ভালোই লাগে। যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সঙ্গীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক ঐদিকে।'

রামকিঙ্করের 'ধানঝাড়াই' মূর্তিটির আলোচনার শুরুতেই আমরা এটিকে একটি প্রতিবাদী সমাজবাস্তবতার রূপ হিসেবে দেখতে পাই। একটি নগ্নিকা নারীর সুদৃঢ় দুটি পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ধান ঝাড়াই কর্মরত অবস্থায় দু'হাতের মুঠিতে ধরা ধানেরগুচ্ছ মাটি স্পর্শ করেছে দেখা যায়। তার মাথা বা মুখমণ্ডল অনুপস্থিত। এবং এখনি যেন দু'হাতের সঞ্চালনে ধানের গুচ্ছ উড়ে এসে আছড়ে পড়বে মনে হয়। গতির প্রাবল্যেই খুব বেশি নেমে যাওয়া মাথা এখানে আড়ালে অদৃশ্য। বস্তুতঃ এই ভাস্কর্যটি গঠন কাঠামোর দিক দিয়ে আধা বিমূর্ততা থেকে ভাস্কর্যের বিমূর্ততার দিকে ও ছন্দের গাঠনিক চরম উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে গেছে।

নানান বাধা ও অসহযোগিতার কারণে রামকিঙ্করের ভাস্কর্য সংখ্যায় কম হলেও সেগুলির প্রত্যেকটি ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যের জগতে এক একটি জগতের উন্মোচন করেছে যা আমাদের বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে সম্মানিত করেছে বিশ্বের দরবারে। অথচ কী মর্মান্তিক সেই ঘটনা! ভাস্কর্য জগতে রামকিঙ্করের অন্যতম নতুন পথের দিশারী এই মূর্তিটিকে ভাঙা হলো। পুত্রশোকের সমান ব্যথায় ব্যথিত রামকিঙ্কর বলেছেন– 'ভাঙলো ওটাকে। বিড়লার বাড়ি হবার সময়। ঠিকাদারের লোক হাড়গোড় ভাঙা মূর্তিটা গোরুরগাড়ি নিয়ে সরিয়েছে। আমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করল না। কেউ না। আমি আর যাইনি ওদিকে। আমার ছাত্র (সুখেন ঘোষ) ওটা সারিয়ে সুরিয়ে বসিয়েছে পরে।' রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা প্রসঙ্গে এসব ঘটনার কথা এসেই যায়। মোটেই অবান্তর নয়, সরিয়ে রাখা যায় না। যখন সোমেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ করা তাঁর কাজের দৃশ্যের বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি বলেছেন– 'খরার তাপমান যন্ত্রের পারদ একশ যোলোর ঘর ছাড়িয়ে [illegible] দমকে উর্দ্ধগামী। আকাশে ঘূর্ণমান জ্বলন্ত গোলা থেকে আগুন ঝরছে মাথার উপর। রক্তাভ খোয়াই থেকে হু হু করে ছুটে আসছে আগুনের হলকা। আর সেই দ্বিপ্রহরের

নির্জনতায় এক শিল্পী আপন মনে সৃষ্টির আগুন নিয়ে খেলছেন।' রামকিঙ্কর দুঃসহ কষ্ট বুকে চেপে জানাচ্ছেন– 'ও কাজটা জানো এক নাগাড়ে বহুদিন ধরে করেছিলাম। সারাদিন কাজ করতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে। ভালো লাগতো খুব। আলোটা ঘুরে যেতো। এতে দেখার সুবিধে হয় নানা সময়।' বস্তুত এই ঘটনায় রামকিঙ্কর সন্তানকে পিটিয়ে মারার যন্ত্রণার ভিতরে ভিতরে গুমরে কেঁদেছেন। তাঁর নির্মাণকালীন কঠিন কথা দূরে থাক এমন কী তাঁর প্রতিভার কোনো মূল্যই দেওয়া হয় নাই। মনে জাগে রামকিঙ্কর যদি অভিজাত সমাজ থেকে আসতেন তাহলে কি এমনটা হত? তো দুর্ভাগ্য রামকিঙ্করের আমাদের যে কর্তাব্যক্তিরা ভাঙলেন। তাঁকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। যখন মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করার কথা তাঁর কানে এসেছে তিনি অসহায় পিতার মতো যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন সেদিন ঘরের কোণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর প্রথম কাজ সুজাতা মূর্তি দেখে– সমস্ত আশ্রম এর চেয়েও বড় মূর্তি গড়ে ভরে দিতে পারবি? সব আশ্রম ভরে দে। রামকিঙ্কর তাঁরই প্রেরণায় তাঁরই আদেশ পালন করে গেছেন। সুজাতার পর সাঁওতাল দম্পতি, মৎস্য মহিষ, কলের বাঁশি, ভিস্তিওলা, গান্ধী, মাৎস্যনায় প্রভৃতি ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে এক একটা দিগদর্শনের কথা বলে গেছেন।

১৯৩৫ সালে 'সুজাতা' করেছিলেন রামকিঙ্কর। এ মূর্তিটি অবশ্য সুজাতা নয়। কলাভবনের এক ছাত্রী জয়া আপ্পাস্বামীর সুন্দর চলাটিকে ধরতে ও মূর্তি তিনি গড়েছিলেন। বলেছেন– 'সুজাতা নয় গো জয়া-জয়া আপ্পাস্বামী। ছাত্রী ছিলো কলাভবনের। লিকলিকে লম্বা। পরে সে মোটা হয়ে গেছে। ছাত্রীর চেহারাটাই করে দিলাম। হাতে আসন আছে দেখছো নিশ্চয়। মাথার ভাঁড়টা জুড়েছি মাস্টারমশাইয়ের সাজেশনে, পরে। এই মূর্তিটি মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মোজেস-এর মতো পাক খাওয়া।' এই পাক খাওয়ার মধ্য দিয়ে মুভমেন্টকে ধরতে পেরেছেন রামকিঙ্কর। তিনি বলেছেন– 'একমনা হয়ে চলেছে একটি মেয়ে। তার মনের সামনে কে আছে কে জানে। এই চলাটি ভারি সুন্দর। এই চলাটিকে ধরতে চেয়েছি।'

শিল্প গবেষকদের মতে রামকিঙ্কর এই মূর্তিতে জটিল আলম্বিত গঠনকে এড়িয়ে গেছেন। কংক্রিটে করা প্রথম পরীক্ষা হিসেবে তিনি একটি সাধারণ চোঙের মতোন মূর্তিটিকে অক্ষরেখার উপর লম্বভাবে দাঁড় করিয়ে মূর্ত ভাবে রচনা করেছেন এটি। মূলদেশ মাটির উপর থাকায় শিকড় ছড়িয়ে বেড়ে ওঠা বৃক্ষের মতো মনে হয়। এই মূর্তিতে চলাও আছে আবার সুস্থির দাঁড়িয়ে থাকাও আছে। স্থবিরতা ও জঙ্গমের মেলবন্ধন তৈরি এই শীর্ণা নারীপ্রতিমা একযোগে আধুনিকতা ও চিরায়তের মূল্যমানে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

রামকিঙ্করের নতুন দিগদর্শনের উপরে আরো কয়েকটি কাজ আমরা পেয়ে

সেখানে তাঁর পরিণত বয়সের মেধা ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ মস্তিষ্কের। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের অসহযোগিতার বাতাবরণে রামকিঙ্কর এই পরিকল্পনাগুলি ম্যাকেট অবস্থাতেই কলাভবনের ধুলো মেখে মিউজিয়ামে গ্যালারিতে বন্দী হয়ে গেছে। খোলা আকাশে মুক্তির আনন্দে নানান ঐতিহ্যের গাঁইতি ও ট্রিলসের্টের গান গাইতে গাইতে ডাল-পালা মেলতে পারেনি তারা। পরিণত ও অভিজ্ঞ মস্তিষ্কের একমাত্র কাজ শিল্পীর 'যক্ষযক্ষী' ছাড়াও 'আকাশীতলার পথে'। বাপ বেটা চলেছে মাঠে। সেখানেও এক সুস্থ তেজস্বী রূপ এবং বিশাল আকারের গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আমরা পেতে পারতাম। তাঁর চারপাশে যদি মন মাৎসর্যের হাওয়ার বদলে একটু সহযোগিতার হাওয়া বইতো। কিন্তু না এ ব্যাপারে তাঁর কপাল পুড়েছে। বস্তুত এ দুটি অভিন্ন কথা যেহেতু কলাশিল্পের প্রতিভার হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণ ঘটে না। দীর্ঘ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসদ সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই পূর্ণতার আমরা পেয়েছি একমাত্র কাজ শিল্পীর 'যক্ষযক্ষী' – ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছায় ও চেষ্টায়। দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল প্রবেশ দ্বারের দু-পাশে স্থাপিত হওয়া ১২ ফুট বেদির উপর ২২ ফুট উচ্চতার সম্পূর্ণ এই 'যক্ষযক্ষী' শিলাভাস্কর্য মূর্তি রামকিঙ্কর জীবনে শেষ বিশাল মাপের কাজ। গবেষকদের মতে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রেরণায় লোকায়তিক অনুভবের রসেতে জড়িয়ে গড়া এই মূর্তি দুটির জন্য পাটনা ও মথুরার সংগ্রহশালার যক্ষযক্ষী মূর্তি অধ্যয়ন করেছেন তিনি বহুবার। রামকিঙ্কর কাজের ক্ষেত্রে এই এই কাজটিতে গাম্ভীর্য ও ব্যাপ্তি বাঁকির সেপারেশন গড়া ও ত্রিভঙ্গের স্পষ্ট তাল বিন্যাস দেখা যায়। আসল সমন্বয়ের এক একটি সমতল পরস্পর যৌগিক সমতলরেখায় মিলিত হয়েছে— যা লোকেদের যক্ষযক্ষের পূর্ণতায় বিচ্ছুরিত হয়। এই তাল বিন্যাসের আধুনিকতার পাশ্চাত্য প্রভাবিত কুবিজম অনুপ্রাণিত বলে মনে হয়। এখানে ভারতীয় পূর্ণেন্দু অভিমতের অনুরূপ থাকা মূর্তিগুলি শিল্পী নিজের ও সঙ্গিনী রাধারাণীর চেহারার আদলে গড়েছেন যেখানে তাঁর নিজের উপলব্ধিজাত দর্শনও রয়েছে। রামকিঙ্কর তাঁর মডেল তথা সঙ্গিনী রাধারাণীর স্থূলদেহটা গাঁথি করে যক্ষী বা যক্ষীর প্রতীক রমণী জাতির সূক্ষ্ম ঈশ্বর স্পিরিটকে ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যথা সময়ে রাধারাণীর সাথে যোগাযোগ ঘটায়। ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাধারাণীর দেহসৌষ্ঠবের সাথে প্রাচীন যক্ষীমূর্তির দেহ গঠনের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করে। এক স্মৃতিচারণায় তিনি জানিয়েছেন ছোটোবেলায় দেখেছি আমাদের পাড়ার অনন্ত জ্যাঠা যোগী মেলার দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় কী শ্রদ্ধাভরে, কী ভক্তি তন্ময়তায় প্রতিমা গড়তেন। মা মা বলে ডাকতেন। আমি চুপ করে বসে থাকতাম। সেই ডাক শুনে গায়ে কাঁটা দিত। আমার জন্য দুর্গার চক্ষুদান বাকি

রাখতেন। পরে আমি শান্তিনিকেতন থেকে গিয়ে চক্ষুদান করতে গেলে অনন্ত জ্যাঠা বলতেন মায়ের এমন ধ্যান করবি যাতে নিজের মায়ের চোখের মণি যেন তোর ধ্যানে ভাসে। ব্যস আমি তখন থেকে ধ্যান করি, ধ্যান বুঝি। মূলকথা এই যে রামকিঙ্কর এই ধ্যানের মধ্য দিয়েই শিল্প আত্মনকে ধরতে পেরেছিলেন বা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই কিশোর বয়সেই গুরু অনন্তলালের কাছে প্রতিমার কাঠামো মোড় তৈরির পদ্ধতি ও অন্যান্য করণকৌশল শেখার পাশাপাশি নির্মীয়মান মূর্তিটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝেছিলেন রামকিঙ্কর। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনেও একজন জাপানী শিল্পীকে ধ্যানে বসে গিয়ে মূর্তির রূপকল্পনার করার গুরুত্বটি প্রত্যক্ষ করেছেন। ধ্যানের মধ্য দিয়ে প্রতিমার অলৌকিকত্বের সাথে নিজেকে যুক্ত করে রামকিঙ্কর প্রতিমার চক্ষুদান করতেন আর তখন থেকেই বুঝেছিলেন যার ছবি আঁকা হবে তার ভিতরের মানুষটিকে আঁকা করতে হবে।... গাছপালা, নদী, আকাশ, মানুষ অবিকল আঁকা করলে ছবি আঁকা হবে না। মন আঁকে। শুধু চোখ আঁকা করে না।... বাইরের দেখাটাকে নিজের মতো করে একবার মনে মনে দেখলে সেটাই হবে শিল্প।'

শান্তিনিকেতনে এসে রামকিঙ্কর আচার্য নন্দলালের কাছে জীবন ও প্রকৃতিকে দেখতে শিখেছিলেন। অস্ট্রিয়ার লিজা কনপট ও বুর্দেল শিষ্যা মার্গারেট মিলওয়ার্ডের কাছে কিছু প্রকরণ কৌশল শিখে তিনি শিল্পরীতির বিষয়ে সচেতন হন। রবীন্দ্রনাথের এক্সপ্রেশনিস্টিক ও গগনেন্দ্রনাথের কিউবিক ভাবধারায় তিনি বিশেষ আলোড়িত হয়েছিলেন। তার সাথে বিভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য চাক্ষুষ দেখা ও বিদেশী বইপত্র পড়া ও আধুনিক চিত্র ভাস্কর্যে ছবি অবলোকনের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনার জগৎ বেড়ে উঠেছিল। অবশ্য এর সাথে বাঙলার মন্দিরগুলোও ছিল আর ছিল সতীর্থ বিনোদবিহারী ও মাস্টারমশাই নন্দলালের সাথে শিল্প বিষয়ক সামগ্রিক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের অবকাশ। বস্তুত রামকিঙ্কর যেখান থেকেই বিষয়ের মূল ভাবটিকে ধরে নিজের ধ্যানের মধ্যে ফেলে যে সার সত্যটিকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাকেই তিনি দেশি বিদেশী পরম্পরাকে পাশ কাটিয়ে নিজস্বতার চিহ্ন মাখিয়ে ভাস্কর্যে রূপ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাইনি। সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিস্টের কাজ। সেইজন্যেই যে বড়ো বড়ো আর্টিস্টের রচনার বিষয় চিরকালের জিনিস। আর্ট পুরাতনকে বারেবারে নতুন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে যে ঝর্না। তার প্রাচীন ধারা যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে। এইটে প্রমাণ করবার জন্য তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গি করতে হয় না।'

ইউরোপে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর পর তিনশো বছর পেরিয়ে রদাঁর হাত ধরে যেমন, তেমনি রামকিঙ্করের হাত ধরে প্রায় ন'শো বছর পেরিয়ে পুরাতন নতুনতর ভাবে ও ভাষায় পুনরুজ্জীবন লাভ করলো।

ভাস্কর্য সমালোচক মৃণাল ঘোষ বলেছেন– 'লোকশিল্পের সরলতার মধ্যে নিজেকে আটকে না রেখে লোকায়তিক জীবন প্রবাহকেই তিনি ভাস্কর্যরূপ দিলেন একযোগে অধুনিকতা ও চিরায়তের মূল্যমানে।' একটি ঘাসের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দুর মত বিরাট ঐশ্বর্য ঘরের কাছেই রামকিঙ্কর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর বিশেষ শিল্প প্রতিভা ও একনিষ্ঠ ধ্যানের ভিতর দিয়ে।

এই বিষয়ে ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরী একটি সরল স্বীকারোক্তি তাঁর না পারার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। বলেছেন– 'কিঙ্করদা কিন্তু লোকাল, যেটা কিন্তু আমাদের কোনোদিন হল না।' কিঙ্করদার কাজে লোকাল সাবজেক্ট নিয়ে এমন একটা আর্ট কোয়ালিটি প্লাস আমাদের ইণ্ডিয়ান গন্ধ আছে যেটা কিন্তু খুব রেয়ার। লোকাল সাবজেক্ট নিয়ে মানবতাবাদের উপর দাঁড়িয়ে কংকালীতলার পথে মূর্তির খসড়া রচনা করেছিলেন বিদ্যাভবনের বাড়ির সামনের জায়গায় বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায়। কিন্তু পরে তা আবারও বাতিলও হয়ে যায়। এই রূপকল্পনাটি রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করেছিলেন। যেখানে রাজ মন্দিরে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য বলিদান বন্ধের আদেশ দেন অপর্ণা নামে একজন গরীব মেয়ের মাতৃরূপ ও বাৎসল্যরূপের কাছে হেরে গিয়ে। এই মূর্তির খসড়াতে দেখা যায় তিনজন পুরুষের একটি টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাগলের আকৃতিকে একটি ত্রিভুজাকৃতি রেখার ঘেরে আবদ্ধ স্ট্রাকচারের মধ্যে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সাজিয়েছেন। বিশাল ভাস্কর্যের গঠনগত গুণ বজায় থাকা এই ম্যাকেটটিতে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাগলের মুখের বদলে যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছাগদেহের সাথে সঙ্গতি রেখেই বসিয়ে তিনি টোটাল কাজটির মধ্যে ইনার ট্রুথকে প্রকাশ করেছেন — 'যেখানে অসহায় উৎপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর মানবতাবাদের চিৎকার দর্শককে তুমুল আলোড়িত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কর্তৃপক্ষের অপছন্দের কারণে কাজটি বনসাই আকারের দুঃখ নিয়ে কোথাও চারদিকে দেওয়ালের মাঝখানে ধুঁকছে। এখানে আবারও স্মরণে এসে যায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা 'সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে যে ঝর্না।' আর তাই তিনি কারো শিল্প প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াটা অন্যায় মনে করতেন। তিনি কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন– এরা ছাত্র হলেও শিল্পী, তাদের শিল্পকর্মে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। তিনি দপ্তরের প্রভাব শিক্ষার প্রতিকূল ভেবে অধ্যাপক দিয়ে বিশ্বভারতী পরিচালনার কথা ভেবেছেন। তাঁর এই ভাবনার সুষ্টু প্রয়োগ

হয়তো সম্ভব হয়েছে তথাপি তাঁর মনোভাবনায় যে বিশ্বভারতী, সেই অনির্বচনীয় সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপটি তিনি করে উঠতে পারেননি নানান কারণে। শিল্পী বিনোদবিহারী লিখেছেন– 'নানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে অনেক জিনিস সহ্য করতে হয়েছে। যা তিনি চাননি সে জিনিস সবলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেন নি বা করতে পারেননি।' এজন্যই দেখা যায় যে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। তাঁর এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে যে সব আগাছা গজিয়েছিল সেইগুলি মহীরূহ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।

যাই হোক এবার পুনরায় তাঁর বড় আকারে দেখতে না পাওয়া আরো কিছু কাজের আলোচনায় আসি। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যাবার পথে বিনয় ভবনের মাঠে বিশাল আকারে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী মূর্তি করার কথা ভেবেছিলেন রামকিঙ্কর। কিন্তু না, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অন্তর্নিহিত সত্য-স্বরূপকে প্রকাশ করতে আর পারলেন না ঐ সহযোগিতার অভাবেই। এছাড়া পিয়ার্সন পল্লীতে শ্রবণবেলগোলার মহাবীরের মতো একটি গান্ধী মূর্তির রূপকল্পনাও তাঁর ছিল। যার উচ্চতা তিনি ভেবেছিলেন পঁচাত্তর ফুট। তাঁর ছাত্র কে .জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'এই রকম আরো কিছু কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি যেমন পিয়ার্সন পল্লীর পটভূমিকায় 'ঠাকুর গান্ধীর' বিশাল মূর্তি। একেবারে নতুন ভাবে গান্ধী মূর্তি, যেখানে ভেঙে পড়া টুকরো পৃথিবীর উপর দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বিজয়ীর উন্মত্ততায় হেঁটে যাবেন তিনি। পরিকল্পিত এই কাজের খসড়া স্কেচটিও ছিল তাঁর করা একটি শক্তিশালী কাজ। কিন্তু এর কোনটিও আর করা হয়নি।'

রামকিঙ্করের আরেক ছাত্র শ্রীকুণালকান্তি সাহার একটি সখেদ মন্তব্য এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। যে মন্তব্যটি যে কোনো প্রান্তের শিল্প রসিকেরও অন্তরমথিত যন্ত্রণার প্রকাশ বলা যায়। তিনি বলেছেন– 'একথা জোর দিয়েই বলতে পারি কিঙ্করদার বিরাট প্রতিভা যথাযথ ভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি শান্তিনিকেতন। তিনি যদি বিদেশে জন্মাতেন তবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বা শিল্পী হিসেবে জানতে পারত বিশ্বের মানুষ।'

এখানে একটা কথাই তো মনের মধ্যে ধ্বনিত হয় যে রামকিঙ্কর অভিজাত সমাজের মানুষ ছিলেন না আর এটাই ছিল তাঁর সর্বোত্তম দোষ। আসলে সবাই তো আর রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বা বিনোদবিহারী নন। এঁরা হলেন দেশ বা জাতিগত সীমারেখার উর্দ্ধে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা তুলনায় রামকিঙ্করের ক্ষুদ্র প্রতিভাকে চিনেছিল। যেমন চিনেছিলেন বার্ণাড শ– শিল্পী এপস্টাইনকে। যখন তাঁর কাজ নিয়ে ইংলন্ডের সমালোচকেরা নিন্দাবাদে মুখর ছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডানা দিয়ে রামকিঙ্করকে আগলে রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর অবর্তমানে

রামকিঙ্করের জীবন এসেছে অসহযোগিতার ঝড়। তবু যে ক'টি কাজ তিনি করতে পেরেছেন সে সবই শিল্পকলার নতুন নতুন জগতের খোঁজ দেখিয়েছেন তিনি। তেমনই একটি কাজ তাঁর 'মৎস্য মহিষ'। এর দেহের অর্ধাংশ মহিষ বাকি অংশ মৎস্যপুচ্ছ। রামকিঙ্করের দেখা ভুবনডাঙ্গার কাদাজলে গা ডুবিয়ে শুয়ে পড়া অবিচল অবাধ্য মোষ, ল্যাজ দিয়ে অবিরল জল ছিটিয়ে যাওয়ায় ঠিক মাছের ল্যাজের আকৃতি পেয়েছে সে মোষের পিছনের অর্ধাংশ। 'শিল্পী রামকিঙ্করের আলাপচারিতা' গ্রন্থের লেখক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'দর্শক চারদিকে ঘুরে মূর্তিটি পরিক্রমা করতে থাকলে মনে হবে চলমান মূর্তিদুটি স্তম্ভটিকে বেষ্টন করছে ক্রমাগত। আর তারই সঙ্গে ছন্দ রেখে ঘূর্ণমান স্তম্ভটি যেন উপরের দিকে আবর্তিত হয়ে উঠেছে। আর ফোয়ারার জলের ধারা পড়লে তাও যোগ দেবে এই ছন্দে।' নিশ্চল মূর্তির অঙ্গে অঙ্গে এই সচলতার বেগ সঞ্চারের কৌশল দর্শককে যুগপৎ আনন্দ ও এক নতুন দিশা দেখায়। এই মূর্তিতে কালো সিমেন্টের কাজের উপর সারাটা গায়ে ইঁটের আকারে চৌকো দাগ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন– 'তবলার চাটি গো তবলার চাটি।' সুরের সাথে তালের মিলিত ধ্বনির মতো এই চৌকো দাগ দর্শকের মনে ছন্দের এক পরিপূর্ণ রূপ বয়ে আনে। রামকিঙ্করের এই 'মৎস্য মহিষের' পরিকল্পনা মাথায় আসে ঘটনাক্রমেই।

তিনি শুরু করেছিলেন 'মৎস্য কন্যা' কিন্তু পরে তা রূপান্তরিত হয়ে 'মৎস্য মহিষে'। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন– 'ফোয়ারার তলায় দুটি মৎস্যকন্যা করি এই ছিল ইচ্ছা। কালো সিমেন্টে করলে বেশ কষ্টিপাথরের মতো মূর্তি হবে। কিন্তু কারো কারো আপত্তি কানে এলো। তারা সব কর্তাব্যক্তি, কত রকম মানুষ থাকে দেখো। শেষে রেগে মেগে বদলে ফেললাম সাবজেক্টটাই। মেয়েকে করে দিলাম মোষ। মৎস্যকন্যা বদলে গেলো মৎস্য মহিষে। একটানা সুরের ওপর তবলার চাটির মতোই মূর্তির দেহে চলমান রেখার আন্দোলনকে যেন তালবদ্ধ করেছে ঐ ইষ্টকাকৃতি সংহত রূপের কাঠিন্য। চতুষ্কগুলি আবর্তিত মূর্তিতে রেখার তরঙ্গকে শুধুই তরলিত থাকতে দিচ্ছে না। কঠিন বুনোটের বাঁধনে বেঁধে ফেলে ভাস্কর্যের দৃঢ়তায় সংঘবদ্ধ করেছে।

বহুদিন পরে কোন একদিন বেতার যন্ত্রে এস্রাজের আলাপ শেষে গৎ শুরু হতে তবলচির তবলায় হাত পড়ার সাথে সাথে সোমেন্দ্রনাথের ভাবনার জগতে এই অতর্কিত আলো নেমে এসেছিল, তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন রামকিঙ্করের বিমূর্ত ভাবনার মানে। সাথে সাথে আমরাও আরেকবার চমকিত হলাম তাঁর ছান্দিক ভাবনার অন্য ধরণ ও বিশিষ্টতায়। অজন্তায় মাছ-মানুষ, মাছ-গোরু, এছাড়া গণেশ-নরসিংহ এবং বিদেশের ইউনিকর্ন, স্ফীংকস্, ড্রাগন প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত

রামকিঙ্করের মনে এই মূর্তির রূপকল্পনা এসেছিল জানা যায়। জীবনানন্দের বনলতা সেনের চোখে পাখির নীড় দেখার মতো রামকিঙ্করও গ্রীষ্মের দুপুর জলের দিকে মোষের যে প্রাণের টান সেই জলের স্পর্শে উচ্ছাসিত মোষের শরীরে মাছেরও অস্তিত্ব দেখেছিলেন রামকিঙ্কর। তাই তিনি আধুনিক কবিতার প্রতীকি ভাবনার মতো নির্দ্বিধায় মোষের পিছন দিকের অর্ধাংশ মাছের আকৃতি দেখিয়েছেন।

রামকিঙ্করের অসমাপ্ত একটি কাজ 'গতি'। 'বাতিদান' ভাস্কর্যে পরমব্রহ্মের নিরাকার রূপের ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটানোর মতো গতিরও এক সাকার রূপকে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি এই ভাস্কর্যে। শরীর অসমর্থ বিধায় বড় আকারে কাজটি শেষ করতে পারেননি বার্ধক্যের কাছে হেরে যাওয়া এই শিল্পী। এই ক্ষুদ্রাকার নমুনা মূর্তিটি দেখলে, দেখতে পাওয়া যাবে নন্-ফিগারেটিভ এই মূর্তিটি সোজা সামনের দিকে এগোচ্ছে আবার পিছোতেও পারে একই ভঙ্গিতে এই রকম। এরই মধ্যে আবার আছে আবর্তন– গতির আরেক চেহারা, যা স্ক্রু-এর মতো ঘূর্ণনের আকারে রয়েছে। রামকিঙ্কর অনেক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বলেছেন– 'শঙ্খের বাড়িতে যদি শেষ করতে পারতাম ওটা। কিন্তু সে আর হলো কই? সব গোলমাল হয়ে গেলো হে। এই শরীরে বড় কাজ আর সম্ভব নয় এখন।'

মোটের উপর দেখা যায় যে তাঁর যাবতীয় পরিবেশীয় ভাস্কযের পরিক্রমায় নানান নতুনত্বের ভাবনার বিপুল সমারোহ যা তৎকালীন ভাবনার প্রেক্ষিতে এক অচিন্তনীয় বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ার মতো মনে হয়। ঠিক তেমনি তাঁর প্রতিকৃতি ভাস্কর্যের বেলাতেও বহু বিস্ময়কর সত্যকথার দেখা মেলে যেখানে তিনি রদাঁ, এপস্টাইনের থেকে রসদ সংগ্রহ করে আঙ্গিকজাত উদ্ভাবনীর দিক দিয়ে আরো বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিগুলিতে যেমন, তেমনি এক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি মডেলের মধ্যে আবেগের আলৌকিক আভা ছড়িয়ে দিয়ে এক বিশেষ দেবী মহিমায় রূপান্তরিত করেছিলেন তাঁদের।. . .' যেমন 'গাঙ্গুলীমশায়', 'প্রীতি পাণ্ডে', 'মীরা চ্যাটার্জ্জী', 'মধুরা সিং', 'ইরা ভাকিল' এবং 'রবীন্দ্রনাথ'– এঁদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন উপায়ে জীবন্ত ভাবে উপস্থিত করেছেন তিনি। মডেলের চরিত্র ও গঠন অবিকল রেখে এঁদের প্রত্যেকটিই দৃশ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে গেছে।'

রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন– 'তাঁর সমস্ত শক্তি ও অনুভূতিকে এক সঙ্গে নিয়ে এসে কবিকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তিনি।. . . সমস্ত সাধ ইচ্ছার মোহভঙ্গ আর যন্ত্রণাকাতর কবির মুখই দেখা যায় সেখানে। ১৯৫৫ সালে এই প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটির ব্রোঞ্জের প্রতিলিপি ভারত সরকার কতৃক হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এর কাছে বালাতন হ্রদের তীরে স্থাপন করা

হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয় এই আবক্ষ প্রতিকৃতি দেখে ক্ষুব্ধ হন কারণ তাঁর মতে ঐ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। তিনি কলকাতায় ফিরে রবীন্দ্রনাথের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হয়ে যান। কিন্তু রামকিঙ্করের করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটির অপসারণ রোধে অহিভূষণ মালিক, সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন রায়, সুরেন দে প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানালে সেই প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে অপসারণে ক্ষান্ত দেন মন্ত্রী মহোদয়।

অন্য পক্ষে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী, নবনীতা দেব সেন প্রমুখেরা মন্ত্রীর অভিমতের সমর্থনে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁদের লিখিত মতামত জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের কাজের এই সমালোচনা ও বিতর্ক তাঁর প্রথম করা 'সুজাতা' থেকেই সারাজীবন চলেছিল দেখা যায়। সে সময় বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়েও বহু নিন্দাবান্দার কথা শোনা গিয়েছিল। যেমন একটি তাচ্ছিল্যকর মন্তব্য– 'ওটা যে কি করেছে চোখে বল দেওয়া চেনা যায় না।' যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জবাব ছিলো– 'ঐটেই ঠিক করেছে।'

আসলে লেখক গায়ক আর্টিস্টের কপালে শুধু বেদনটাই জোটে। মনের খোরাক জোগাচ্ছে যাঁরা তাঁদের কদর নেই। লেখক গায়কদের বেলায় যদিও বা কিছুটা সমঝে কথা বলে মানুষ, আর্টিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বেপরোয়া। রামকিঙ্কর তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী ঐরূপ তাচ্ছিল্যকর মন্তব্যের কষ্ট সয়ে সয়ে শেষমেশ এক জব্বর উদাহরণ মেনে নিয়েছিলেন নিজের তথা তাবৎ আর্টিস্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে। যে দুঃখগন্ধী ভাবনা তিনি পরবর্তী কালে ব্যক্ত করেছেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বলেছেন– 'হাঃ হাঃ আর্টিস্টের কপাল দেখো যেমন খুশি থাপ্পড় লাগিয়ে দিচ্ছে যে পারছে। আমাদের বাঁকুড়ায় থিয়েটারের দলের একটা ঘর ছিলো। থিয়েটারের নানা সরঞ্জাম থাকতো তাতে। ঢোল ছিল একটা। দেখতাম যে যখন পাচ্ছে একবার পিটিয়ে দিচ্ছে।'

এইরকম বহুলোকের নানারকমভাবে পিটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রামকিঙ্কর আগুনের জন্ম কাজটির ইতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কুণালকান্তি সাহা, রামকিঙ্করের ছাত্র তাঁর সহয়োগী থাকাকালীন শুনেছিলেন নানান মন্তব্য। তিনি লিখেছেন– 'কাজটা বেশ কিছুদূরে এগোলো। কিন্তু শেষ হবার আগেই নগ্ন মূর্তির জন্য নানারকম মন্তব্য করতে লাগলেন কিছু লোক।' এইরকম বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনার ঝড় বয়েছিল 'ধান ঝাড়াই' কাজটি করার সময়। রামকিঙ্করের সহকারী বাগাল রায় বলেছেন– 'ওটা করার সময় ওর চারিধার ঘিরে দেওয়া হইছিল।

অনেকে আপত্তি করেছিল। মেয়ে মূর্তি তো কাপড়-চোপড় নাই। ঢাকা দিয়ে দিতাম গো সব সময়। ঢাকা দেওয়া থাকত।'

আরও একটি মূর্তির কাজ চলাকালীন বিশেষ শোরগোলের কথা শুনিয়েছেন আমাদের বাগাল রায়। বলেছেন– 'তারপর অর্ধনারীশ্বর করেছিলেন। সেইটা নিয়েই খুব একটা ঝামেলা হয়ে গেইছিল।'

বস্তুত দেখা যায় রামকিঙ্করের ভাগ্যাকাশে প্রথম দিকে যেমন দিগবিদিক জুড়ে নানান আলোর রোশনাই, তেমনি বিবিধ প্রকার অন্ধকারের ধাক্কাও তাঁকে মারাত্মক ভাবে ঘায়েল করেছে সূর্য পশ্চিম আকাশে চলতে শুরু করার সাথে সাথে। তো একটি নাক সিটকানো মন্তব্য রামকিঙ্করের মাথায় বেঁধা হয়েছিল, শুনিয়েছিলেন সে কথা তাঁর ছাত্র রবি পালকে। সাঁওতাল পরিবার প্রসঙ্গে রবি পালের আলোচনায় পাওয়া সেই সমালোচনাটি ছিল– প্রথমত রামকিঙ্কর এমন একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন যেখানে তথাকথিত কেতাবি প্রথায় অঙ্কনরীতির শেখানো তো হতোই না আর ভাস্কর্য শিক্ষা তো বহু দূরের স্বপ্ন ছিল। দ্বিতীয়ত অবনীন্দ্র নন্দলাল প্রবর্তিত নব্য-শিল্পরীতিতে শিক্ষিত রামকিঙ্করের ভাস্কর্য সম্পর্কে কোন ধারণার ভিত্তি নেই। তৃতীয়ত ভাস্কর্যের অস্থিসংস্থান বিষয়ে তৎকালীন সাধারণ জনের প্রচলিত ধারণায় 'শান্তিনিকেতন শৈলীর' লবঙ্গলতিকা ভাবের (শ্লেষসূচক সমালোচনার ভাষায়) প্রভাব অতিমাত্রায় এই ভাস্কর্যের উপর প্রতিফলিত। চতুর্থত ভাস্কর্য তৈরির করণকৌশল সম্বন্ধে রামকিঙ্করের সম্যক জ্ঞানের অভাব। পঞ্চমত সমগ্র ভাস্কর্যটির মধ্যে রামকিঙ্করের শিক্ষানবিশীর উৎকট গন্ধ বর্তমান'। এই সাম্প্রতিক কালের কিছু রাজনীতিবিদও রামকিঙ্করের চরম অজ্ঞতার গন্ধ পেয়েছিলেন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ বলে নাকি সেই পুরনো বিদ্বেষের সূত্রে কে জানে। কাগজে গান্ধীমূর্তিকে ভেঙে ফেলার কথা শোনা যায়। গান্ধীজির ভাবমূর্তি বিকৃত করা হয়েছে এই অজুহাতে। ঋত্বিক ঘটকের চোখে 'রিয়েল গান্ধীজীর' মূর্তিটি রামকিঙ্কর গড়েছিলেন বেশি বয়সের অপটুতার কারণে এসিস্ট্যান্টদের সহযোগিতায়। ফলে গান্ধীজীর ম্যাকেটে যে জোর দেখা যায় তার সম্পূর্ণ প্রকাশ না ঘটায় দুঃখ ছিলো রামকিঙ্করের। বলেছেন– 'দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণে চলেছেন গান্ধীজী। পায়ের নিচে কঙ্কাল করোটি। কোমরে সেই বিখ্যাত থলি এবং ঘড়ি। পায়ের নিচে শান্তির বাণী খোদিত রয়েছে। আমারই করা। ঠিক কমপ্লিট কাজ নয়। ঋত্বিক ঘটকের এটা অবশ্য খুব প্রিয় কাজ বলে মনে হতো। ও বলতো এই মূর্তিটার মধ্য দিয়ে আপনি একেবারে রিয়েল গান্ধীজীর অবদান মূর্ত করতে পেরেছেন।'

এখন কথা হচ্ছে শিল্পকলার মূল রসটি উপলব্ধি করতে হলে রসিকের রসগ্রহণ করার যে ক্ষমতা সেটি থাকা চাই বাপু। আর্টিস্ট যে পয়েন্টে কাজটি করেছে সেই

পয়েন্টে আসতে পারার ইনটুইশন বা স্বজ্ঞারও দরকার পড়ে। যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসীরা একটা কথা বলেন 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' সেই প্রাণের মানুষ না হলে বোঝা বড় দায় বইকি। তবে শিল্পকলার ইতিহাসে বেরসিক মানুষরাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যান দেখতে পাই। তাই শিল্পীরা বারবার মার খান বেদম। খুব খেদের সাথে তাই তো রামকিঙ্কর বলেছিলেন– 'মাতব্বরী দেখেছো? দিগ্‌গজ সব। যে কিছুই বোঝে না সে-ও বিনা মূলধনেই কেমন বিচারক বনে যায়। আর হতভাগ্য আর্টিস্ট পড়ে পড়ে মার খায় বেদম।. . . রুচির মার তাতে মরছে। আবার রুটির মার– ভাতে মার, তাতে মরে হে। দুনিয়া জুড়ে শিল্পীর মরণ।' হ্যাঁ অকাট্য কথাই তাঁর। তথাপি তাঁরা কাজ করে চলেছেন। মানুষের মনের খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছেন খেয়ে না খেয়ে মান সম্মানের তোয়াক্কা না করে। ভ্যান গখ, মদিগ্লিয়ালিনির মতো দারিদ্র্যসীমার নিচে যাবতীয় কষ্ট যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে। আর এই কষ্টের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে প্রতিবাদের সঠিক ভাষাও। রামকিঙ্করের জীবনে চরম লাঞ্ছনা, চরম দুঃখ আবার তীব্র আনন্দও রয়েছে। এইসব ঘটনা সাপেক্ষে তাঁর মন এমন একটা জায়গায় উপনীত হতে পেরেছিল, যেখানে আশপাশের ঘটনা তাঁকে বিচলিত বা আকৃষ্ট করতে পরেনি। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে ভীষণ জরুরী যে একাগ্রতা তার সাথে সহজাত আবেগ যুক্ত হয়ে জন্ম হয়েছে কালজয়ী সব ভাস্কর্য ও চিত্রকলার রত্নসম্ভার। যার অধিকাংশই দেখা যায় সমাজবাস্তববাদী তথা প্রতিবাদী এক রামকিঙ্করের মুখ। এইরকম প্রতিবাদী ভাষার একটি রূপ ১৯৬৫ সালে রামকিঙ্করের 'মাৎস্যন্যায়' তাঁর শেষ বয়সের করা নিজের জীবনের বহু লাঞ্ছনা যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। একটি বড় মাছ তুলনায় ছোট মাছকে গিলে খাচ্ছে – এই প্রতীকি ভাষার ভাস্কর্যটিতে সমাজ সংসারের সবলের দ্বারা দুর্বলের টুটি চেপে ধরার বিকৃত চিরকালীন রূপটিকে তুলে ধরেছেন রামকিঙ্করের ছবির মতো। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের রুচি বদল হয়। সমাজেরও পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো সামাজিক অন্যায় বা অপরাধকে শিল্পী তাঁর তুলির সাহায্যে এমন ভাবে ফোটাতে পারে যা প্রতিরোধেরই কাজ করে। করছেও। সমাজ পরিবর্তনে শিল্পীর ভূমিকা আছে। এবং থাকা উচিত।'

রামকিঙ্কর বেঙ্গল স্কুলের রোমান্টিক জগতের বাইরে গিয়ে কঠিন বাস্তবকেই তাঁর ছবি ও মূর্তিতে তুলে ধরেছেন যদিও তাঁর প্রথম দিকের কাজে রোমান্টিকতা, কল্পনা ও পৌরাণিকের দেখা মেলে। ছবিতে 'সীতা', 'শকুন্তলা', 'অন্নপূর্ণা', 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' ও 'বসন্ত' যেমন। তেমনি ভাস্কর্যেও সুজাতা, বাতিদান, যক্ষযক্ষী, বুদ্ধ প্রভৃতি রয়েছে। শিল্পী রবি পাল লিখেছেন– 'রামকিঙ্করের দীর্ঘ শিল্প জীবনকে মূলত পৌরাণিকতাবাদ, কল্পনাবাদ, সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ এই চার ভাগে ভাগ

করা যেতে পারে। অহিংসবাদ দিয়ে শিল্পী জীবন শুরু করলেও শান্তিনিকেতনে আসার পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানান ঘাত-প্রতিঘাতের অনুভূতি ছবিতে বা মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন এবং শেষ ধাপে মানবতাবাদকে বেছে নিয়েছিলেন। শিল্পীর জীবনে ওই সামাজিক অর্থনৈতিক নানান প্রতিকূলতা তাঁকে একাগ্র করে শিল্পের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল বলা যায়। চারপাশের প্রতি আকর্ষণ মুক্ত মন একনিষ্ঠ ধ্যানের মধ্য দিয়ে বিষয়ের সারসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাই সুন্দরের চাইতে সত্যের উপরই তাঁকে বেশি জোর দিতে দেখা যায়।' শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন– 'মানুষ হিসেবে শিল্পীর ব্যবহারিক জীবন এবং স্রষ্টারূপে তাঁর শিল্পী জীবনে অনেক দ্বন্দ্বও দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বই অনেক সময়ে শিল্পীকে নতুন উপলব্ধির পথে চালিত করতে সক্ষম হয়।' এজন্যই হয়ত দেখা যায় তিনি যেমন সুন্দর চাননি তেমনি কঠোর বাস্তবও। আবেগকে তিনি বেশির ভাগই সংযত করেছেন। অনুভূতিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি। প্রতিকৃতি ভাস্কর্য অনেক সময় দেখা যায় প্রতিমার দিকে চলে গেছে। কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'প্রত্যেকদিন একটি তেলের রঙের ছবি সম্পূর্ণ করেছেন। আবার প্রত্যেক দিন তা মুছেও ফেলেছেন। কারণ হিসেবে তিনি যা বলতেন তা ছিল খুব টিপিক্যাল, যেমন 'কাজটা ছিল খুব বেশি সেন্টিমেন্টাল। খুব বেশি চমৎকার, খুব বেশি ক্যাজুয়াল। কিন্তু এগুলি আমাদের কাছে খুব বেশি জীবন্ত বলেই মনে হত।'

বিদ্রোহ ছাড়া শিল্পের নতুন পথ আবিষ্কৃত হয় না, হয়নি। শিল্পীর জীবনে নানা প্রকার দ্বন্দ্বই তাকে নতুন উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। আর তখন নিজস্ব প্রজ্ঞার পরম্পরা ভেঙে শিল্পী বেরিয়ে আসেন নতুন রীতি, করণকৌশল সহ অভাবনীয় এক রস সৌন্দর্যকে হাতে নিয়ে। শিল্পীর উপলব্ধিতেই শিল্পের নতুন যুগ শুরু হয় যেহেতু সৃষ্টির উৎস হল মানুষের অন্তরের বস্তু।

যে হৃদয়াবেগের শক্তিতে সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে সেখানে চলতি গ্রামারের দৃঢ় বাঁধন আলগা হয়ে আরো বড়ো কোনো গ্রামারের দিকে চলে যায় যেখানে দেখা যায় আকাশের চাঁদের মতো কিছুটা অসম্পূর্ণতা ও কলঙ্ক নিয়েই যেন রসিক হৃদয়কে বিশেষ আলোড়িত করে। যেমন শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন– 'সাহিত্যিক যে সব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন সেই শব্দগুলি অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু অভিধানিক অর্থ এবং সাহিত্যে গাঁথা শব্দের তাৎপর্য বদলে যায়। এই তাৎপর্য বদলে যাওয়ার শক্তিকেই বলি সৃষ্টিশক্তি।'

প্রকৃত পক্ষে এই সৃষ্টিশক্তি বা এলেমই হল শিল্পীর সম্পদ যার মধ্যে নিহিত থাকে ছন্দের চেতনা, সন্নিকর্ষ শক্তি ও রসসৌন্দর্য। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়াবেগের

শক্তিতেই এগুলির অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। আর এই হৃদয়াবেগে ছিল রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে সহজাত। তিনি কিন্তু তাঁর এই হৃদয়বেগকে বরাবরই নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন কখনই খুব বেশিরকম বেপরোয়া হতে পারেননি। কিন্তু কথা হল এই হৃদয়াবেগ তো শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্জন করা যায় না। শিল্পীর অন্তরে এই মূল্যবান বস্তুটির মজুত থাকাই চাই নচেৎ সৃষ্টি ক্ষেত্রে শিল্পীর অবদান হৃদয়স্পর্শ করতে অক্ষম হয়। এ বিষয়ে শিল্পী বিনোদবিহারীর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য : ভাষা আঙ্গিকে শেখানো যায় আবেগ উদ্দীপনা শেখানো যায় না। এটি সহজাত শক্তি। কোথাও এর উত্তাপ কম কোথাও বেশি। এখানে পরম্পরা অথবা সমাজের দাবিতে এই ব্যক্তি নির্ভর শক্তিকে চেপে মারার চেষ্টা এক ধরনের সামাজিক বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে বলাই বেশি যে রবীন্দ্র পরবতী সময়ে রামকিঙ্করের আবেগকে বারবার চেপে মারাই হয়েছে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি তাঁর পরিণত অভিজ্ঞ মস্তিষ্কের রূপকল্পনার বহু কাজই। কিন্তু থাক সে কথা। আপাতত রামকিঙ্কর পুঁজি বলতে কি বুঝিয়েছেন সে কথায় আসা যাক। যে পুঁজি বা মূলধন নিয়েই তিনি বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। যে পুঁজির দৌলতেই চারপাশ থেকে শিল্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গূঢ় বিষয়গুলিকে আত্মস্থ ও অন্তর্গত করে বিশাল মহীরূহ করে অভিব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন– 'শান্তিনিকেতনে এসে শিখেছি বৈকি। শিখতে তো হবেই। একটা ভাষা তো। তবে সেটা ঠিক মাস্টারের কাছে শেখা নয়। ছোটবেলা থেকেই তো মানুষ শেখে। দেখে, আঁকে। শেখা মনে কী জানো? দেখতে জানা– রসিক হওয়া। এ কাজে ভালো গুরুরা একটু হেল্প করেন, করেন বৈকি।... তোমার মাস্টার তো পরশমণি নয় যে ছোঁয়াবে আর সোনা হয়ে যাবে সব। আর পরশমণি হলেই বা কী? তোমার নিজের পুঁজি চাই, পুঁজি থাকতেই হবে, নৈলে বাপের সাধ্য নাই। বীজ পড়বে বালির গাদায়। তিনি আরো বলেছেন– 'স্কুল তো আর্টিস্টের জন্ম দেয় না। আর্টিস্ট মাত্রেই হল ভুঁইফোঁড়।... মাটি ফুঁড়ে যে ওঠে। মাটি মানে কী বলো দেখি– জীবন, জীবনের মাটি।'

রামকিঙ্কর আবার ছেলেবেলা থেকেই এই জীবনকে দেখেছেন নানা কাজে, মাঠে ঘাটে ক্ষেতে খামারে– যেখানে মানুষ কর্মরত। শরীর যেখানে খাটুনির ঘা খেয়ে গড়ে উঠছে ফুটে উঠছে। তিনি বলেছেন– 'সেই ফুটে ওঠা রূপ কী জীবন্ত কী তেজীয়ান। সেখানে রূপটাই কথা।' প্রকৃতিকে দেখেছেন তিনি দু-চোখ ভরে, দেখার ইচ্ছার সমগ্রতায় সর্বসত্তা দিয়ে। ছেলেবেলার সেই অপার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি জীবনের প্রান্তে এসেও। এক মনে রতন পল্লীতে মোড়ায় বসে পারুল লতার সৌন্দর্য, আঁকা বাঁকা চলা ও আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখতে তন্ময় রামকিঙ্করকে দেখেছি তো। ভাবি কোন এক অচিন ঈর্ষা বিদ্বেষ মুক্ত রঙ্গিন পৃথিবীর

মানুষ তুমি এ ধরায় এসেছিলে গো। এ পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য তাঁকে আপ্লুত করেছে সারাটাজীবন। এই দেখার ইচ্ছাই তাঁকে আরো গভীর ভাবে দেখতে শেখাতে এমন একটা কলাশিল্পসিদ্ধ গুরুর কাছে নিয়ে এসেছিল যিনি আউট ডোর স্কেচ করতে গোয়ালতোড়, তালতোড়, সুরুল ও আশপাশের সাঁওতাল পল্লীগুলোকে পাঠাতেন। নিজেও যেতেন। কারণ আউটডোর স্টাডি ছাড়া দেখার চোখ তৈরি হওয়া ছাড়া কলাশিল্পে দক্ষত্যাগে দুর অস্ত। রামকিঙ্কর বারবার তাই আউটডোর স্টাডির কথা ছাত্রদের বলতেন। বলেছেন– 'কাজ করে যাও নিজের মনে। আর তাকিয়ে দেখো আশপাশের কোথায় কী হচ্ছে। কেবল স্টুডিয়োর বসে থেকো না। স্টুডিয়োটাকেই সর্বস্ব করো না। স্টুডিয়োর বাইরেই সব।'

আরও বলেছেন– 'দেখা, অবজারভেশন ওটাই কথা। দেখো না আমাদের পটুয়ারা তো আর্টস্কুলে পড়েনি। ওদের পারিবারিক পরম্পরা সেটার মধ্যে অবজারভেশনই কাজ করছে। শিক্ষার মানে অবজারভ করার শিক্ষা। নিজেকেই শিখতে হবে। চলতে শেখা, দেখে শেখা, ঠকেও শেখা। এ ব্যাপারে স্কুল মাস্টার খানিকটা সাহায্য করতে পারে।'

রামকিঙ্করের নিজের ক্ষেত্রে স্টুডিয়োর বাইরে খোলা জগৎটাই ছিল তার আসল কর্মক্ষেত্র। সেখানকার চলমান জীবন বা কর্মরত মানুষজন, জীবজন্তু-পশুপাখিরাই ছিল তার মডেল। তিনি প্রকৃতি থেকেই তাঁর শিল্পের যাবতীয় রসদ সংগ্রহ করেছেন। বর্ষার মেঘে তৈরি হওয়া নানান আকৃতি, ঋতুচক্র ও প্রতিদিনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্নরূপ তাঁকে উত্তেজিত করেছে প্রবল। তিনি দিনের পর দিন সে সব থেকেই আঁকা ও মূর্তিগড়ার পাঠ নিয়েছেন। বলেছেন– 'কী জোর! অনেক চেষ্টা করেও ঐ জোর আমাদের কাজে আনতে পারি না। যেমন পারি না ঐ মাস্টার আর্টিস্টের রঙের খেলায় রঙ লাগাবার জোর। উঁহু, পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। সূর্য ডোবার সময় দেখেছো তো রঙ লাগাবার কী সাংঘাতিক সাহস। আমরা ডরেই মরি। হাঃ হাঃ।'

এই প্রকৃতি থেকেই তিনি আবার সুন্দর সুন্দর লাইনও সংগ্রহ করেছেন। পেয়েছেন লাইনের জোর দেখাবার ভাবনাও। মূর্তিতে যে তাঁর লিনিয়ার বিউটি তাও মূলত যে ঐ প্রকৃতি থেকেই সংগৃহীত একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি শিল্পীদের চোখ ফুটিয়ে দেওয়ার মত একটি বিশেষ কথায় বলেছেন যেখানে যত লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। নেচার হচ্ছেন দেবশিল্পী। কত রকম সুন্দর সুন্দর লাইন সৃষ্টি করে চলেছেন সে সব শিখে, মনে রেখে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে। লাইন সুন্দর হলে ছবি ভালো লাগবেই। মানে থাক আর নাই থাক। এবং লিনিয়ার বিউটি বিষয়ে বলেছেন– 'এ্যাঙ্গেল বেছে নিয়ে ড্রইং করলে তবেই তোমার লিনিয়ার বিউটি থাকবে। সব এ্যাঙ্গেল থেকে নয়।'

মোটের উপর আমরা দেখতে পাই অতীতের ঋষি মুনিদের দ্বারা সৃষ্ট যে রাগিণীর সুর যেমন তাঁরা প্রকৃতি থেকেই চয়ন করে মালা গেঁথেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকৃতির সন্তান রামকিঙ্কর ও তাঁর কলাশিল্পের বিস্তর মূল্যাবান সামগ্রী ও সম্পদ মূলত সংগ্রহ করেছিলেন প্রকৃতি থেকেই। তাঁর বোহেমিয়ান জীবন অতিবাহনের বলা যায় এটাই ছিল মূল অভিপ্রায়। শিল্পী কুণালকান্তি সাহার লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি ন্যাকড়ায় ছোলা বাদাম বেঁধে গ্রামের কাছাকাছি কোনো পুকুরে ডুবিয়ে তাতে পাথরের টুকরো চাপা দিয়ে স্কেচ করতে চলে যেতেন। খিতে পেলে ঐ ডুবিয়ে রাখা স্থানে ফিরে এসে স্নান সেরে ঐ ভেজা ছোলা বাদাম খেয়ে আবার কাজে লেগে যেতেন। এ হল সেই বাঁচার জন্য খাওয়া। তো এমনই ছিল শিল্পের প্রতি একাগ্র চিত্ত ও উৎসর্গীকৃত জীবন রামকিঙ্করের সাধক সুলভ মানসিকতার দিকে। শিল্পপাগল রামকিঙ্কর এই ভাবে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে প্রকৃতি ও কর্মরত মানুষজনের জীবনের গভীরে ঢুকে নিজের ইনট্যুইশান দিয়ে দৃশ্যের মূলভাব ও চলমান জীবনের ছন্দ, গতি ও ফুটে ওঠা রূপকে নিজের কাজের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে গেছেন। যে আদিমতা ছড়িয়ে আছে গাছে পাতায় অরণ্যের অন্তরে পাহাড়ে বা চাঁদের শোভায় তাকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতায় তুলে এনেছেন তাঁর ক্যানভাসে, খাতার পাতায় ও কংক্রিটের মূর্তির কাঠামোয়। দূর থেকে ওপরসা ওপরসা না দেখে বরং সাবজেক্টের গভীরে ঢোকাই ছিল তার বরাবরের অভ্যাস। এই জন্য তাঁর ছবি কখনো-বা বিমূর্তের দিকে চলে গেছে যেখানে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের রাত্রি ঘেরা বাড়িগুলোর চাল আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। মনে পড়ে যায়, এক আলোচনায় রামকিঙ্কর বলেছেন– 'অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে তুমি যদি দেখ ভালো করে প্রকৃতিকে তবে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্টে চলে যবে। সেটা ডিপেণ্ড অন ইউ। তুমি কতটা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারো জিনিসটা সেটার উপর নির্ভর করবে।'

শিল্পকে একপ্রকার খেলা ভেবেছেন রামকিঙ্কর। এজন্য নিজেকে পাল্টেছেন কাজের বিষয়বস্তু অনুসারে। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিকে যেন আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে এই মাত্র উঠে আসা অরূপ রূপের জ্যোসনা মনে হয় যেখানে ধ্বনিত হতে থাকে জীবনের যৌবনের আর প্রকৃতির জয়গান। মুহূর্তকে ধরবার জন্য তাঁকে জোর দিতে দেখা যায় বিভিন্ন রকম সারফেস ও ডেনসিটি ট্রেটমেন্টের উপর। আবার কখনো-বা সাবজেক্ট ও লোকেশনের ভিন্নতার সঙ্গে ছন্দেরও পরিবর্তন এনেছেন। এক একটি জায়গাকে সামগ্রিক ভাবে তুলে আনতে বেছে নিয়েছেন ওয়াশের টেকনিক এবং দুটো জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে পশ্চাৎ ও সম্মুখগামী রঙ প্রয়োগ করেছেন তীব্রতার সাথে। ছুটে যাওয়া রুপোলি রঙের গোরুর গাড়ি, খেজুর গাছের

সারিতে ভেতর ধোঁয়াময় ট্রেনের গতি। কোপাইয়ের ঢালু পাড় বা শিমুল গাছের সারি প্রভৃতি ছবিতে তাঁর বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দতা রসিক দর্শককে রীতিমতো বাকরুদ্ধ করে দেওয়ার মতো। উপরোক্ত এসব আলোচনা মূলত গবেষকদেরই কথা। কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'একজন অনুশীলনরত ভোজ-বাজীকর বা একজন ভারসাম্য পটু খেলোয়াড় বা একজন দড়ি হাঁটিয়ের (Ropewalker) দড়ির উপর দিয়ে স্বাচ্ছন্দতায় হেঁটে যাওয়াকে যেমন ভাবে সহজেই আয়ত্ত করেন, তিনিও ঠিক তেমনি ভাবেই অনায়াসেই আয়ত্তে এনেছিলেন এইসব পিণ্ড-রেখা আর ছন্দকে নিয়ে ভাবপ্রকাশই হল শিল্প। ছন্দের গতিতে নিজের ভাবপ্রকাশকে ধরবার প্রয়োজনে শিল্পীরা আকার রূপের পরিবর্তন বা ভাঙন এনে রূপবান ও বাঙ্ময় করে তোলেন। রামকিঙ্কর যেমন মৎস্যমহিষ কাজটিতে মোষের পিছন দিকের অংশ মাছের লেজের আকৃতি দেখিয়েছেন, 'তবলায় চাটি' দেখিয়েছেন, তেমনি আবার কংকালীতলার পথে ক্যাকেটে দেখা যায় ছাগমুখের বদলে যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখ বসিয়েছেন। আবার 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম' ছবিতে বসুদেবের মুখটি গ্রামারের তোয়াক্কা না করে পিছন দিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়ায় তাঁর বক্তব্য বিষয়টি পরিপূর্ণরূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এছাড়া ছন্দের খাতিরেও তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যে আবার রূপের ভাঙন কোথাও বৃথা হয়নি।

'তার একমাত্র কারণ শিল্পীর সকল জীবজন্তুর আকার বা শরীর গঠনপ্রণালীর (Anatomy) ড্রইং জানা ছিল। তার সঙ্গে ছিল ভাবের তীব্র আবেগ। সেই কারণে শিল্পীর সব সৃষ্টির কাজই ছন্দের তাগিদে আকার রূপ ভাঙার মধ্যে একটা দৃঢ়তা সুসামঞ্জস্য ও বলিষ্ঠ ছন্দ গতির মাধুর্য এনে দিয়েছে।...' 'ভালো ড্রইং জানা এবং নরনারী পশু-পাখীদের দৈহিক গঠন জ্ঞান থাকায় তাঁর সব ছবিতেই একটা সরল ভাব প্রকাশ পেয়েছে।' লিখেছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা।

বস্তুত রামকিঙ্করের ছবি বা ভাস্কর্যরে সমস্ত ক্ষেত্রে কি ট্রিটমেন্ট কি এপ্লিকেশন কি কালার সিলেকসন প্রভৃতি বিষয়ে ছিল এক অসামান্য নিখুঁত বোধদীপ্ত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয়। সঠিক মাপজোটের হিসেব, নিখুঁত প্রোপোরসন জ্ঞান, অত্যাশ্চর্য ব্যালেন্সবোধ বা রঙের পরিমিতিবোধ ও মাত্রার হিসেব বাস্তব দৃষ্টিতে বিশেষ বোহেমিয়ান বাউল মানসিকতার রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে বেশ অদ্ভুত লাগে। তিনি তাঁর প্রখর দৃষ্টি, তীব্র অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষমতা সঠিক ধারণাশক্তি ও একনিষ্ঠ মনন ও ধ্যানের ভিতর দিয়েই শিল্পকলার যাবতীয় গাণিতিক, নান্দনিক ও যৌক্তিকতার বিষয়গুলিকে ঠিক কব্জা করেছিলেন বলা যায়। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বলেছেন– 'আমরা যদি কিঙ্করদার ঐ বিশাল মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াই দেখব কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি কোথাও কিছু বাদ পড়ে গেছে কিংবা

ঐ অংশটা আরো একটা করলে এর মাধুর্য ফুটে উঠতে সাহায্য করত বলে মনে হয় না। আরো বলেছেন– 'কালো কালির কাজের পাশে দাঁড়ালে কখনোই মনে হয় না এটি বহুবর্ণের রঞ্জিত হলে আরো মাত্রা পেত বা রঙিন ছবির পাশে দাঁড়িয়ে একথাও মনে হয় না তা বর্ণবাহুল্যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।'

খুব ছোটবেলা থেকেই শিল্পকলায় বিশেষ মনোযোগী রামকিঙ্কর ছবি ও মূর্তিকে কখনোই আলাদা করে দেখেননি। তিনি বলেছেন– 'গোড়া থেকেই আমি দু-ঘোড়ায় পা রেখেছি হে।' পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতন পর্বে পেন্টিং, স্কাল্পচার, গ্রাফিক্স, ডিজাইন প্রভৃতির আলাদা বিভাগ না থাকায় শিল্পের নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়েই ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা সমাপন করতে হত বলে তাঁর ছবিতে এসেছে যেমন মূর্তির আদল তেমনি মূর্তিতে ছবির ছন্দময় রেখা ও রূপ। তাঁর 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশী' প্রভৃতি শিল্প কর্মের লিনিয়ার বিউটি বিশেষ চোখে পড়াবে একটি বিষয়। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন– 'এ্যাঙ্গেল বেছে নিয়ে ড্রইং করলে তবেই তোমার লিনিয়ার বিউটি থাকবে সব এ্যাঙ্গেল থেকে নয়। স্কাল্পচারে ছবির ছাপ বা ছবিতে স্কাল্পচারের হেভিনেশ বা ত্রিমাত্রিকতার ইমেজকে তিনি কোনো আপদ বা ক্ষতির আশঙ্কার বদলে বরঞ্চ তাতে লাভের কথাই শুনিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর উদাহরণ 'মিশরের মূর্তি তো ছবিই।' তাঁর এ ব্যাপারে সুচিন্তিত মন্তব্য– 'আসলে কী জানো ছবি আর মূর্তি দুটোর মুখ দেখা দেখি হবে না এমন ভাববো কেন?. . . আর্টিস্টের কাজের ঘরে সব দরজা খুলে রাখা ভালো। খুলে রাখা দরকারও বটে।' টেকনিক বিষয়ে রামকিঙ্কর ভেবেছেন তবে কখনই টেকনিক-সর্বস্ব হয়ে পড়েননি। তিনি জানতেন টেকনিক বলে আসলে আলাদা কোনো জিনিস নেই। শিল্পীর ভাবনা আঁকুবাঁকু করতে থাকে বেরোবার জন্য। নিজেই পথ করে নেয়। বেরোবার পথ টাকেই বাইরে থেকে লোকে বলে টেকনিক। প্রকৃত অর্থে গ্রামারের এভাবেই তো সৃষ্টি। তিনি কাজ করে গেছেন আর প্রয়োজনে এসে গিয়েছে করণকৌশল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। তাঁর ভিতরের আগুনই আবার নতুন টেকনিকের জন্ম দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি ভ্যান গখকে উদাহরণ করেছেন। বলেছেন 'ভিতরে মনের আগুন চাই। ভ্যান গখকে দেখো না। সেই আগুন টেকনিককে কোথায় নিয়ে গেছে। কোথায় পৌছাবে ও দেশের এতোদিনের পণ্ডিতি পথের তোয়াক্কা না করে।'

অবশ্য সচেতন ভাবেও টেকনিকের প্রয়োগ করেছেন কোথাও কোথাও রামকিঙ্কর। তবে তা প্রয়োজনে এবং বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টায়। জোর করে টেকনিকের ব্যবহার করেননি, কারণ তাঁর মতে– 'টেকনিক যদি 'দেখো দেখো' করে তবে ছবি গেলো জাহান্নামে। ঐখানেই জোর চাই আর্টিস্টের– শাসনের

জোর– বাগ মানাবার হিম্মত।' করতে করতে গ্রেইং প্রোসেসের মত নানান টেকনিকের ভাবনা এসে গেছে তাঁর মাথায় জানতে বা অজান্তেই। আর এটাই তো স্বাভাবিক। ইচ্ছার প্রাবল্যই এখানে মূলকথা। বলেছেন– 'দেখো যা দেখেছি তাকেই দেখাতে গিয়ে কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি-পরীক্ষা এসব এসে গিয়েছে কাজে। . . তবে জবরদস্ত করে টেকনিক আমদানি করিনি কখনো। ওই যাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা হয় ওতে আঙ্গিকের অনেক নতুন পরীক্ষা আছে। সবই কাজে লাগিয়েছি বলার কথাটা বলতে গিয়ে। শুধু শুধু আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষায় বসিনি।'

আসলে শিল্পী অন্তরে শিল্প প্রচেষ্টার তীব্র আগুন যদি না থাকে, আপাদমস্তক শিল্পবোধ না থাকে, তবে ঐ আর্ট কলেজের গণ্ডী পেরনো পুঁথিগত বিদ্যার টেকনিকের ভূত আর্টিস্টকে নাস্তানুবাদ করে ছাড়বেই, ঘাড় মটকাবেই তো। বস্তুত ভাব থেকেই আসে ভাষা, সাথে সাথে গ্রামারও পেয়ে যাই। এত যে টেকনিকের রকম ফের সবই তো শিল্পীর ভেতরের শিল্প প্রচেষ্টার তীব্র আকুতি থেকেই পাওয়া। তাই টেকনিকের বাহাদুরী দেখানো টেকনিক-সর্বস্ব শিল্প প্রচেষ্টাকে কতটা বা কত দূর কলা আখ্যা পাবার যোগ্য তা ভেবে দেখার জিনিস। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'আজকাল যখন দেখি কিছু না ভেবেই অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ করতে লেগে যায় কেউ, ভিতরের কোনো তাগিদ নেই, কষ্ট হয় দেখে। কিংবা শুধু টেকনিক-টেকনিক করেই গেলো টেকনিক জন্ম নেবে তোমার ভিতরের গরজে। ওটা বাইরের জিনিস নয়। একটা তুলে রাখা আলাদা জিনিসও নয়। তোমার ভাষার সঙ্গে কাজের সঙ্গে সেঁটে আছে।' আরও বলেছেন– 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হজম করা মুস্কিল। করাটা সোজা। কিন্তু বুঝে করা সহজ নয়। তাই ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এখন মনে হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ছেড়ে দেবার সময় এসেছে।'

এই বিমূর্ত আর্ট বিষয়ের ভাবনা রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ' বাতিদান' ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম রূপদান করলেন কংক্রিটে। অতঃপর তিনি আরও বহু বিমূর্ত ভাবনার কাজ করেছেন যেগুলি বলা বাহুল্য বর্তমানে ও আগামী দিনের শিল্পীদের পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। রামকিঙ্কর এই দুরূহ ভাবনার বিষয়টি বোঝাতে কখনই জটিল বাক্য বা কথার মার প্যাঁচে বিদেশী শব্দ বা ভাষার আশ্রয় নেননি, নিতে হয়নি। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ভাবকে বোঝানোর পারঙ্গমতা 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র কথা মন করিয়ে দেয়। স্মরণ করায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের কথাও। রামকিঙ্কর তার সাদামাটা কথায় বলেছেন– 'বস্তুর প্রতিকৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে একেবারে বাদ পড়েছে। রেখা ডিজাইন প্রধান হয়েছে। স্কিয়ার, সিলিণ্ডার, শোওয়া লাইন, খাড়া লাইন, বাঁকা রেখা বা তাদের উর্দ্ধগতি নিম্নগতি– এই নিয়েই কাজ।

কোনো রূপের অনুকরণ না করলে কেবল ভেতরের সুরটি এতে ধরা পড়বে। এবং বলেছেন– 'কোকিলের ডাক, পাপিয়ার ডাক আলাদা করে কিছু নেই, সব মিলেমিশে বসন্তের পরিবেশ রচনা। অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করে। রাগিণীর এভাবেই সৃষ্টি। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টও সেই রেখা ও ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত।. . . আমাদের ক্লাসিক্যাল গান এক ভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে শুধু সুর দিয়ে, অনুভব দিয়ে, কথা দিয়ে নয়।' আরও বলেছেন– 'সাধারণ মানুষও হঠাৎ কথা ছাড়া সুর ভেঁজে চলে তা করতে ভালোবাসে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিও তাই।' কিছুটা পিছন দিকে হাঁটলে আধুনিক কবিতা বিষয়ে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের বলতে শোনা যেত 'আজকাল আকাশে ধান চাষ করছে গো আধুনিক কবিরা।' আবার অ্যবস্ট্রাক্ট ছবি বা মূর্তিকে বলতে শুনতাম যার কোনো মানে নেই তাই নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট। তো ভিরমি খাওয়া সে সব কথায় সায় দিতে না পারা মন ভাবত রিয়ালিস্টিক কাজে ছন্দ ও সৌষম্যের চূড়ান্ত চূড়ায় পৌঁছে হঠাৎ শিল্পী প্রোফাইলে দুটো চোখ দেখালেন কিংবা নাকের পিছন দিকটা দৃশ্যমান-এসবই যে মিনিং লেস বা নিজেকে বিজ্ঞ প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়, তা বুঝতাম। অবশেষে পাওয়া গেল রামকিঙ্করের বাণী। হ্যাঁ বাণীই বলা চলে কেন না অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টকে বুঝতে তো ইংরাজির দ্বারস্থ হতে হল না। ইংরাজি ছাড়া নাকি সঠিক ভাব প্রকাশ পায় না, নাকি কৌলিন্য থাকে না। মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ লাটু মহারাজ স্বামীজীকে বলেইছিলেন যে 'তুমি কি রকম বিদ্বান যে আমাকে বোঝাতে পার না।'

আচার্য নন্দলালের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন রামকিঙ্কর। নন্দলাল সহজবোধ্য ভাবে, সরল ভাষায়, উদাহরণে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছেন ছাত্রদের। রবীন্দ্র গবেষক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'ওঁর সহজিয়া ভাষার জোর আর যাদু সে তো মস্ত আকর্ষণ। সে আমাদের পোষমানা ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নির্জীব ভাষা নয়, প্রাণের তেজে তেজীয়ান টাটকা জ্যান্ত ভাষা কখনও সন্ধ্যাভাষার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, তার জট খুলতে সময় লাগে সাধনা লাগে। আবার কখনো ফোঁস করে ওঠে, ছোবল দেয়।'

যাই হোক তাঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়ে অন্যান্য হীরকদ্যুতি ছড়ানো বক্তব্যের কথায় আসা যাক। তিনি বলেছেন– 'কিউবিক থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে আবার। যেমন ধরো একটা লন্ঠন। ইউটিলিটি আছে যা আলো জ্বলবে। কিন্তু ফর্মটা তুমি করছো। ফর্মটা তুমি দিয়েছো। এ্যাঁ, সেটা কিউবিক নাকি? তা তোমার বিচার্য। কিন্তু আলো দেবার যে কায়দাটা সেটা তো তোমাকে করতে হয়েছে। ফর্মটা ইটসেলফ একটা। যেটা তুমি এমনি প্রকৃতির মধ্যে পাচ্ছো না। কিন্তু আমরা করছি সেটা। ইউটিলিটি যে আলো জ্বলবে। তার ভেতরে পলতে থাকবে। তেল থাকবে। তবে সেটি আলো

জ্বলবে। বাতাসে নিভবে না। এ সমস্ত কায়দা দিয়ে সেটি হচ্ছে। এ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে তুমি যদি দেখ ভালো করে প্রকৃতিকে, তবে তুমি এ্যাবস্ট্রাক্ট পৌঁছে যাবে।. . . তুমি কতটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারো জিনিসটা, সেটার উপরে নির্ভর করবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর দুই প্রান্তে বসে বিজ্ঞানী মার্কনী ও জগদীশচন্দ্র বোসের বেতার বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কারের ঘটনা বেতার যন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা অতীতে দেখেছি। এখানে বলা যায় পৃথিবীর দুই মেরুতে বসে একই বিষয়ের গবেষণায় যেমন একই ফল হাতে পেতে পারেন তেমনি আবিষ্কারটির একই নামও মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নয়। রামকিঙ্কর শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই গবেষণার ফল বেরিয়ে আসার কথাই বলেছেন– যেখানে ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্নের সীমারেখার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত তা সার্বজনীন। তিনি আমাদের সত্য উদ্‌ঘাটনের মূল কারণটিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন– 'আমরা প্রকৃতির মধ্যে যা দেখি আমাদের অভিজ্ঞতা এসথেটিক ট্রেনিং; আবেগ অনুভূতি, নৈসর্গিক সচেতনতা ইত্যাদির মিশ্রণে যা হয়, সেখানে ওয়েস্টার্ন বা ইস্টার্নের তফাৎ নেই। শিল্পের সত্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে ঐসব আবেগ অভিজ্ঞতা নৈসর্গিক সচেতনতা ইত্যাদির অপরিহার্যতা থাকলেও শিল্প কর্মের সময় শিল্পীকে তা ভুলতে হয়। নতুবা নতুন কিছু আবিষ্কার সম্ভব নয়।'

এই ভুলতে না পাড়ার যন্ত্রণার কথা, আফশোষের কথা মৃত্যুশয্যায় কোন এক বিদেশী শিল্পী শুনিয়েছেন জানা যায়। তো রামকিঙ্কর সেই গূঢ় তথ্যটিই শিল্পীদের কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন– 'আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কৈশোরের কাহিনী, বই, শিক্ষক-আলাপচারিতা, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের চিরকালীন ঐতিহ্যের দুর্লভতম সংগ্রহশালা রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে। একজন শিল্পীর পক্ষে এসব জরুরী। তাও শিল্পীকে ভুলতে হয় তাঁর শিল্পকর্মের সময়। একে উত্তীর্ণ করে আরও কোনও বিশাল সত্যের পথ নির্দেশ করতে হয়। শিল্পী প্রকৃতি থেকে যা পায় তুলে আনেন তাঁর ক্যানভাসে বা মূর্তির কাঠামোয়। কিন্তু এই প্রকৃতিকে কিভাবে দেখবে শিল্পী? প্রকৃতি বলতে কী?' সেই কথাই রামকিঙ্কর বুঝিয়েছেন তাঁর সহজবোধ্য ভাষায়।

তিনি বলেছেন– 'প্রাকৃতিকে যা দেখছো; প্রকৃতি বলতে কী? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্য-অনুভূতি, শিক্ষা এবং পারম্পরিক শিল্পের অভিজ্ঞতা। পারম্পরিক মানে ট্রাডিশনাল অর্থাৎ মহেঞ্জোদড়ো থেকে শুরু করে মানে তিন হাজার বি. সি, সেখান থেকে শুরু করে আজ আমরা এসেছি বিংশ শতাব্দীতে।'

রামকিঙ্করের শিল্প ভাবনায় মূল্যবান তথ্যগুলি তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়। যা শিল্প শিক্ষার্থীদের কাছে সম্পদের মতই– তাই এসবের পুনরুক্তিতে বিশ্বাস,

বিরক্তি বা ক্ষতির কথা নেই বলা যায়। তাঁর এ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়ের আলোচনাগুলি একজায়গায় জড়ো করে দেখলে বেশ পরিতৃপ্তির বোধ আসে যদিও অনুসন্ধিৎসু শিল্পী বা শিল্প-রসিকের কাছে এগুলি কোনো অজানা বিষয় নয়। তিনি বলেছেন– 'যখন একটা মূর্তি করি তখন যেমন পাথর কাটি লাইন দিয়ে, একটা স্ফীয়ার ঠিক করে তারপরে চেঞ্জ করে একটা ফর্ম আনা হল। ফর্ম তো আগেই ছিল। কিন্তু যেটা হল সেটা ভিস্যুয়াল ফর্ম– ভিস্যুয়াল ফর্ম থেকে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল। বাই দি প্রসেস অফ এলিমিনেশন। কিন্তু ওখানেও থাকবেন কি না তাও দেখতে হবে।. . . পিওর ফর্ম কোণটা? যেটা ভিস্যুয়াল সেটা একরকম। কিন্তু তার ডিটেলসগুলো মুছে দিলেই একটা ফর্ম এলো। তাই না? এটাকেই পিওর ফর্ম বলতে পারেন।'

তিনি তো এদেশের বহু প্রিমিটিভ ওয়ার্কে অ্যাবস্ট্রাকের খোঁজ পেয়েছেন। বলেছেন– 'যাকে বলে শিবলিঙ্গ সেটা কী? ওটা অ্যাবস্ট্রাক্ট তো? কোনো রূপ নেই। ভেবে নিতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। ওটাকই যদি একটু আধটু রূপ দেওয়া যায় ব্যাস ফর্ম এসে গেল। ভিস্যুয়াল ফর্ম।' আরও বলেছেন– 'অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই ধরনের ছবি আঁকেন কেন? হ্যাঁ একটু ডিভিয়েশন এসে গিয়েছে বটে ভিস্যুয়াল ফর্মাল থেকে। সেটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে চাইছেন সবাই।'

প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়ে মোদ্দা কথাটি হল : সব দিকের দেখাটাকে এক সঙ্গে ধরে রাখাটাই কৃতিত্ব। এতে টোটাল এফেক্ট কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। তিনি অজন্তার ছবির কথায় বলেছেন– অজন্তাতে দেখবেন আয়নাতে চুল আঁচড়াচ্ছে মেয়ে। তিনটি ফিগার তার পা টা উল্টে দিয়েছে। তলার পা দেখা যাচ্ছে। তা এটাতো সেকালের জিনিস। আজকাল করলে বলা হতো খুব মডার্ন হয়েছে, কিউবিক হয়েছে। কিন্তু তাতো নয়। ওখানে সব দিকের ডাইমেনশান একসঙ্গে ধরতে হয়েছে। কিউবিজমেও এটা করা হয়। পিকাসোর ছবিতে দেখুন তিনটে চোখ। কোথাও নাকটা সোজা এনে পাশে চালিয়ে দিয়েছে। চোখ বা নাকের ট্রুথফুলনেসটা আছে কিন্তু। সব দিকের দেখাটাকে এক সঙ্গে ধরে রাখাটাই কৃতিত্ব। এতে টোটাল এফেক্ট কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়।'

রামকিঙ্করের শিল্প-বিষয়ক আলোচনাগুলি এতটাই হৃদয়গ্রাহী ও সত্যের কাছাকাছি যে মর্মকে ভেদ করে যায়, সত্তাকে আলোড়িত করে। নতুন শিল্পীর কাছে দিশা দেখানোর ব্যাপারে তিনি নমস্য। তথাপি রামকিঙ্করের দুর্ভাগ্য যে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার গুমসানি আবহাওয়ায় তিনি সিক্ত আজও। কিন্তু কি আর করা যায়? কী বিচিত্র এই দেশের মানুষ, রামকিঙ্কর ছেলেবেলা থেকেই শুধু তাঁর

চারপাশের প্রকৃতিকে দেখেছেন পরম নিষ্ঠা ভরে। না শুধু তাকাননি। মূলত দেখেছেন নিবিড় করে। তিনি তাই তো বলেছেন– 'শেখা মানে কী জান? দেখতে জানা রসিক হওয়া।' অত্যন্ত মূল্যবান কথা। তিনি শান্তিনিকেতনে এসে গুরু নন্দলালের কাছে দেখতে শিখলেন। রামকিঙ্করের বুড়োবেলা পর্যন্ত তাঁর চোখে ছিল অপার বিস্ময়বোধ। শৈশবের সেই রাধাকৃষ্ণের ক্যালেণ্ডার থেকে শুরু করে পুরানো দেওয়ালের ছাপছোপ, মেয়েদের মূর্তি, বাড়ি-ঘর ও গাছেদের রকমারি আলোছায়ার খেলা কর্মরত মানুষেরা, পাখিদের ওড়া, জন্তুদের চালচলন, জীবন যাপন। আবেগের নানান প্রকাশ তিনি দেখেছেন। মনের সমুদায় সত্তাকে সে সবে আরোপ করে। আর তাই তো তিনি সহজেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন প্রকৃতির আসল রূপটিকে। তুলে এনেছেন ক্যানভাসের পাতায়।

শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'কিঙ্করদা সদাবাস্তব বিষয়কে বারংবার দেখেছেন কিন্তু এই দেখার সঙ্গে তাঁর অন্তরের দেখার কৌতূহল ও মেজাজটুকু তাঁর অজান্তেই পটে পড়ে নিজের হয়ে উঠত, তা তখন প্রকৃতির দেখা রূপে রূপান্তর ঘটে যেত শিল্পীর মনের ভেতর দিয়ে এসে।' বর্ষার মেঘ তো আসে যায় ফি বছরই। আমরা দেখেও থাকি সেখানে হাতি চলেছে, ঘোড়া চলেছে, চলেছে গোরুর গাড়ি, পালকি, মানুষজন। দীর্ঘ জলাশয়, তেপান্তরের মাঠ কিংবা কাছ থেকে উধাও সুদূরে পায়ের রেখাখানি। তথাপি রামকিঙ্করের দেখায় তফাৎ অনেক। তিনি পেয়েগেলেন সুররিয়ালিস্টিক ভাবনার রূপ। তিনি দেখলেন– 'একটা মেঘ চলেছে আকাশে। তার একটা চেহারা আছে। কিন্তু তারই মধ্যে দেখো কত মূর্তি উঁকিঝুঁকি মারছে। কোথাও ঝুঁটিওয়ালা মেঘ কোথাও ঝাঁকড়া গাছ, কোথাও-বা একটা জানোয়ার তেড়ে আসছে। এইসব মিলিয়ে আবার এক বিরাট দৈত্যের মতো মেঘ।'

এই যে সব মিলিয়ে বিরাট দৈত্যের মতো মেঘ এইরকম এইরকম থিম আমরা পাই তাঁর সুরারিয়ালিস্টিক ভাবনার কাজ 'বাতিদানে' এ। যেখানে সব মিলিয়ে একটাই জেস্চার। তিনি বলেছেন– 'চেনা জিনিসগুলো কংক্রিট, কিন্তু সব জড়িয়ে যে জেস্চারটা সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট।' বলেছেন– 'কংক্রিট অ্যাবস্ট্রাককে একেবারে আলাদা করে ফেলা যায় না।'

আর তাই তিনি বাতিদানকে 'ফিগারেটিভ'ও বলেছেন। আরও বলেছেন কংক্রিটের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে কংক্রিটের লুকোচুরি চলে। রামকিঙ্করের ওই বর্ষার মেঘে নানান মূর্তি অবলোকন এবং তারই মধ্যে আবার সব মিলিয়ে বিরাট দৈত্যের মতো এক মেঘ এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ ভাবনার জগতের হদিশ বলা যায়। পুরানো দেয়াল কিংবা মেঘে ঐ নানান আকৃতির দেখা পাওয়া কোন নতুন কথা নয়, তথাপি সেখান তাঁর ধরে শিল্পের রসদ সংগ্রহের বিষয়টি

আমাদের সচেতন করে তোলে। এই প্রসঙ্গে মনের জানালার উড়ে চলে আসে শিক্ষাচার্য অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্পী প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের কিছু জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের কথা। রামকিঙ্কর এই বইটিকে সর্বোচ্চ সাধুবাদ জানিয়েছেন। বস্তুত প্রত্যেক শিল্পীর জন্য অবশ্যপাঠ্য অপরিহার্য একটি বই।

রামকিঙ্কর বলেছেন– "ওঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' ভীষণ জ্ঞানগর্ভ, ভীষণ জরুরি। ছবি আঁকাআঁকির জগতে এতো বড় সহায়ক বই আমাদের ভাষায় খুব বেশি নেই।" রামকিঙ্করের স্বয়ং যে এই বই থেকে বিশেষ অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। তো, অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'মেঘে যখন বাতাস লাগলো রস ভরলো তখন শাস্ত্র ছাড়া সৃষ্টি ছাড়া মূর্তি সব ফুটতে থাকলো, মেঘে মেঘে রঙ লাগালো, অদ্ভুত অদ্ভুত সাদা ধোঁয়া ধুমধাম করে সেজে এলো লাল নীল হলদে বিচিত্র সাজে, দশ অবতারের রঙ ও মূর্তিক ছাড়িয়ে দশ সহস্র অবতার। এই যে মেঘের গতি বিধির মতো সচল সজল অ্যানাটমি, একেই বলা যায় আর্টিস্টিক এ্যানাটমি।'

রামকিঙ্কর এই আর্টিস্টিক অ্যানাটমি সংগ্রহ করেছেন নেচারের নানান ক্ষেত্র থেকে। মেঘে যেমন মূর্তি পেয়েছেন তেমনি পেয়েছেন সূর্য ডোবার সময় রঙ এবং রঙ লাগাবার জোর। প্রকৃতির অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে পেয়েছেন সুন্দর সাবলীল তীক্ষ্ণ জোরালো ও ছন্দময় রেখা। চাঁদের জ্যোৎস্নায় বা বিদ্যুতের ঝলসানিতে উদ্ভাসিত প্রকৃতি তাঁকে মিথিক্যাল বিমূর্ত ভাবনার দিকে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন– 'যেখানে যত লাইন আছে সব আয়ত্ত করা উচিত। নেচার হচ্ছেন দেবশিল্পী। ঝকঝকে রুপোলী জ্যোৎস্নায় শিরিষ গাছের শাখা-প্রশাখায় ছায়া এবড়ো-খেবড়ো মাটির উচ্চাবচ রূপের সাথে যোগে নানান মূর্তির অবয়ব সৃষ্টিকে রামকিঙ্কর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন নিবিড় করে। একেবারে অন্তরঙ্গ অনুভবে তাকে বুঝেও নিয়েছেন কখনও। এইরকম জ্যোৎস্নারাতের আলোছায়ার খেলা হামাগুড়ি দিয়ে দেখায় মত্ত রামকিঙ্করকে রতনপল্লীর হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়ের মতো বিশ্বভারতীর পল্লীচর্চা কেন্দ্রের অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও দেখেছেন। দেখেছেন আভূমি প্রণত দুই হাতের নিবিড় স্পর্শে জ্যোৎস্নারাত্রির অপরূপ রচনাকে আত্মস্থ করার গভীর সাধনায় মগ্ন রূপতপস্বী রামকিঙ্কর।

প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের এই দেখা বা অবজারভেশন এবং তার গভীরতাই তাঁকে আঙ্গিকের নানান পরীক্ষার কথা ভাবিয়েছে। বলা যায়, অ্যাবস্ট্রাক্টেও পৌঁছে গেছেন ঐ পথ ধরেই। তিনি বলেছেন, দেখো যা দেখেছি তাকে দেখতে গিয়েই কিছু নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা এসব এসে গেছে কাজে। সে তো আসেই। তবে জবরদস্তি করে টেকনিক আমদানি করিনি কখনো। ওই যাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা হয় ওতে

আঙ্গিকের অনেক নতুন পরীক্ষা আছে। সবই কাজ লাগিয়েছি বলার কথাটা বলতে গিয়ে।' রামকিঙ্কর সম্ভবত টেকনিক ট্রিটমেন্ট এবং টেক্সচারের ভাবনাও পেয়েছেন প্রকৃতি থেকেই। যেমন তিনি বলেছেন– 'বর্ষার আকাশে কালো ভারী ভারী মেঘগুলোতে আমি নানা মূর্তি দেখি স্কাল্পচারের দারুণ একসাইটিং। কী জোর! অনেক চেষ্টা করেও ঐ জোর আমাদের কাজে আনতে পারি না। যেমন পরি না ঐ মাস্টার আর্টিস্টের রঙের খেলায় রঙ লাগাবার জোর। উঁহু পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। সূর্য ডোবার সময় দেখেছো তো রঙ লাগাবার কী সাংঘাতিক সাহস। আমরা ডরেই মরি। হাঃ হাঃ।'

রামকিঙ্করের কিন্তু আকাশের ক্যানভাসটিকে লঘু করে দেখেননি বরং বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাল ছবি আঁকতে গেলে ভালো ক্যানভাস তো চাই। ভাল ব্যাকগ্রাউণ্ড ছাড়া প্রতিষ্ঠিতও হওয়া যায় না জীবনে। রামকিঙ্করের বাড়ির ব্যাকগ্রাউণ্ড জিরো ছিল, একমাত্র বাবা-মার ইনট্যুইশান বা স্বজ্ঞার পুঁজি ছাড়া। তবে সে পুঁজির মহত্ব তো বিরাট, যার দৌলতেই মূলত আজ তিনি রামকিঙ্কর। তবে তাঁর জীবনে পূর্ব পূর্ব সুকৃতির ফলে পাওয়া ভারি ভারি ব্যাকগ্রাউণ্ড যে ছিল সে আর কে না জানে। যোগীপাড়ার মৃৎ শিল্পী অনন্ত পাল থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী আশু মহারাজ, সারদা মায়ের ভক্ত শিষ্য বিভূতি ঘোষ, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা অনিলবরণ রায়, সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বরেণ্য সম্পাদক ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসু। বিশিষ্ট শিল্পী ও জ্ঞানতপস্বী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নোবেলজয়ী ও বহুমুখী প্রতিভাধর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনীষী ও গুণীজনের সান্নিধ্যই তাঁকে যে আজ কালজয়ী চিত্রী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর করেছে তা অবিসংবাদিত সত্য। তাই ব্যাকগ্রাউণ্ডের কথাটা ভুললে চলে না যে, আর রামকিঙ্কর কদাপি ভুলবার পাত্রটিও নন। তিনি যখন খ্যাতির শিখরে তখনও তাঁর জীবনে এঁদের অবদানের কথা নতমস্তকে স্বীকার করেছেন। শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা লিখেছেন– 'গুরু নন্দলালের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি আর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁকে কোনো সময়েই গুরুর প্রতি কোনো বক্রোক্তি করতে শোনা যায়নি। এমনকি নিজে খ্যাতি অর্জন করার পরেও।'

রামকিঙ্কর বলেছেন– 'নন্দলাল বসু তো আমার শিক্ষকই ছিলেন। অতবড়ো একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, আমরা সৌভাগ্য শিল্পী হিসেবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। অবন স্কুল অব আর্ট, যা বলা হয়ে থাকে তার সবচেয়ে সার্থক ধারক। এতো বড়ো পেন্টার। এতো নিখুঁত স্ট্রোক। প্রায় সমস্ত ছবির বিষয় বা ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র কমন ল্যান্ডস্কেপ। একেবারে

গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেটার নিয়ে ওঠে ছবি। এই সাদামাটা সুরটাই আমাকে ভীষণভাবে টানে। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব সাধারণ, তা অনেকটা নন্দলাল বাবুর পরোক্ষ প্রভাব।

রামকিঙ্কর পলিটিক্যাল নেতা অনিলবরণ রায়ের উপদেশের কথাও ভোলেননি। বলেছেন– 'অনিলবরণ রায় তখন লিডার ওখানে, পাত্রসায়েরে বাড়ি। বাঁকুড়া মিশনারী কলেজের প্রফেসর। আমি ছিলাম তাঁর ন্যাশন্যাল স্কুলের ছাত্র। অনেক পোর্ট্রেট করি তাঁর উৎসাহে। লিডার বললেন এই তোমার লড়াইয়ের পথ। হাঃ হাঃ।' তিনি ভোলেননি– এই তোমার লড়াইয়ের পথ। হাঃ হাঃ. . .

তিনি ভোলেননি প্রাথমিক শিল্পগুরু অনন্ত পালের কথাও। বলেছেন অনন্ত পাল ছিলেন প্রতিবেশী। কাঠের ছুতোর কারিগর। দেব-দেবীর পট আঁকতেন। গড়তেন মাটির প্রতিমা। আমার প্রথম পাঠ অনন্তর কাছে। রামকিঙ্কর প্রতিবছরই অনন্ত পালের কাছে আসতেন। দুর্গাপ্রতিমার চক্ষুদান করা বাকি রাখতেন অনন্ত পাল রামকিঙ্করের জন্য। চক্ষুদান করার আগে চোখ বন্ধ করে স্বর্গীয় মায়ের চোখ ধ্যান করতে বলতেন তিনি। রামকিঙ্কর তখন থেকেই ধ্যান করা শিখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন মন আঁকে চোখ আঁকা করে না।

জীবনের সীমান্তে এসে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী থেকে সাহায্যের কথা আবেগভরে স্মরণ করেছেন। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে নত হয়েছে তাঁর মন। তিনি বলেছেন– 'ঢের পেয়েছি আমি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। ঢের সেই কষ্টের দিনে টানাটানির যুগে যা পেয়েছি, আজ বুঝি সে তো কম নয়। একথা হাজার বার বলবো। এখানে এসেছি বলেই তো হলো। শান্তিনিকেতনে না এলে কী হতো আমার দশা।' সত্যি কথাই তো কী হতো তাঁর? অকালে ঝরে পড়া বহু প্রতিভার মত ঝরেই যেতেন নিশ্চিত। তো বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্র জীবন থেকে কর্মজীবনের বেশ কিছুটা সময় পর্যন্ত সহায় থেকেছেন, ডানা দিয়ে আগলে রেখেছেন, উপদেশ– নির্দেশ দিয়েছেন এবং সর্বোপরি তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য আর ক'জনার মেলে। রামকিঙ্কর, তাঁর রতনপল্লীর প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয়কে বলেছেন– 'জানেন আমার গুরু কে? গুরু আমার রবীন্দ্রনাথ, কৌপিনবিহীন গুরু। আমার যা কিছু সবই ঐ গুরুর কাছেই পেয়েছি। কিন্তু ঐ কৌপিনবিহীন গুরুর কাছে যিনি নিয়ে এলেন সেই মহামনীষী সম্পর্কে কিছু বলার যে ভাষাই ছিল না রামকিঙ্করের।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনে এসেছিলেন দেবদূতের মতো। অতবড় মানুষ তাঁর কুটিরে এসেছেন সে যে স্বপ্ন। তাই তাঁর বিষয়ে রামকিঙ্করের বক্তব্য খুবই ছোট কিন্তু আয়তনে বিশাল। বলেছেন– 'আমার একজন সহপাঠী বললেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

এসেছেন– চলো দেখা করে আসি।' দেখা হল এবং কাজ কিছু দেখলেন। পরের দিন দেখি আমার কুঁড়ে ঘরে স্বয়ং এসে আমাকে ডাকছেন, কি করছো দেখি? আমি তখনকার কাজ দেখালাম পরে বললেন আমি আজ চলে যাচ্ছি, তোমাকে চিঠি লিখব তুমি চলে এসো।'

তার এই একটি বিশেষ গুণ ছিল– খুঁজে খুঁজে মানুষকে টেনে বের করা। তো এই হল রামকিঙ্করের অসীম সৌভাগ্যবশত পূর্ব সুকৃতির বিনিময়ে আকাশের মতই বিশাল ব্যাকগ্রাউণ্ড বা ক্যানভাস। যার উপর দাঁড়িয়েই তাঁর এই বিশাল পাপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা। শিল্পী সম্রাট রামকিঙ্কর তাই ক্যানভাসের মূল্য যে ভালই বুঝবেন তা বলাই বাহুল্য। আর তাই বর্ষার মেঘে নানান মূর্তি, সূর্য ডোবার সময় আকাশে ও মেঘের গায়ে সংঘাতিক রঙ লাগবার যে সাহস দেখছেন ঐ মাস্টার পেন্টারের, সেখানে আকাশের ক্যানভাসের গুরুত্বও ভেবেছেন। বলেছেন– 'অবশ্য ঐ ক্যানভাসটাও আছে। আকাশের ঐ ক্যানভাস কি সোজা গো।'

সত্যি! রামকিঙ্করের মত ক্যানভাস পাওয়াটাই বুঝি সোজা কথা নয়। বস্তুত ঐ ক্যানভাসের দৌলতেই রামকিঙ্করের শরীরে এত ছন্দময় ও তীব্র তীক্ষ্ণ রেখার কারিকুরি। বিরাট গতির সাথে অফুরন্ত টেকনিকের বৈচিত্র নানান অবয়বে সবল পায়ে হেঁটে যাওয়া উদ্দামতা উচ্ছলতা আদিমতা অট্টহাস্য ও বিভিন্ন তলের বিন্যাস ও অভিনব অমসৃণ টেক্সচার গায়ে মেখে ধ্যানীর শরীর, শুদ্ধ বুদ্ধ রামকিঙ্কর। বাস্তব ও বিমূর্তের মাঝামাঝি কখনো। কখনো আবার তিনিই জটিল প্রচ্ছন্ন ও আত্মস্থ কঠিন কঠোর নিরাকার কৈবল্যের ঠিকানায়।

কলাদেবী সরস্বতী ভর করেছিলেন রামকিঙ্করের মাথায়। কেন না তিনি যে ছিলেন তাঁরই সাধনায় তাঁরই পদবন্দনায় একনিষ্ঠ সাধক। শিল্পে সিদ্ধিলাভের বর বর্ষিত হয়েছিল তাঁর মাথায়। শিল্পে সিদ্ধিলাভ নাকি তাঁরই হয় যিনি উজির কিম্বা ফকির। রামকিঙ্কর উজির বা বিত্তবান ছিলেন না পরিবর্তে দরিদ্র নিঃস্ব এক ভবঘুরে বাউল মনের মানুষ। সন্তের মতই ছিল তাঁর ভবঘুরেপনা। তাই তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে বহুবিধ উপঢৌকন সমেত মূর্তিমান শিল্প। তিনি ছিলেন আপন ভোলা, একলাই মনের আনন্দে থাকতেন। ছবি, মূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল তাঁর সাথী। প্রতিবেশী হৃষিকেশ চন্দ মহাশয় একবার তাঁকে রতনপল্লীর বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে দু-দিন তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। শিল্পরূপী ভগবানের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন রামকিঙ্কর। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ফল্গুস্রোতের মত বয়ে যাওয়া এক তীব্র অনুরাগ ছিল অন্তরে। তাই প্রত্যেক জন্মাষ্টমীতেই তিনি একটি কৃষ্ণের ছবি আঁকতেন। বর্ষায় প্রচণ্ড বৃষ্টিঝরা দুর্যোগের দিনে তিনি তাঁর মানসচক্ষে কৃষ্ণজন্মের সময়ের ঘটে

যাওয়া ঘটনাগুলি চাক্ষুষ করতেন। একটি 'গীতা' বই তাঁর সবসময়ের সঙ্গী ছিল। বাঁকুড়ায় থাকাকালীন বইটি কিনেছিলেন। সম্ভবতঃ বিপ্লবীদের হাতে 'গীতা' বই তাঁকে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। সময় সুযোগ মত তিনি বইটিতে চোখ বোলাতেন এবং কৃষ্ণের বাণী সমূহকে আত্মীকরণ করা ও চলার পথে তা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। অনুমান হয় রামকিঙ্কর নানান তাচ্ছিল্য, অপমান ও লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করার শক্তি তিনি এই বই থেকেই পেয়েছেন আর পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান থেকে। তাই মান-সম্মানের দিকেও ভ্রূক্ষেপ করেননি। ফলের আশা রাখেননি, নিজের ন্যূনতম ভোগবিলাসে নজরই দেননি। আর্টওয়ার্কের ক্ষতির আশংকায় বিয়েই করেলন না। পরবর্তী সময়ে বহু টাকা উপার্জন করেও নিজস্ব একটা বাড়ি ছিল না তাঁর। তাঁর সব সময়ের সঙ্গীরা তাঁর আয়ের টাকা লুট করেছে। 'কী ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি'– এই মানসিকতায় দামী ওয়েল পেন্টিংগুলো ফুটো চাল বেয়ে বৃষ্টিধারা আটকাতে মশারির উপর বিছিয়ে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নিচে একজন অত্যন্ত দিলখোলা দরাজ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন জাত শিল্পী, শিল্পী-সর্বস্ব মানুষ। তাঁর মতো শিল্পী হতে গেলে দুর্ধর্ষ প্রতিভার সাথে সম্পূর্ণ সততা, কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন ও নিষ্ঠার দ্বারা শিল্পরূপ প্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। উদাসী বাউলের মত ছিল তাঁর জীবন-যাপন। শিল্পের জন্য বলা যায় সর্বস্বত্যাগী কঠোর আরাধনায়রত সন্ন্যাসী। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'তাঁর জীবনে এক বৈরাগী বসবাস করত। এক আসক্তি শূন্য বৈরাগ্য তাঁকে সর্বক্ষণ ঘিরে থেকেছে। জাগতিক অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল না তাঁর, এমন বৈরাগ্য না থাকলে অমন সৃষ্টিও সম্ভব নয়।' আরো বলেছেন– 'আমরা যতটুকু দেখেছি তাঁর সঞ্চয় বলে কিছু ছিল না– তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল না, তাঁর পর্যাপ্ত পোশাক দেখিনি। সঠিক অর্থের ভাণ্ডার ছিল না। কোনোদিন দেখিনি তাঁর ঘর, তাঁর আত্মীয়-স্বজন দিয়ে ভরা। তাঁকে প্রায় দেখিনিই বাক্স ইত্যাদি গুছিয়ে কোথাও ঘুরে আসার জন্য চলেছেন। তাঁর জীবনে অবকাশ-যাপনের কোনো দিক ছিল না। তাঁর কাছে গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি এসব গুরুত্ব পায়নি। কেবল কাজ আর কাজ। কাজই তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল। তিনি চিরদিন চলমান। তাঁর থেমে থাকা দেখিনি। আমরা কি আর কোনো শিল্পীকে দেখিয়ে দিতে পারব, এমন সব অনবদ্য বিশাল ভাস্কর্য সব আশ্রমেরই।'

প্রকৃতপক্ষে রামকিঙ্করের শিক্ষক, সতীর্থ বন্ধু, সহকারী-সহকর্মী, ছাত্র, ভাবশিষ্য ও আশপাশের পরিচিত মানুষজনের লেখনী থেকে রামকিঙ্করের যে ছবি উঠে আসে, তা কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ছোট মনের মানুষের কাছে নেহাতই উপেক্ষার বিষয়। নইলে তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনার পাতায় সুকৌশলে ঘৃণা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও

বিদ্বেষের বিষ পাঠকের মনে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা হয় কি করে? শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তাই আবার ফিরে আসতে হয়। তিনি বলেছেন– 'কিঙ্করদার প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্টির জগত নিয়ে আগামীকাল, তার পরেও ভালো না ভালোর ছন্দের প্রবাহ চলবেই। কিন্তু মানুষটির সম্পর্কে যে ভাবে আমাদের ভাবনা কাজ করছে তা কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও হেয় করেই চলেছি।' তিনি আরো বলেছেন– 'তাঁকে নিয়ে একটি আশ্চর্য চরিত্র দাঁড় করানো হচ্ছে যা তিনি আদৌ ছিলেন না। আসলে রামকিঙ্করকে বুঝতে হলে যে বড় মানুষের কাঠামো দরকার তা তো থাকা চাই। যেমন তুলসী গাছ চিনতে মানুষ হতে হয়। তাঁর পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা রুখতে তাই উঁচু মঞ্চের উপর তাঁকে রোপণ করে মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনতে হলে যেমন বিবেকানন্দের মনন, অধ্যবসায় ও অর্পণ থাকা চাই, তেমনি তাঁর জীবন বোধের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে না পারলে আমরা কোনোদিন এমন দৃপ্তময় রসময় কিঙ্করদাকে বুঝতে পারব না। মনন চাই অধ্যাবসায় চাই নিজেকে অর্পণ চাই তবেই এমন মাপের শিল্পীকে খানিক বোঝা যায়।' বলেছেন– শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেছেন যাঁরা সেইসব মননশীল শিল্পের প্রতি ভালবাসায় নিবিড় অধ্যাবসায়ী কিছু মানুষের লেখনী থেকে যেসব কথায় রামকিঙ্করের পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে তাতে আমাদের মনকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যায়। আমাদের দোষদৃষ্টি ছোট মানসিকতা ও সর্বোপরি হীনম্মন্যতার মত মারাত্মক বিষবাষ্পকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যায়। তাই আমাদের তা বারবার পড়তে হয়। যেমন কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরা ছিলেন তিনি কিন্তু বাকসংযমেরও গভীর বোধ ছিল তাঁর। যদিও তিনি প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তবুও সংযত রুচিবোধের বাইরে চলে যাননি কখনোই। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ যেমন ছিল তীব্র, তার প্রতি বিদ্রোহও ছিল ঠিক সেইরকমই। তাঁর দার্শনিক সহিষ্ণুতাই এই বিদ্রোহকে করে তুলেছিল সংযত। তিনি ভবঘুরে ছিলেন কিন্তু সন্তের মত ছিল তাঁর সেই ভবঘুরেপনা। তিনি ছিলেন খুব বেশি রকম ভাবে অনুভূতি আর আবেগপ্রবণ, কিন্তু সেই অনুভূতি আর আবেগকে শাসন করেছিলেন তিনি। এইভাবে তাঁর কাজ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা আর জটিলতা ক্রমাগত পরস্পর বিরোধীতায় ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে থাকে। কারণ তিনি খুব বেশি রকম ভাবে মানুষই ছিলেন কিন্তু চিরাচরিত পার্থিব মানুষের একটু উপরেই চলে গিয়েছিলেন তিনি। পার্থিব মানুষের থেকে একটু উঁচুতে চলে যাওয়া মানুষেরাই সাধারণত নিপীড়িত হন, একটু বেশিই আত্মম্ভরী কেতা দুরস্ত পাটোয়ারী বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কাছে, কারণ তাঁরা জানে উঁচু চেতনার মানুষের থেকে তেমন কোনো প্রবল প্রত্যাঘাত আসে না সাধারণত। তো রামকিঙ্করের ভাষায়

'গোমড়ামুখোবাবুরা' যে এখনো আছেন আর তাই মাঝে মধ্যেই তাঁকে মাতাল অন্ত্যজ প্রভৃতি বিশেষণে অবজ্ঞা কিংবা 'রামের কিঙ্কর আমি রাম নিয়ে আয়'– শিরোনামে টিকা লিখে মানুষের কাছে হেয় করে আনন্দ পান কেউ কেউ, যদিও তিনি মদ খেয়েছেন কিন্তু মাতলামি করেননি একদিনও, এবং নবশাখ বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলা হলেও বিতর্কে সবিতৃব্রাহ্মণ বলে গ্রাহ্য শ্রেণীর মানুষ ছিলেন তিনি। শিল্পী সোমনাথ হোড় লিখেছেন– 'কিঙ্করদা পানাসক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রায় ১৫/২০ বছর ঘন পরিচিতি কালেও তাঁকে কোনোদিন বেসামাল হতে দেখিনি। এমন ভদ্র শান্ত সমাহিত চরিত্র দুর্লভ।'

আরও বলেছেন– 'এই প্রতিভা ১৯২৫ সালে কলাভবনে প্রোথিত না হলে দেশ দরিদ্র হত। রামানন্দ-নন্দলালের আদরের দান তোমার সৃষ্টি ধারায় আমরা স্নাত হলাম। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কোনারকের পরে সাতশো বছর ধরে আমরা ধারা স্নান করিনি। আমাদের দৈন্য আমার রুক্ষতা ঝরিয়ে আকণ্ঠ পিপাসা তুমি মেটালে।'

রামকিঙ্করের প্রথম দিককার কাজে কাশীনাথ ছিলেন তাঁর কাজের জোগাড়ে বা সহকারী। পরে বাগাল রায় বরাবরের জন্য তাঁর সহকারী হিসেবে থেকে গেছেন। বাগাল রায়ের কোনো সন্তানাদি ছিল না। ফলে তাঁর সাংসারিক বাঁধন কিছুটা ঢিলেই ছিল। এক সরলতা যেমন আরেক সরলতাতেই তার মনের স্বস্তি খুঁজে পায় বাগাল রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। প্রায় পনের আনা পাটোয়ারী বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের পৃথিবীতে নিজের সরল মনের মত মানুষ পেয়ে পরম নিশ্চিন্তের আশ্রয় করেছিলেন রামকিঙ্করকে। খুব কাছ থেকে দেখে দেখে তাঁর সাদামাটা চোখে রামকিঙ্করের নির্ভেজাল অন্তর কাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি অভিভূত ছিলেন তাই এহেন সহজ সিধেসাধা মানুষ রামকিঙ্করের প্রতি তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছনায় তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল ক্রমশঃ। জীবনের উপান্তে এসে তিনি তাঁর সেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। যখন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি তৈরির ব্যাপারে খুব ঝামেলা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামকিঙ্করের মতই প্রতিষ্ঠা পায়– তখন বাগাল রায় মনে মনে বেশ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন– '. . .আবার বললে অনেকে না আমাদের এখানে এসব চলবে না। শেষ বেলাতে এবার দেখুন যে কথাবার্তা আলোচনা করেছিল পিতা পুরুষরা সেটা তো থাকল না। বেশিরভাগই যারা কথাটাকে রটাই ছিল তারাই আবার সেই লাইনে দাঁড়াল। তারাই করছে। আমি একদিন গেইছি 'হ্যাভেলা হল'-এ তখন দেখছি টুকটুক আঁকছে। বলি হ্যাঁ এবার ছেলে দাঁড়াইছো, সেই দিনে যে বলেছিল মুখ নেড়ে আজকে দেখি টুকটুক পঁদটা নাড়াইয়ে আঁকছো।'

রামকিঙ্করের উপর বয়ে যাওয়া হরেক প্রকার অপমান, লাঞ্ছনা ও অসহযোগিতার

দুঃখ ও ঝড়ঝাপটার সাক্ষী বাগাল রায়ের মানসিকতায় তাঁর প্রতি কতটা শ্রদ্ধা জেগেছিল জানা না গেলেও, তিনি তাঁর ভালবাসায় অত্যন্ত অনুগত হয়ে পড়েছিলেন তা বোঝা যায়। তাই রামকিঙ্করের যখনই চেয়েছেন তখনই কাজের ক্ষেত্রে হাজির হয়েছেন বাগাল রায়। তো তাঁর সাদামাটা চোখে রামকিঙ্করকে আমরা আরেকবার দেখেনিই। তিনি বলেছেন– 'ভালোই। সবদিক থেকেই ভালো। উনি যে কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গেইছেন তাও তো করেন নাই। কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। ঝগড়া করতেন না কারো সঙ্গেই। কারো মুখ পানে চেয়ে কথাটা বলতেন না কোনোদিন। মনমেজাজ সব সময় একরকম। বিনোদবাবুও যা কিঙ্করবাবুও তা।'

যাই হোক এবার আসা যাক মডেল থেকে ক্রমান্বয়ে সেবাদাসী ও পাটরানী হয়ে ওঠা রাধারাণীর কথায়। তিনি ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবারের শিল্পবোধহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, সাধারণ ঝিয়ের কাজ করতে আসা গড়াই পদবীধারী সংস্কারাচ্ছন্ন অতি সাধারণ এক মহিলা। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে রামকিঙ্করের জীবনে এসে কাটিয়ে দিলেন তাঁর অন্তিম দিন পর্যন্ত। নিরক্ষর এই মহিলাটি তাঁর চোখে যা দেখেছেন তাঁর সোজাসাপ্টা দৃষ্টিভঙ্গিতে, তা একেবারে ফেলনা নয়। বলেছেন– 'না দুঃখ দেওয়া দেখি নাই। দুঃখ পেত এটাই দেখেছি। কেউ ভালো দেখতে পারত না।'

মানুষ হিসেবে কেমন? এই প্রশ্নোত্তরে বলেছেন– 'মানুষটা ভালোই ছিলেন। মানুষ হিসেবে খারাপ ছিলেন না। আমি পেথম পেথম বুঝতে পারি নাই। আগে রাগী ছিলেন। পেথম পেথম ভয় পেতাম। একদিন দু'দিন বকতেন। বকলে পরে মনে করতাম বাস! ভারী তেজীয়ান তো তুমি। তারপর আবার খুব ভালো হয়ে গেলেন। শান্ত সুস্থ যেমন স্বাভাবিক মানুষ ঘরে থাকে কথাবার্তা কয়, খাবার-দাবার খায়। পেথম পেথম খারাপ লেগেছিল। তারপরে আবার ভালোই, পরের পর বুঝে এলাম। সঙ্গে থাকলেই একটা মানুষ বুঝা যায়। ব্যবহার ভালো দেখতাম। মন্দ ব্যবহার তো আমার সঙ্গে করেন নাই। খারাপ কিছুই দেখি নাই।'

দিল্লীতে রামকিঙ্করের পাঠানো যক্ষযক্ষী খসড়া মূর্তি দুটি চূড়ান্ত আলোচনায় মনোনীত হলে ১৯৫৪ সালে রামকিঙ্করকে আজুরা দেওয়া হয়। কিন্তু যক্ষী বা লক্ষ্মীর প্রতীক রমণী জাতির ইনার স্পিরিটকে ধরবার প্রয়োজনে যে ন্যুড স্টাডি ছিল জরুরী, কিন্তু তৎকালীন কলাভবনের শিল্পশিক্ষা-পরিবেশে যা ছিল প্রায় অসম্ভবও– সেজন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি রাধারাণীর সাক্ষাৎ পেয়ে যান দৈবনির্দেশেই । রামকিঙ্কর বলেছেন– 'রাধারাণী তার সমস্ত সংস্কারবদ্ধ জাগতিক লজ্জা ত্যাগ করে তার শারীরিক গঠনকে আমার

চোখের সামনে তুলে ধরে আমার মনে সঞ্চিত সংকটকে কাটাতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রাধারাণীর স্থূল দেহটা স্টাডি করে যক্ষী বা লক্ষ্মীকে প্রতীক রমণী জাতির সূক্ষ্ম ইনার স্পিরিট ধরতে চেয়েছি। ঈশ্বরের অসীম করুণায় রাধারণীর সঙ্গে ঠিক সময়ে যোগাযোগ হয়েছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন– 'পৃথিবীর নানা স্থানে সাধকদের জীবনের সঙ্গে এমন অনেক অভিজ্ঞতা যুক্ত আছে যেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলেই, যে সেইসব ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন তা নয়। Mystic Experience আখ্যা দিয়ে এদের স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। শিল্পীর জীবনেও এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা প্রায় Mystic, এরই পর্যায়ভুক্ত। দার্শনিক জেমসও সংকটময় মুহূর্তে এক অজ্ঞাত শক্তির স্পর্শ অনুভবের কথা বলেছেন এইরকম : 'জীবনের সংকটময় মুহূর্তে মাঝে মাঝে আমি আমার অন্তরতম লোকে এক অজ্ঞাত শক্তির স্পর্শ অনুভব করি।'

দার্শনিক জেমসের মত রামকিঙ্করও ছাত্র রবি পালের কোনো অজ্ঞাত শক্তির স্পর্শ পেতেন কিনা প্রশ্নোত্তরে বলেছেন– 'হ্যাঁ করতাম।'

এই Mystic Experience সাধারণত সাধনার যে কোনো ক্ষেত্রের সাধকদের জীবনেই ঘটতে দেখা যায়। যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া বলা বাহুল্য বর্তমান সময়ের থেকে বহুদূরেই স্থিত। হয়ত-বা পূর্ব পূর্ব জন্মের ব্যাখ্যাতেই গলা মেলাবে বিজ্ঞান। রামকিঙ্কর তাঁর বোধের ভাষাতেই ঈশ্বরের করুণার কথা বললেও তিনি কিন্তু বাস্তবিকতাকে ভোলেননি। যে মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে তিনি সেই করুণা পেয়েছেন সেই ত্যাগের যথার্থ মূল্য দিয়েছেন। যক্ষযক্ষী নির্মাণে রামকিঙ্করকে শেষ অবধি যে পাঁচ লাখ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছিল নির্মাণের যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার কিছুই তিনি নিজের জন্য রাখেননি। ভাইপো দিবাকরকে দালান করতে যৎসামান্য দিয়ে বাকী সবই রাধারাণীকে পুরস্কৃত করেছেন। তাঁকে বলেছেন– 'আমাদের ঘর থেকে কখনও যাবে না। তোমারি টাকা অনেকগুলি পেলাম। তোমার যত দরকার হয় নাও।' রামকিঙ্করের বলা এই কৃতজ্ঞতার ভাষা রাধারাণীর মুখনিঃসৃত। রাধারাণী আরও বলেছেন– 'বাড়িটাড়ি করেছিলাম, ও ত সব টাকা দিইছিল। বহু টাকা দিইছিল। আমাকে যে কত টাকা দিয়েছিলেন হিসেবে কিছু নাই।'

নতুন কিছু করার জন্যই যাঁরা জন্মান তাঁরা কোনো বাঁধাগতে চলতে রাজি থাকেন না। রামকিঙ্কর ন্যুড স্টাডি প্রয়োজনে অনুশীলন করেছেন নিজের বাড়িতে। কারণ শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দিকে সে সময় এই ধরনের অনুশীলন ছিল কল্পনার বাইরে। কিন্তু রামকিঙ্কর যেমন শিল্পের তাগিদে ট্রাডিশন মেনে প্রথা ভেঙেছেন,

নতুন কথা বলতে নতুন টেকনিকে, আঙ্গিকে, ট্রিটমেন্টে তেমনি ন্যুডস্টাডির ব্যাপারে কোনো বাধা মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁর সামনে ছিল জ্বলন্ত সত্যের মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির গাত্রের রিলিফে ন্যুডস্টাডির ছড়াছড়ি। তিনি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানতেন মধ্যযুগের শিল্পীরা কোনো মূল্যবোধের দ্বারা বন্দী ছিলেন না। ন্যুড মানেই তো লালসার গন্ধ ছড়ানো নয়। বরং স্বর্গীয় আবেদনে ঋদ্ধ ন্যুড মূর্তিগুলি ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। শ্রবণবেলগোলার মহাবীরের নগ্নমূর্তি আত্মবিশ্বাসের প্রেরণা স্বরূপ। সজীবতা, পবিত্রতা ও আস্থার ভাবনার ভরপুর এক মহিমাময় রূপ। যেখানে নগ্নতার প্রশ্ন দূর অস্তই রয়ে যায়।

রামকিঙ্করের এমনই এক বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন যেখানে ন্যুড আছে কিন্তু নগ্নতার কথা বলছে না। তিনি বলেছেন– 'কোণারক গেছি। ওখানে নিউড-ফিউড সব আছে তো। একটা মেলা ছিল। অনেক লোক-টোক ওখানে এসেছে। মা, ছেলেপুলে সব নিয়ে সেসব মূর্তি দেখছে।...বলছে, সব ভগবানের তৈরি। ভগবানের তৈরি তখন তারা নিউডগুলো নিউড দেখছো কিন্তু।' এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল, শিল্পী কোনোদিন দর্শকের মুখ চেয়ে ছবি করেন না। ভগবান কি কাপড় দিয়ে তৈরি করেছে মানুষ। শরীরে রূপ ঈশ্বরের অপূর্ব কারুকাজ। একে খোলা মনে দেখায় অস্বস্তি কোথায় তাতো বুঝি না, ওসব দুর্বল মনের ব্যাপার। সংকোচের বাড়াবাড়িটা শিল্পীর নয়। তেমনি আবার শরীর নিয়ে খেলো হ্যাংলামিটাও নয়। আঙ্গিকের বিকৃতি নেই এমন নিটোল ত্রুটিহীন নিউডকেই তিনি সঠিক মেনেছেন।

শিল্পীদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রামকিঙ্কর প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পীদের কাজের উদাহরণ দেখিয়েছেন। অতিরিক্ত লেনিন স্ট্যালিনের মূর্তি করার ধাক্কায় রাশিয়ার বহু শিল্পীর এদেশে চলে আসার কথাও তাঁর আছে। অজন্তার চিত্রাবলী তো বৌদ্ধ কাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। শিল্পীর একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। আদর্শ থাকে। তাই তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অন্যায়, অনুচিত।

রামকিঙ্কর বলেছেন– 'সবকিছুর মধ্যে সেক্স আছে। সেক্স ছাড়া সবকিছুই অসাড় প্রাণহীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহান শিল্পীরা মনে রাখার মতো বিখ্যাত কাজ করে গেছেন যেহেতু তাঁরা কোনরকম যৌন বিধিনিষেধ এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তো, মৌলিক বিষয়টি হল জৈনমূর্তি কি প্রাচীন গ্রীক মূর্তি অথবা গ্রেকো-রোমান আর্টিস্টের কাজ কিংবা রোঁদা, আঁদ্রে, হেনরি মুর, মাতিস, পিকাসো প্রভৃতি নমস্য শিল্পীদের অসাধারণ সুঠাম পুরুষ বা নারী মূর্তিতে যে নান্দনিক আবেদন যা হৃদয় মনকে নাড়িয়ে দেয়, তন্মতচিত্ত

করে, সেটাই তো বড় কথা। যদিও বড় বড় কোনো আর্টিস্টের ক্ষেত্রেও যখন দেখা যায় সেই উঁচু সুরটা নেমে গেছে, খেলো হ্যাংলামিটাই প্রকট হয়েছে তা কিন্তু মোটেই প্রত্যাশিত নয়। যেমন নয় নগ্ন মূর্তিতে একটু পাতার আবরণও। রামকিঙ্করের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন সময়ে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– 'রোঁদার বৃদ্ধার ন্যুড-এ বার্ধক্যের মহিমাই রূপ পেয়েছে যেন। যৌবনের রূপ যেমন রূপ, বার্ধক্যের রূপও তেমনি। দুইই সমান সুন্দর রোঁদার চোখে। আমরা যারা সে মূর্তি দেখি অনায়াসে তাকে ভেনাস-এর পাশে বসিয়ে দেখতে পারি। রামকিঙ্কর ও রোঁদার মানসিকতার একটা সাম্য দেখতে পাই আমরা এবং পিকাসের সাথেও।

ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদেশী শিল্পীদের মানসিকতায় একাত্মতা অনুভব করেছেন সে কথা রামকিঙ্করের জবানি থেকেই জানা যায়। বলেছেন– 'নিজের মনের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছি।' আর তাই রামকিঙ্কর ন্যুডস্টাডি বিষয়ে কোনো দ্বিধা সংকোচের বেড়াজালে আটকে যাননি বরং তাঁর রোমান্টিকতার বদলে প্রাকৃতিক বাস্তবতামূলক শিল্পের প্রতি দৃঢ় আস্থার মত ন্যুডকেও তিনি স্টাডির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত মনে করেছিলেন। মানব শরীরের সূক্ষ্ম ইনার স্পিরিটকে ধরবার প্রয়োজনে। তাঁর বিশেষ অভিমত এও ছিল যে জানায় তো দোষ নেই, যদিও শিল্পের ক্ষেত্রে নান্দনিকতার গুরুত্বই বেশি হলেও তিনি বলেছেন– 'তবে কী জানো? ওটা আর কিছু নয় জানা। জানায় তো দোষ নেই, ক্ষতিও নেই। ভুল জানায় ক্ষতি। স্টাডি করা, অ্যানাটমি দেখা ভালই তো। তবে আমি তো আর কংকাল আঁকবো না। মানুষ আঁকবো।' তো বোঝা যায় রামকিঙ্করের ন্যুড হল মনের দুর্বলতায় ভয় বা লজ্জার কারণে একটু পাতার আবরণও নয় বা বিকৃত মনের প্রকাশ। তিনি বলেছেন– 'আমাদের জৈন মূর্তি দেখুন অকুণ্ঠ অনাবর মূর্তি অনেক গ্রীক মূর্তিতে দেখা যায়। ন্যুড-এর মধ্যে আঙ্গিক বিকৃতি থাকলে কি আর সুন্দর লাগবে? নিটোল ত্রুটিহীন অঙ্গ সৌন্দর্য চোখে ভালো লাগে। গ্রীক মূর্তি যেমন।'

রামকিঙ্করের এই খোলা মানসিকতা তৎকালীন ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে রীতিমত আশ্চর্যের সন্দেহ নেই। বিদেশের শিল্পীদের মানসিকতায় তাঁর মিল থাকাও যেমন আশ্চর্যের। রঁদা ও পিকাসোর মনের সাথেই নয়, সেজানের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচ্ছন্ন মিল লক্ষ করা যায়। যদিও তাঁর মতে প্রিয় বলতে বস্তুত তাঁর কেউই ছিলেন না। বলেছেন– 'যেহেতু কখনো বিদেশ যাইনি, ডাইরেক্ট কোনো কাজ দেখিনি বই পড়েছি জেনেছি ওদের সম্পর্কে। প্রভাবিত হয়েছি কি না সে চুলচেরা বিচার করবেন আছেন সেরকম কিছু সমালোচক। অনেক পড়েছেন তাঁরা। অনেক জানেন। মিল খুঁজে বের করতে ওস্তাদ তারা। সে অর্থে প্রিয় বলতে আমার কেউ নেই। পিকাসো

তো আমাদেরই সমসাময়িক।. . . ভ্যান গগ, গঁগা, গোইয়া, রেমব্রান্ট আমার ভালো লাগে। এঁদের অনেকেই নমস্য।. . . তবে সে অর্থ বলা যেতে পারে পিকাসো আমার ফেবারিট। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ভাস্কর বলতে ম্যুর বা রঁদা আছেন। রঁদাই আমার প্রিয়। ওঁর কাজের সঙ্গে আমায় মিল আছে প্রচ্ছন্ন।' অন্য আরেক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'পাশ্চাত্য ছবি অনেক দেখেছি। সেজানকেও ভালো লাগে। পিকাসো আমার চিরদিনই ভালো লাগে।' আরও বলেছেন– 'বিদেশের শিল্পীদের মধ্যে দা ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রঁদা খুব ভালো লাগে। মাতিস, সাগাল আরও অনেকের কাজই ভালো লাগে।'

পাশ্চাত্যের মানসিকতায় রামকিঙ্করের মিল এই আলোচনায় পাঠক হয়ত বা পুনরুক্তির বিড়ম্বনা বোধ করবেন তথাপি তাঁর বিশেষ ভালো লাগার দিকটির উন্মোচন এই ফিরে দেখার পর্যায়টি নেহাত তুচ্ছ নয়।

কিন্তু তাঁর এই ভালো লাগা বা বিশেষ ভালো লাগার পাশ্চাত্য প্রভাবের বিবরণটি কোনো কোনো সমালোচক গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করেন, তা কিন্তু কাম্য নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, সঙ্গীত, সাহিত্যের মতই আর্টেও তো লেনদেন থাকবেই। পশ্চিম কি অজন্তা ইলোরা বা কোনারক প্রভাব মুক্ত? বস্তুত এভাবেই মডার্নে যাওয়া। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– 'পরম্পরার নাগপাশ যখন সমস্ত ইউরোপীয় শিল্পকে আড়ষ্ট করে তুলেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া রূপে বিমূর্ত বাদের উদ্ভব এবং বিমূর্ত শিল্পের উপযুক্ত আদর্শকে অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রাচ্য শিল্পের দিকে শিল্পীরা ঝুঁকছে।'

আরো বলেছেন– 'নিগ্রো আর্ট এবং আদিম শিল্পের প্রভাব দেখা দিল সুসভ্য ফরাসী শিল্পীদের জীবনে। এবং নির্মিত হল Cubism এর আদর্শ। এই Cubism থেকেই শুরু হল বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস।' তো রামকিঙ্কর কি শুধুই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সড? তাঁর শিল্পে আছে চীন জাপানের ছাপ। হরপ্পা মহেঞ্জোদরো, গুপ্তযুগ পালযুগের শিল্প, বিষ্ণুপুরের মন্দির প্রভৃতি দেশের নানা জায়গা থেকে শিল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন। ঔরঙ্গবাদের ড্যান্সিং ফিগার হুবহু নকল করে তাকে আরও ছাড়িয়ে গেছেন। 'কলের বাঁশিতে' যে গতির দ্যোতনা ব্যক্ত দেহ-বিন্যাসের সমান্তরালের সঙ্গে কৌণিক কর্ণরেখার দ্বারা তা পেয়েছেন ধ্রুপদী উত্তর ভারতীয় শিল্প থেকে এমন কথাই জানা যায় প্রণবরঞ্জন রায়ের বক্তব্য থেকে। তিনি দেশ বিদেশের নানা জায়গা থেকে নিয়েছেন। কিন্তু শুধু নিলেই তো হয় না, সে সব পরিপাক হওয়া চাই। তাঁদের ঘাড়ে চাপার ব্যাপার আছে এক্ষেত্রে। যেমন রামকিঙ্কর বলেছেন– 'যে টুকু খেয়েছি সব হজম। আর্টে লেনদেন তো আছেই। গ্রীক থেকে আমরা নিচ্ছি। চীন জাপান নিচ্ছে আমাদের থেকে। আবার জাপান থেকে নিচ্ছে

ইউরোপ। মর্ডান আর্টের জন্ম হচ্ছে। লেনদেন তো থাকেই। চলবেও চিরকাল। হয়তো বেশিই চলবে। এখন তো বাবা হাত বাড়ালেই প্যারিস। কিন্তু নিলেই তো হলো না। হজম করা চাই। জোর চাই হজম করার। বদহজম জিনিসটা খারাপ। আর্টে আরও।' তিনি এ বিষয়ে এক জব্বর কথাই বলেছেন যা প্রতিটি শিল্পীর মনে রাখার মতো কথা। সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো কথা। বলেছেন– 'ছবিতে সেজান আছে মাতিস আছে। এ আছে সে আছে নিজে কোথাও নেই। এমন দুর্দ্দশা চোখে দেখা যায় না। ভালো হোক মন্দ হোক ছবিটা তোমার। ওখানে সেজান মাতিসের ঘাড়ে দাঁড়াতে হবে।'

রামকিঙ্কর একথা আলোচনায় পর আর কোনো বিতর্ক চলতে পারে না, কারণ তিনি তাবৎ প্রভাবিত হওয়া বিষয়ক অর্বচীন সমালোচনার মুণ্ডপাত করে ছেড়েছেন। তো রামকিঙ্করের এই মুণ্ডপাত করার ব্যাপার বহুক্ষেত্রেই। যেমন শিল্পসৃষ্টি বাস্তবতার ভিতর দিয়ে না গেলে সার্থকতা পারে না, কিংবা আমার মূর্তি করার টেকনিক বা গ্রামার চুলোয় গেছে। কাজ করতে করতে হয়েছে যা হওয়ার। এই সব বাঁধা গতের বিপরীত কথা বলা। বাঁধি পথে না চলে শান্তিনিকতনে প্রথম অয়েলের কাজ। মূর্তি নির্মাণের চলমান প্রথা ভেঙে আধুনিক ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রথম বিমূর্ত মূর্তি করা। ন্যুড স্টাডি। সামাজিক রীতিনীতি মাড়িয়ে বোহেমিয়ান জীবন-যাপন। কলকাতার বিভিন্ন স্কালচারের অধিকাংশই তাঁর না পছন্দের সোজাসাপ্টা বক্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয় বা প্রসঙ্গেই। যাই হোক এই মুণ্ডপাত তাঁর সারাজীবনব্যাপী নানা ক্ষেত্রে চললেও তিনি মানুষের মুণ্ডু বা মাথাতে কিন্তু বিশেষ আগ্রহী ছিলেন বলা যায়। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে ব্যক্তিত্বের গভীরে পৌঁছানোই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান। শুধু মুখের আদলটি মেলানোই নয় বরং চরিত্র বা সত্তার স্বরূপটিকে তিনি তুলে আনতেন। এজন্য মডেলের আসল চরিত্রটি বাইরে টেনে আনার প্রয়োজন স্থির না বসিয়ে কাজের মধ্যে বা কথার মধ্যে রাখতেই পছন্দ করতেন। তিনি যেহেতু সুন্দরের চাইতে সত্যকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। পোর্ট্রেট বিষয়ে তাঁর আরেক গুরুত্বপূর্ণ অভিমত হল মুখে আলো পড়ে মুখ মাপ অনুযায়ী যা আকৃতি তার থেকেও বড়ো দেখায়। অবিকল মাপ অনুযায়ী করলে কেমন যেন মুষড়ে পড়া লাগে। চেহারা র‍্যাডিয়্যান্ট হওয়া চাই। প্রায় কুড়ি মিনিট কি আধঘন্টায় রামকিঙ্কর করেছেন বিখ্যাত সরোদবাদক আলাউদ্দিন খাঁর পোর্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথ আলাউদ্দিনের মাথাটা রেখে দেওয়ার কথা নন্দলালকে বলায় রামকিঙ্কর গুরু নন্দলালের কাছে আদেশ পেয়েছিলেন তাঁর মূর্তি করার। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'ওস্তাদজীর আসল ইম্প্রেশন হল যখন উনি সরোদে আলাপ করেন বা তান দিচ্ছেন।' এমনি বসে থাকলে কেমন ম্রিয়মান দেখায়। তাই তিনি ওস্তাদজীকে পান্থশালায় দেখে মডেলিং ঘরে

গিয়ে প্যাস্টেলে প্রথমে ওঁর মুখ এঁকে মাটি দিয়ে মাথা আরম্ভ করেছিলেন মন থেকে, গত রাতের দেখা স্বপ্নে মানুষে একাকার ঐ শিল্পীকে। তিনি বলেছেন– 'খাঁ সাহেব সামনেই। লোকটাকে দেখছি বটে চোখে কিন্তু আর একটা চেহারা ওঁকে ঢেকে ফেলছে। গতরাতের চেহারা স্বপ্নে মানুষে একাকার। কানে শোনা শিল্পীর সেই ঝালা আমার ঘাড়ে চাপলো, আর কুড়ি মিনিটেই কাজ শেষ।' উনি বলতেন সুন্দর কথাটির মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই শিল্পে। রামকিঙ্করও সুন্দরের বদলে ক্যারেকটার চাইতেন। পেলবতা মুছে দিয়ে তিনি আনতেন কর্কশ চারিত্রিক দৃঢ়তা।–

রামকিঙ্কর বলেছেন– 'এই যেমন তোমাকে দেখছি, নড়ছো চড়ছো কথা কইছো, নানা এ্যাঙ্গেলে দেখছি। ওরই মধ্যে নজরে পড়ে যাচ্ছে এমন কিছু যা আমাকে হেল্প করছে ক্যারেকটার ফোটাতে।' পোর্ট্রেট বিষয়ে রামকিঙ্করের এই সব আলোচনা প্রত্যেক শিল্প শিক্ষার্থীর কাছে মূল্যবান সম্পদের মতোই। তিনি যে সব পোর্ট্রেট গড়েছেন তার মধ্যে গাঙ্গুলীমশাই, প্রীতি পাণ্ডে, মীরা চাটার্জ্জী, মথুরা সিং, ইরা ভাকিল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বিনোদিনী, আলাউদ্দিন খাঁ, সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী জয়া আপ্পাস্বামী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কিরণ থাপা, কিরণ বড়ুয়া, শীলা বর্মা, কুমকুম ভট্টাচার্য, চৈতালী দে, প্রমুখ ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট তিনি করেছেন যেগুলি এক একটি ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল হয়ে থেকে যাবে বহুকাল নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে পথ প্রদর্শক হয়ে।

কোনো কিছু সৃষ্টিতে যে আনন্দ তা অন্য কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। মূলত সেই আনন্দের স্বাদ পেয়েই একজন শিল্পী শিল্পের সাধনায় নিয়োজিত রাখতে পারেন নিজেকে বাস্তবের যাবতীয় বাধাকে উপেক্ষা করেই। রামকিঙ্কর সেই সৃষ্টির আনন্দেই কাজ করে গেছেন, যা বর্তমান ও আগামী দিনের শিল্পীদের কাছে পাথেয় স্বরূপ। পোর্ট্রেট বিষয়ে তাঁর মূল্যবান কথাগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তথ্য এবং বোধের গভীরে ঢুকতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন– 'দেখো পোর্ট্রেটে সৃষ্টির সুযোগ সবচেয়ে বেশি। মুখের অ্যানাটমি নকল নয়– ক্যারেকটারকে ফুটিয়ে তোলা। নকল যদি করো তবে দেখবে পোর্ট্রেট আর হল না। সেটা হয়ে যাবে মানুষটার থেকে অনেক দূরের জিনিস। যাদুঘরে শার্সির আলমারিতে বিচুলি তুলো ভরা বাঘ দেখেছো? ঐ রকম আর কি।' আরও বলেছেন– 'একটা মুখে অনেকগুলো জিনিস থাকে। যার দাম খুব বেশি ক্যারেকটারের দিক থেকে। প্রথমে আবিষ্কার করতে হয় সেগুলো। তারপর ফুটিয়ে তুলতে হয় জোর দিয়ে। আণ্ডার লাইন করা আর কি। তবেই পোর্ট্রেট হয়। নকল আর ভুল জায়গায় জোর দুই হলো সমান বিপজ্জনক। ও পথে যে গেলো তার কাজও গেলো গোল্লায়।' রবীন্দ্রনাথের সিটিং নিয়ে পোর্ট্রেট করার সময় তিনি তাঁর নাক এবং চোখের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। বলেছেন– 'ব্যক্তিত্বের

অনেকটাই ঠাঁই নিয়েছে ঐ নাকে। আর চোখ ইয়া বড় বড়। তোমার ভিতর অবাধ দেখে নেবে।' তাঁর ছাত্র বলবীর সিং কটের রামকিঙ্করের পোর্ট্রেট তৈরির কাজ চলাকালীন তিনি হাত লাগিয়েছিলেন কোথাও একটি গোলমাল থেকে যাচ্ছে দেখে। শেষে মুখের নিচের দিকে খানিকটা ভেঙে দিয়ে কাজটি উতরে দেন তিনি। বলেছেন একদিন এগিয়ে গিয়ে মুখের নিচের দিকে খানিকটা দিলাম ভেঙে। বললাম আমার মুখের এ অংশটা একটু এগিয়ে এসেছে হে– এগিয়ে এসেছে কুকুরের মতন। তো এভাবেই মুখের বিশেষ বিশেষ জায়গার গুরুত্বের কথা এবং সে সব জায়গায় জোর দিয়ে ক্যারেকটার ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তিতে তিনি এক চোখের জায়গায় বল দিয়েছেন, তাঁর যে কোনো বিষয়ের ভিতর অবধি দেখে নেওয়ার ক্ষমতা বোঝাতে আর অন্য চোখের কারিকুরিতে বা প্রকাশভঙ্গীতে গভীর গহন আত্মস্থ ও সমাধিস্থ– সে রবীন্দ্রনাথ। কে. জি. সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিগুলিতে যেমন, তেমনি এক্ষেত্রেও (প্রতিকৃতি ভাস্কর্য) প্রত্যেকটি মডেলের মধ্যে আবেগের অলৌকিক আভা ছড়িয়ে দিয়ে এক বিশেষ দৈবী মহিমায় রূপান্তরিত করেছিলেন তাদের।' তাঁর আঁকা স্বপ্নময়ী, সোমা যোশী, বিনোদিনী, নীলিমা দেবীর পোর্ট্রেট বিষয়ে শিল্পী সুব্রামণিয়াম বলেছেন– 'এগুলির প্রত্যেকটিই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় অনন্য। পেশাদারী ছবির মতো ঘসে মেজে পরিষ্কার করা ঝকঝকে মুখোশ নয়। আবার এগুলিকে ক্যারেকটার স্টাডিও বলা যাবে না। প্রত্যেকটি বিষয় বদলে গেছে প্রতিমায় এবং যারসঙ্গে মিলেমিশে গেছে ব্যক্তিগত নিরিখ।'

গাঙ্গুলিমশায়, প্রীতি পাণ্ডে, মীরা চ্যাটার্জ্জী, মধুরা সিং, ইরা ভাকিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য বিষয়ে শিল্পী কে. জি. সুব্রামণিয়ামের উক্তি– 'এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন উপায়ে জীবন্ত ভাবে উপস্থিত করেছেন তিনি। এবং মডেলের গঠন ও চরিত্র অবিকল রেখে এদের প্রত্যেকটিই দৃশ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে গেছে।' তো দেখে যায় রামকিঙ্করের ছবি ও ভাস্কর্য তাঁর নিজস্ব যে ভাবনা প্রাকৃতিক বাস্তবতার ভিতর দিয়ে না গেলে সার্থকতা পাবে না, সেই নিজস্ব সঠিক ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ক্রমশ রিয়েলিজমকে ছাড়িয়ে সুররিয়ালিজম বা বিমূর্তের দিকে চলে গেছে।' প্রতিকৃতি ভাস্কর্যগুলিতে যেমন তেমনি তাঁর আঁকা পোর্ট্রেটগুলিতে হুবহু মুখের আদলে আঁকার তাঁর উৎসাহ কখনই ছিল না। বরং সেগুলি মডেলের একপ্রকার ব্যাখ্যা হিসেবেই ধরা যায়। এই ব্যাখ্যাময়তা মূলত গড়ে উঠেছিল মডেলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বকে নির্ভর করে। বলেছেন তাঁরা ছাত্র শিল্পী ও সমালোচক জয়া আপ্পাস্বামী। রামকিঙ্করের রঙের প্রয়োগ ও তুলিচালনা যেমন তাঁর মনের ভাব প্রকাশের তাড়ায় বিচিত্র ধারায় ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে তেমনি

সারফেস ট্রিটমেন্ট তাঁর একটি বিশেষ গুণ এবং দক্ষতা। মূলত পোর্ট্রেট করার মধ্য দিয়েই তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত এবং এক বিশিষ্ট জায়গায় পর্যায়ক্রমে এসে দাঁড়ানো। এখানে তিনি আঙ্গিকের খেলায় মেতে ওঠেন ছন্দ ও শৈলীর উৎকর্ষতা বজায় রেখেই। শঙ্খ চৌধুরী লিখেছেন– 'কিঙ্করদার মাটির কাজের মধ্যে যেটা সব চাইতে নজরে পড়ে সেটা ওঁর রিদিমিক স্ট্রাকচারের বাঁধন আর তেজস্বী ছন্দের গড়ন। এর অনেক কিছুই যেন পোর্ট্রেট করা দিয়েই আরম্ভ করেছেন। ওঁর প্রোপরসন নিয়ে খেলা, ইম্প্রেশন আর ডিসটরসন এ-ও পোর্ট্রেটকেই কেন্দ্র করে।' রামকিঙ্করও তাঁর জবানীতে বলতে গেলে সেকথাই স্বীকার করেছেন। পোর্ট্রেট ছিল তাঁর কাছে এক মজার খেলা– সৃষ্টির মজা। যেখানে নানান টেক্সচারের কৌশলে মানুষের, জন্তুর বা বস্তুর ক্যারেকটারকেই তুলে আনতেন তিনি। বলেছেন– 'পোর্ট্রেটে যত মজা এমন মজা আর কোথায় বল?. . . দেখো পোর্ট্রেটে সৃষ্টির সুযোগ সবচেয়ে বেশি।' রামকিঙ্করের জলরঙের বেলায় যেমন তাৎক্ষণিক এবং তরতাজা ভাব কিন্তু তেলরঙের ক্ষেত্রে তিনিই আবার অনেক বেশি আঙ্গিকের খেলায় মেতেছেন। সেখানে তিনি ডুব দিয়েছেন ব্যক্তিত্বের গহনে এবং তুলে এনেছেন নিজস্ব নিরিখের মণি-মাণিক্যে।

মোটের উপর রামকিঙ্করের সামগ্রিক কাজকে এক নিরিখে ফেলে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কারণ তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। জীবনের প্রথম পর্বের ছবিগুলিতে অত্যন্ত নিপুণতায় ওয়াশ এবং টেম্পারার কাজ করেছেন। সূচনায় পুরাণাশ্রিত বিষয়ের উপর কাজ করলেও বিভিন্ন নিসর্গ দৃশ্য, কর্মমুখর মাঠ, চারণরত গোরু-ছাগল, ছুটে যাওয়া গোরুর গাড়ি, আদিবাসী সাঁওতালের রূপ ও তাদের আনন্দ উল্লাস এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসী মানুষজনই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। শেষমেশ রিয়ালিস্টিক কাজের দিকে চলে গেছেন। পরে রোমান্টিক বিবরণধর্মীতা ও রিয়েলিজমের ভাবনা পেরিয়ে ক্রমশ চলে গেছে কিউবিজম, ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম এবং সুররিয়ালিজমের দিকে। এবং আরো পরবর্তীতে মিনিমাইজেসনের চূড়ান্ত ভাবনায় তথা বিমূর্তের দিকে। তিনি বুঝেছিলেন নতুন কথা বলতে হলে নতুন ভাষাতেই তা বলতে হবে। তাই তাঁর ভালো লাগা নন্দলালের টানটান ছন্দ কাঠামোকে কিউবিস্ট ভাবনায় ফেলে ছবি করেছেন। তাঁর কিউবিস্ট ভাবনা ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতায় এবং মৌলিকতায় উজ্জ্বল। তিনি ছবিতে কিউবিস্ট ধারণার পাশাপাশি ইম্প্রেশনিস্টিক, পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টিক এবং পয়েন্টেলিস্টিক রঙের প্রয়োগ করেছেন। ওয়াশ এবং বুদ্ধিদীপ্ত রঙের প্রয়োগে ছন্দপ্রধান ও গঠনসমৃদ্ধ ল্যাণ্ডস্কেপে মুহূর্তকে ধরবার জন্য তিনি বিভিন্ন রকম সারফেস এবং ডেনসিটি ট্রিটমেন্ট-এর উপর জোর

দিয়েছেন। কোথাও সাবজেক্ট এবং লোকেশনের ভিন্নতায় ছন্দের পরিবর্তন হয়েছে। এই ধরনের টেকনিকের কাজে ছুটে যাওয়া গোরুর গাড়ি, মাল বোঝাই ঘোড়ার গাড়ি, ঢালু পাড়ের উপর শিমুলগাছ, প্রভৃতি দৃশ্যে তিনি ছিলেন এতটাই স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস, যা আমাদের বিস্মিত এবং হতবাক করে। তাঁর ছবির এইসব বিশ্লেষণাত্মক গুণীজনদের মন্তব্য রামকিঙ্করের বিষয়ে আরোতর বিশ্লেষণের প্রয়োজনের ভাবনা জাগায় আমাদের। প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে তিনি যেমন শুধু মুখের আদল নয় ফ্যাকটারকে ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন তেমনি আবার মুখের মেজারমেন্ট বিষয়ে তাঁর এক বিশেষ ভাবনা ছিলো যা তাঁর ছাত্র শিল্পী শঙ্খ চৌধুরী রামকিঙ্করের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। তিনি লিখেছেন– 'উনি বলতেন দেখ এই যে মেজারমেন্ট তার লিমিটেশন কি, কতকগুলো স্কিন-কোয়ালিটি আছে তাতে অলোপড়লে মুখের ভল্যুম বড় দেখায়। মুখে আলো পড়ে মুখ মাপা অনুযায়ী যা আকৃতি তার থেকেও বড়ো দেখায়। অবিকল মাপ অনুযায়ী করলে কেমন যেন মুষড়ে পড়া লাগে। চেহারা র‍্যাডিঅ্যান্ট হওয়া চাই।' এ ধরনের পোর্ট্রেট অনেকের কাছেই একটু বাড়াবাড়ি আর হাসিঠাট্টার বিষয় মনে হলেও আস্তে আস্তে ও কাজের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়ে গেল।''

তাঁর ছবিতে যেমন চিত্রকল্প এসেছে আবার স্থানীয় কিছু দৃশ্যে তাঁর প্রতীকী বা মিথিক্যাল বিমূর্ততার মাত্রা যোজনার ভাবনা দেখা যায়। মহিলাবেষ্ঠিত কোনো ছবিতে তিনি মনোরম সৌন্দর্য এবং আসন্ন আতঙ্কের অপচ্ছায়ার যুগপৎ সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তেমনি আবার রক্ত মাংসের এই নারীই স্বর্গীয় মহিমায় দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাকে সমাজবাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যখন তিনি দুর্ভিক্ষ বন্যা দারিদ্র্য যা মৃত্যুর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন হয়ত নিজের জন্মসূত্রের দায়বদ্ধতা থেকেই। ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি কোনো পৃষ্ঠপোষকতার আশায় বসে থাকেননি বরং স্বাধীনভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজের সন্তুষ্টি বিধানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। পরিবেশীয় ভাস্কর্যগুলিতে তিনি কখনো মূর্ত-বিমূর্তের সমঝোতায় আবার কখনো আধামূর্ত কিংবা সংগীতের বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর মত শুধুমাত্র বিমূর্ত ভাবনার মধ্যেই বিচরণ বা সমাধিস্থ থাকতে দেখা যায়। ফর্ম বা ধারণার নতুনত্বে বিশাল মাপ ও মনুমেন্টালীয় রূপ দর্শককে বিশেষভাবে বিমোহিত করে। এছাড়া তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনার প্লেইং প্রোসেস এবং সিমেন্ট কাঁকড় মেশানোর ভাবনায় ফুটে ওঠা টেক্সচার সততই প্রাণস্পন্দনে ও তরতাজা দেখায় যা বিস্ময়কর এবং সর্বকালের শিল্পীদের কাছে এক নতুনত্বের ভাবনার দিশারী এবং প্রেরণা স্বরূপ হয়ে থাকবে।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর যে বিশেষ অবদান আটকে যাওয়া বা আবদ্ধ হয়ে যাওয়া একটা ঘূর্ণি থেকে ছবি ও ভাস্কর্যকে বের করে এনে পুনরায় বহমান স্রোতের সাথে

মিলিয়ে দেওয়া। যেমন আকৃতির সুগোল সুডৌলের বদলে বিভিন্ন তলের বিন্যাস ও তাদের তীক্ষ্ণ সরলরেখায় মিলিত হওয়া। এখানে যেমন রয়েছে আয়তনিক পূর্ণতা অভিমুখীনতায় ভারতীয় দর্শনের সাযুজ্য, তেমনি রয়েছে তল বিন্যাসের জ্যামিতিক রূপ শরীর ও মুখের সারল্য ও তীক্ষ্ণতায় রয়েছে অনুরণন। লোকায়তিক জীবন প্রবাহকে এক যোগে আধুনিকতা ও চিরায়তের মূল্যমানে ভাস্কর্যে রূপ দেওয়ার সার্থক প্রচেষ্টা। বিমূর্ত মূর্তি তৈরিতে আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম। কেন না রামকিঙ্কর প্রাচীন ভারতবর্ষের রাবণ ও গণেশের মুখ শিবলিঙ্গ ইত্যাদিকে বিমূর্ত ভাবনার প্রকাশই বলেছেন। বলেছেন– 'শিবলিঙ্গকে দেখে ভেবে নিতে হয় শিবের রূপ।' ইজমের খাতিরে তার ছবি বা ভাস্কর্য কখনো প্রাণহীন হয় পড়েনি বরং রসসৃষ্টির গুণে একশ ভাগই উত্তীর্ণ হয়েছে। নরনারী, জীব-জন্তুর দৈহিক গঠন জ্ঞান চূড়ান্ত রকমের জানা থাকায় একটা সবল ভাব প্রকাশ পেয়েছে ছবি বা ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই। রিদিমিক স্ট্রাকচার ও তেজস্বী ছন্দের গড়ন প্রচেষ্টা ইম্প্রেশন ডিসটরসন প্রোপরসন নিয়ে খেলা এ সমস্ত কিছুতেই রসোত্তীর্ণের দিকে সফল ভাবেই এগিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যে Tiger Like নয় বরং Like Tiger-এর রূপই দেখতে পাওয়া যায়। 'সাঁওতাল দম্পতি' ও 'কলের বাঁশিতে' বস্তুত একথাই সত্য প্রমাণিত হয়। বড়ো কাজের ক্ষেত্রে তিনি একহাতে সবটা শেষ করার কথা বলেছেন যেহেতু তাঁর মতে টুকরো টুকরো করে জিনিস করায় এক এক অংশের ট্রিটমেন্ট ড্রইং ঠিক নাও মিলতে পারে। চারপাশ থেকে ভাবার কথা বলেছেন ভাস্কর্যে। বলেছেন খোদাইয়ে ছেনির প্রত্যেক ঘা-কে মিনিংফুল করার কথা। নেচার থেকে সুন্দর সুন্দর লাইন কালেক্ট করার কথা বলেছেন। কারণ তাঁর উপলব্ধিতে নেচার হচ্ছেন দেবশিল্পী আর তাই লাইন সুন্দর হলে ছবি ভালো লাগবেই। একথা তিনি বলেছেন।

আর্ট ছিল রামকিঙ্করের কাছে যুক্তিবিহীন, কারণবিহীন, অহৈতুকী। জীবনের কুৎসিত নগ্নতা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সৃজনশীল প্রাণবন্ততার চ্যালেঞ্জ, বলেছেন তিনি। একটা হারজিতের খেলা থাকে, যাবতীয় কুৎসিত নগ্নতার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে এখানে পূর্ণ আস্থা নিয়ে খেলতে পারাটাই প্রকৃত শিল্পীর পরিচয়। আর্ট যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয় একথা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করতেন তিনি। আরেক বিশ্বাস– দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর সত্যি সত্যি ভালো কাজ করতে পারলে মানুষ তাঁকে মনে রাখবেই। চাহিদা না থাকলে বা যোগান না পেলে যে শিল্প হয় না এটা ছিল তাঁর কাছে হাসির খোরাক। বরং নিজের পূর্ণত্বের প্রয়োজনেই একজন শিল্পী তার শিল্প কর্ম নানান বাধা-বিপত্তি সহ অব্যাহত রাখবেন। এটাই ছিল অন্তরের ভাষণ। প্রেম শিল্পসৃষ্টিতে হয়ত এসেনসিয়াল। গতি এনে দেয়। হয়তো কোনো ঐশী ইচ্ছাতেই

শিল্পীর জীবনে তা এসে থাকে। কিন্তু তাতে লেপটে যাওয়া যে শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক রামকিঙ্করের সচেতন মন তা বুঝেছিল। তাই বিপদ বুঝে সরে এসেছেন। তিনি নারীর মধ্যে সৌন্দর্য ও বিভৎসতার এক আশ্চর্য সহবস্থান দেখেছিলেন। আবার মমতাময়ী সারদার মত স্বর্গীয় সুষমার রূপও প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর চারপাশে তাকিয়ে দেখেছিলেন– 'শিল্পীরা স্বভাবতই গরীব হয়ে থাকেন কারণ অহেতুক কাজের তাড়নায় তাদের গরীব করে রাখে।'

তাই গরীব শিল্পী ছেলের কাছে বিয়ের পথে যাওয়া যে আত্মহননেরই সামিল। এজন্য গরীব শিল্পী ছেলের কল্পনাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে তিনি বুঝেছিলেন– 'একটা পথ খোলা রয়েছে সংসারের মধ্যে না ঢোকা। তিনি বলেছেন যদি ভয় থাকে ভীতু হয়ো, একটু ভেবে দেখো শুধু খাওয়ার জন্য তো বাঁচা নয়। পরন্তু বাঁচার জন্যই খাওয়া। শুধু খেয়েই থাকতে পারে না একটা মানুষ। তাঁর মন বলে একটা জিনিস থাকে। সেই মনের খোরাকও চাই কিন্তু।' রামকিঙ্কর তাই বলেছেন– 'পেটের কথাই খালি যদি ভাবো তবে মনের কথাটা বাদ পড়ে যাবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না। পশু হয়ে যাবে সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তন ঘটিয়ে পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যায়। কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে। কাজেই এর মূল্য অপরিসীম।'

অতীত দিনের রাজা-রাজড়াদের পৃষ্টপোষকতায় আমরা বহু মহৎ শিল্পকীর্তি সব পেয়েছি যা চিরকালীনতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। রামকিঙ্কর তাই শিল্পসৃষ্টি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিক্ষেপ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কারণ রামকিঙ্করের মত ক'জন আর জীবনকে বলি চড়িয়ে শিল্প গড়তে চাইবে? তিনি বলেছেন– 'সরকারের উচিত শুধু সরকারি নেতাদের বা তাদের পছন্দ মতো ছবি করানোর জন্য টাকা ব্যয় না করে শিল্পীরা যাতে স্বাধীনভাবে নিজেদের আনন্দে কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। উৎসাহ দেওয়া।'

সমাজের প্রতি শিল্পীর একটা দায়িত্ববোধ থাকে। সামাজিক কুপ্রথা ও দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাই শিল্পী সরব হয়ে ওঠেন। গর্জে ওঠেন স্বভাবতই সমবেদনার গাঢ় অনুভূতি থেকে। কারণ আর্ট হল প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণবন্ততার লড়াই। মৃত্যুর বুকে সৃজনশীলতার চ্যালেঞ্জ নিয়েই শিল্পী জন্মায়। তাই 'দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মন্বন্তর, যুদ্ধ যেখানে যত মানুষের প্রতি অপমান, শিল্পীকে আন্দোলিত করবেই।' রবীন্দ্রনাথ বারবার আন্দোলিত হয়েছেন। যে কোনো মহান শিল্পীই হবেন। বলেছেন রামকিঙ্কর। শিল্প সৃষ্টিতে অপসংস্কৃতির কোনো স্থান নেই। থাকা চলে না। নয়তো সে সব মানুষকে বিপথে চালিত করে। অকামের গুরুঠাকুর বনে যান স্রষ্টারা। একথা সাহিত্য এবং সঙ্গীতেরও ক্ষেত্রেও। রবীন্দ্রনাথ রুচিশীল

সৃষ্টির কথা বলে গেছেন। জীবনের মহৎ দিকগুলিই সাহিত্য সঙ্গীতে ও শিল্পে স্থান পাওয়া এবং পরিবেশিত হওয়া উচিত। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'শিল্পীর উচিত আলোর কথা, ক্লেদ উত্তীর্ণ জগতের কথা ঘোষণা করা।'

তো এবার আমরা আবার ফিরে যাই রামকিঙ্করের আলোকোজ্জ্বল ক্লেদ উত্তীর্ণ শিল্পকীর্তির আলোচনায়। তিনি বলতেন মূর্তিতে রস আনতে হলে প্রকৃতির রূপ রঙকে হাতে-কলমে জানা দরকার। ভাস্কর্যের ছাত্রদের জন্য রামকিঙ্করের একটি অমূল্য উপদেশ শুনিয়েছেন রামকিঙ্করের ছাত্র শিল্পী প্রভাস সেন মহাশয়। তা হল, ভাস্কর্যের ছাত্রদের জন্য মানুষের শরীর নানাদিক থেকে ও নানা ভঙ্গিমায় ড্রইং করেও পারত পক্ষে মডেল করে দেখা কিঙ্করদা অপরিহার্য মনে করতেন। ছাত্রদের বলতেন ভাস্কর্যের প্রধান অবলম্বন মানুষের শরীর। এ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকলে তারপর শিল্পী নান্দনিক প্রয়োজন তাঁর শিল্পকর্মে যত ভাঙাচোরাই করুকনা কেন এই জ্ঞান তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাছাড়া মানুষের শরীরের স্টাডি চোখকে যে কোনও জিনিস বিশদভাবে দেখতে শেখাবে আর হাতকে করবে সংবেদনশীল। রামকিঙ্কর জানতেন, যারা প্রতিভাশালী তাদের কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তবে তা প্রকাশ্যে আনতে একাডেমিক শিক্ষা যে অপরিহার্য্য তাও মানতেন। তবে ভিতরে আগুন না থাকলে একাডেমিক শিক্ষালাভ কেবলি ভস্মে ঘি ঢালার ব্যাপার হয়। রামকিঙ্করের মতে চাকরির জন্য কলাপাতা নিতে আসে তারা। আবার চাকরির-বাকরি না জুটলে কলাপাতা নেওয়াই হয় মাত্র। ভবিষ্যতে আর্টিস্ট হবেন তাঁরাই শিল্পবোধ নিয়েই যাদের জন্ম। অবশ্য চারপাশ থেকে একটা অনুকূল বাতাবরণ থাকতেই হয়। রামকিঙ্করের দৃষ্টিতে 'আর্টিস্ট মাত্রই হলো ভুঁই ফোঁড়। যে মাটি ফুঁড়ে আপনা হতেই ওঠে। মহীরূহ হয়।'

তিনি ভুঁইফোঁড় ছিলেন বলেই প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র হওয়ার কথা ভেবেছেন। আটকে যাওয়া ঘুর্ণি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রোমান্টিক বিবরণধর্মীতা ছেড়ে রিয়ালিস্টিকে এসে আবার কিউবিক ভাবনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আধা-বিমূর্ততা থেকে একেবারে বিমূর্তের দিকে চলে গেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই বলেছেন– 'তবে কিউবিজমেই থেমে থাকা যাচ্ছে না। তাতেও পরিবর্তন আসছে। কিউবিক রেখেও কিরকম ভাবে বোঝানো যায় বা ফোটানো যায় জিনিসটা সেটা ক্রমশই বদলাচ্ছে। সেইজন্য দেখবেন কিউবিজমের মধ্যেও আবার একটু ভাঙন আবার দু-তিনটে জিনিস। স্ফীয়ার এবং কিছু লাইন বা টোনের কম্বিনেশন পারমুটেশন। একটু অন্যরকম যাতে হয় আর কি! তখন নিছক কিউবিকটা উড়ে গেল। একেবারে বন্ধ। পিওর কিউবিক বলতে কিছুই রইলো না। অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেলো।'

রামকিঙ্কর কিউবিক বিষয়ে বলতে গিয়ে রসোত্তীর্ণ হওয়ার দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে বলছেন। যা শিল্পীদের প্রতি এক মূল্যবান উপদেশ। বলেছেন– 'কিউবিক হলো ঠিকই কিন্তু ওর ভিতর যে রসিকের ইয়েটি, সেটি কিন্তু থাকা চাই বাবা, তা না হলে কিউবিক হবে না বুঝলে।'

রামকিঙ্কর পুরাণ বা মিথোলজিকে আধুনিক ভাবনার সাথে একাকার করে দিয়েছেন। 'কৃষ্ণজন্ম' ছবির প্রসঙ্গে বলেছেন– 'এখনও কৃষ্ণ জন্মাচ্ছে কারাগারে এখনও তেমনি তেড়ে আসছে কংস, বসুদেব পালাচ্ছে, দেবকী বন্দী। আমার সেই ভাবনার জগৎটাকে থেকেই কৃষ্ণ এসেছে। তার রূপ জন্ম নিচ্ছে তুলিতে। ওটাকে একালেরই ছবি বলতে পারো।'

অজন্তার ছবি যেমন বৌদ্ধগল্পের পরোয়া না করে অনেক বেশি বলেছে। রামকিঙ্করও তাঁর কৃষ্ণজন্ম ছবি ছাড়াও অন্নপূর্ণা সিরিজের ছবিতেও বর্তমান পরিস্থিতির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। তাই ইলাস্ট্রেশনের বিষয়টিও আদৌ সহজ কথা নয়। পৃথিবীর বহু বড় শিল্পীর স্বাধীন কাজের ছবিই হল ইলাস্ট্রেশন। রামকিঙ্কর মূলত এমনতর কথাই বলেছেন।

তাঁর ছবিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আধুনিক কবিতার মতো প্রতীকি এবং সংক্ষিপ্তকরণের ভাবনায় ঋদ্ধ। এই সংক্ষেপের পথে এগিয়েই তিনি এসে গেছেন এ্যাবস্ট্রাক্টে। সেখানে 'ছবি কখনও শুধু রঙের ব্লক– রেখাহীন রঙ। কখনও আবার সামান্য রঙের টিন্ট, আর তারই উপর কিছু কালো কড়া লাইন।... আপনার এই সরলীকরণ কখনও তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। জন্ম হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ল্যাণ্ডস্কেপের।' একথা রামকিঙ্করের সাথে ছবি ভাস্কর্য বিষয়ক আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগবেষক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের।

আমরা আমাদের পরিবেশের চারপাশে তাকাই কিন্তু দেখিনা। শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই দেখার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ রামকিঙ্কর কিন্তু বিশেষ জোর দিয়েছেন ঐ দেখার উপরেই। নিখুঁত এবং টোটাল অবজারভেশন। তিনি বলেছেন– 'ছোটবেলা থেকেই আমার দেখার চোখটা ছিলো। হ্যাঁ তখন থেকেই দেখেছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' তখন থেকেই তিনি বুঝেছিলেন শুধু দেখা নয়। মন নিয়ে দেখা অর্থাৎ দেখার সাথে মনকে বিশেষভাবে যুক্ত করে দেখা। আর এই মন দিয়ে দেখা থেকেই বলে গিয়েছেন– 'মন আঁকে চোখ আঁকা করে না' এই ইনটুইশনের গভীরে। তিনি তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় বসে এক শিল্পশিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়েছেন– 'কাজ করে যাও নিজের মনে। আর তাকিয়ে দেখো আশপাশে কোথায় কী হচ্ছে। কেবল স্টুডিয়োর বসে থেকো না। স্টুডিয়োর বাইরেই সব।'

তো রামকিঙ্কর তাঁর এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে দেখা তার আসল সূত্রপাত হয়েছিল

গুরুনন্দলালের হাত ধরেই। আচার্য নন্দলাল ছাত্রদের নিয়ে যেতেন আউটডোর স্কেচ করতে শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামগুলোতে। বেড়াতে নিয়ে যেতেন খোয়াইয়ের আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে। নিয়ে গিয়ে বলতেন– 'দেখো চারদিকে দেখো।'

সূর্যের হেলে পড়ার সাথে কিরকম রঙ পাল্টে যেত চারপাশটার। হয়ে উঠতো মোনোক্রোম, সে সবই দেখানোর বিষয় ছিল যে নন্দলালের তা বুঝেছিলেন রামকিঙ্কর। প্রকৃতিকে নিখুঁত এবং আদ্যোপান্ত দেখা এবং উপলব্ধি করার বিষয়টি তাঁর সান্নিধ্যে এসেই হয়েছিল রামকিঙ্করের। তাই তো তিনি বলেছেন– 'এই যে গাছপালা, সকাল সন্ধে মাঠ-ঘাট ঠিক এমন করে দেখিনি তো আগে, নেচারকে ঠিক ঠিক দেখতে শিখলাম এখানে এসে। তাই ঐ নামতা মুখস্থ করার মতো আউটডোর স্টাডি নয়।' রামকিঙ্কর বলেছেন– 'আউটডোর স্টাডি মানেই যে সব সময় খাতা বগলে পেন্সিল বাগিয়ে ছুটতে হবে তা নয়, না না তা নয় গো। দেখা ভাবা বোঝা ঐ হলো স্টাডি। ভিতরে নেওয়া।'

বস্তুত এই ভিতরে নেওয়া যেখানে নিজের মানসিক এফেক্ট বা ভাবনা যোগ হয়ে ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, পোস্ট ইম্প্রেশনিজ, কিউবিজম বা কিউবিজমকে ছাড়িয়ে অ্যাবস্ট্রাক্টে পৌঁছে যান শিল্পী। যেমন তিনি বলেছেন– 'তুমি যা দৃশ্য দেখছো তোমার চোখে তারই আভাস দিয়ে যেটা কাজ হলো সেটাই হচ্ছে ইম্প্রেশনিজম।' আবার বলেছেন– 'অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে তুমি যদি দেখ ভালো করে প্রকৃতিকে, তবে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্টে পৌঁছে যাবে। প্রকৃতিকে যদি দেখা যায় তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট পৌঁছে গেলে তুমি। সেটা ডিপেন্ড অন ইউ। তুমি কতটা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারো জিনিসটা সেটার উপর নির্ভর করবে।'

একজন শিল্পী তিনি কিউবিজম করছেন কি ইম্প্রেশনিজম বা এক্সপ্রেশনিজম করছেন কিম্বা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কাজ সেটা তাঁর শিল্পবোধের ব্যাপারে উঁচু থেকে আরো উঁচু চেতনার বিষয়। কিন্তু একজন শিল্পীর যে ক্লেদ উত্তীর্ণ জগতের জীবনের কথা ঘোষণা বা প্রচার করা উচিত সেই মহৎ বোধের সম্পদ নিয়েই মুখ্যত জন্মেছিলেন রামকিঙ্কর। প্রকৃতপক্ষে বিরাট শিল্পী-সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকারের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে। গঠনমূলক কাজেই তাঁরা আত্মনিবেদিত দেখা যায়। রামকিঙ্করের ছেলেবেলায় ভাবনা ছিল– 'একটা বদল আসছে, দেশ একদিন স্বাধীন হবে। তখন মানুষের দুঃখ জ্বালা ঘুচবে। লোকে ভাত খাবে পেট ভরে, মেয়েরা লজ্জা ঢাকবার কাপড়টা পাবে। জাড়ের দিনে বুড়োবুড়ি কিছু একটা দিতে পারবে গায়ে। বাদলায় একটু চালা, একটু আশ্রয়।' কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে চারপাশের পরিস্থিতি তিনি দেখেছেন। গাঁয়ে-গঞ্জে, পথে-ঘাটে, শীর্ণ-শুষ্ক-পঙ্গু মূর্তি সব।

হাতে তোবড়ানো বাটি। তার সাথে বন্যা আর খরার যোগ সাজসে চারদিকে শুধু দুর্ভিক্ষ আর দুর্ভিক্ষ। এখানের শেষ নয়, সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাজা লাল রক্তে ভেসে গেছে বাংলার মাটি, দেশের মাটি। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে তার অনুভূতিপ্রবণ মন। কিন্তু কার কাছে আর আবেদন জানাবেন ওদের হয়ে। পলিটিসিয়ানরা নিজেদের আখের গোছাতেই তো ব্যস্ত। সখেদে তিনি বলেছেন– 'সেই মানুষই রইলো পড়ে। পলিটিকস চলছে।'

তিনি ক্ষোভে বিদ্রোহে ও প্রতিবাদে আঁকলেন 'অন্নপূর্ণা সিরিজ' সমকালীন জীবনের কঠিন বাস্তবতার নগ্নরূপ আঁকতে তিনি মিথোলজির সাংঘাতিক ব্যবহার করলেন। দেখালেন শায়িত কঙ্কাল আর শিয়রে দেবী অন্নপূর্ণা হাতে পেট ভরানোর অফুরন্ত খাবার নিয়ে। আর করলেন স্কাল্পচারে হাত বাড়ানো বসা ফিমেল ফিগার। লম্বা ঘোমটা টানা মুখ, একটু ফেরানো। ঘোমটায় তলায় বুকের কাছে কঙ্কালের কখনো পাঁজর। জ্যান্ত মৃত্যুর মূর্তি।'

রবীন্দ্রগবেষক সোমেন্দ্র নাথের বর্ণিত এই মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের প্রতীকি ভাস্কর্যটিকে দেখার সৌভাগ্য এই লেখকের হয়েছে। সত্যি বলতে কি, রামকিঙ্করের স্কাল্পচার দেখাটা বস্তুতঃ সৌভাগ্যেরই কথা। এটা ঠিক যে একটি প্রতিভাবান মস্তিষ্কের মননের থেকে বের হয়ে আসা যে রূপ, তা দেখতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেওয়াটা একটা বড় কথা নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় একটি গ্রীক ভাস্কর্যের কথা। যেখানে পাথরের রেখায় ভূমধ্যসাগরের বাতাসকে ধরেছেন সুনিপুণ কৌশলে একজন প্রতিভাবান গ্রীক শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'গ্রীক দেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে, চলছে, শব্দ করছে– ছবি দেখে বুঝবে না মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো।'

রামকিঙ্করের তাবৎ শিল্পীকীর্তি বিষয়ে একথাই খাটে। ছবির ক্ষেত্রে যেমন কতো কতো চিন্তন মনন ও নতুন নতুন উদ্ভাবনার জোয়ার, ঠিক তেমনি ভাস্কর্যে মনে হয় এত বিশাল বিশাল মাপের ভাস্কর্যের মাপজোকের নিখুঁত হিসাব, সুন্দর সহাবস্থান, আবেগময় উচ্ছলতা, সজীবতার পরাকাষ্ঠা এবং পেলবতা ও সারল্যের এতটাই উৎকর্ষতা কোনো মানুষের পক্ষে কি সম্ভব! রসিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আক্ষরিক অর্থেই বাকরুদ্ধ হয়ে যেতে হয়। শুধু একটা কথাই বলা যায়, যে বোঝে প্রাণ বোঝে যার। যাই হোক ফিরে আসি রামকিঙ্করের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ছবি ভাস্কর্যের ভাবনায়। তিনি বলেছেন– 'ঐ সীমার (দরিদ্রসীমা) নিচে অসীম দুঃখ চিরকাল। চিরকালই। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি। বাঁকুড়ায়, যুগীপাড়ায় দেখেছি, আসানসোলে, কলকাতায়, বিহারে, দিল্লীতে।'

আর তাই তিনি তাঁর ভাবনার ভাষায় ওই 'আসল প্রিজনারদের' কথাই তিনি

বলে গেলেন সারাটা জীবন ধরে– রঙে, মাটিতে, স্কেচে, কংক্রিটে ও ছাপচিত্রে। এখানে তাঁর নিজের জন্মসূত্রের দায়িত্ববোধের কথা তাঁর মাথায় তো ছিলই। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন শিল্পী, সঙ্গীতকার ও সাহিত্যিকেরা ক্লেদ উত্তীর্ণ জীবনের কথাই বলবে। সমাজ পরিবর্তনে তথা দেশের মানসিকতার উত্তরণে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা থাকতে হয়। থাকা উচিত। মহৎ মানুষ ও যুগাবতারদের ইডিওলজি মানুষের সামনে বিশেষ জোরের সাথে তুলে না ধরলে সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবী যে রসাতলে যাবে। তাই তিনি বলেছেন– 'শিল্পীর কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের রুচি বদল হয়। সমাজেরও পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো সামাজিক অন্যায় বা অপরাধবোধকে শিল্পী তার তুলির সাহায্যে এমন ভাবে ফোটাতে পারে, যা প্রতিরোধেরই কাজ করে। করছেও। সমাজ-পরিবর্তনে শিল্পীর ভূমিকা আছে এবং থাকা উচিত।'

একটা মানুষের জীবনে আদর্শ থাকতেই হয় নিজের সামনে আয়নার মতো, যা নিজের স্বরূপকে চিনতে সাহায্য করে– ভুলত্রুটিগুলো দেখা যায়, শুধরে নেওয়া যায়। একা বেওয়ারিশ কুকুরের হঠাৎ প্রভু জুটে গেলে দেখা যায় তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে। সে ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তার মধ্যে সামঞ্জস্য আসে এবং বিশেষ উচ্চতার প্রভু হলে তো কথাই নেই। গ্রহণ-ক্ষমতা মাফিক সেই নিয়ন্ত্রণও সামঞ্জস্য বিধানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। সৌরমণ্ডলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সূর্যকেন্দ্রীক পাক খাওয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত গতি আমাদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়, যেমন শিক্ষণীয় নিউক্লিয়ার্সকে কেন্দ্র করে প্রোটন-ইলেকট্রনের সুনিয়ন্ত্রিত ঘোরা। আদর্শকেন্দ্রীক জীবনে একটা মানুষও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলে ক্রমশ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে বেঁচে থাকা এবং পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির পথে উৎস বা ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চরম সার্থকতায় শান্তিলাভ করতে পারে। নতুবা উল্কার মতো বিকেন্দ্রীক ছন্নছাড়া জীবন যাপন শেষে জ্বলে যায় আর ভাবতে বসে হলটা কী? করলামটা কী?

এ প্রসঙ্গে বলা যায় রামকিঙ্কর ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত বাঁকুড়া মঠের স্বামীজী আশুমহারাজ ও শ্রীশ্রীসারদামায়ের ভক্ত শিষ্য বিভূতি ঘোষ মহাশয়ের খবরাখবর রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল তাঁর এজন্য ফি বছরই তিনি জন্মাষ্টমীতে তাঁর ছবি আঁকতেন। বলেছেন– কৃষ্ণের জন্ম এই সাবজেক্টটা নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই ছবি আঁকি। শ্রীকৃষ্ণের বাণী সম্বলিত 'গীতা' বইটি ছিল তাঁর পথ চলার সাথী। তাঁর বহু কথাবার্তায় গীতার বাণীই প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। যেমন 'ফল চাই না, যে কোনো ফলই চাই না আমি।' এছাড়া 'আনন্দ হতেই বিশ্বসম্ভূত' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর কাছে কৌপিনবিহীন গুরু। এগোতে গেলেই ছাড়তে হয়– রবীন্দ্রনাথের এই মূলমন্ত্রটি মনে রেখে পিছন ফিরে আর তাকাননি সারাজীবন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে কতটা মনোযোগ দিয়েছেন বিশেষ জানা না গেলেও তাঁর নাটক ও গানের বিষয়ে অনেক ওয়াকিবহাল ছিলেন একথা বলা যায়। 'বিসর্জন' নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'কঙ্কালীতলায় পথে' খসড়া মূর্তিটি করেন তিনি। তাঁর মতে আমি নাটক পাগল থাকায় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জানতেন। এছাড়া ঋদ্ধ হয়েছেন তিনি প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় এবং সুরে। তিনি বলেছেন– 'গুরুদেবের গান মনে হয় চোখ খুলে দেয়। এই গান আমার বড় প্রিয় হে। কোথায় পাবে এমন গান।' বলেছেন– 'আমাদের ক্লাসিক্যাল গান এক ভাবে ইনফিনিটিকে ধরেছে শুধু সুর দিয়ে অনুভব দিয়ে। কথা দিয়ে নয়, গুরুদেবের গান আবার আরেক ভাবে সেই ইনফিনিটিকেই ধরেছে। সেখানে সুরের সঙ্গে কথাও আছে, অর্থও আছে।'

রামকিঙ্কর আদর্শ হিসেবে পেয়েছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, মনীষী রামানন্দ ও আচার্য নন্দলালকেও তাঁদের দিব্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী কাজ কথাবার্তা ও চালচলন উপদেশ নির্দেশ রামকিঙ্করকে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে আরো থেকে আরো গভীরতার দিকে নিয়ে গেছে নানান বিষয়ে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন সুভাষকে, গান্ধীকে। উঁচু পর্বতের মতন তাঁরা। বিরাট আকারে ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর অন্তর প্রদেশে। বলেছেন– 'গান্ধীকে দেখালম এত শান্ত অথচ স্মার্ট লোক জীবনে দেখিনি হে। চমকে উঠেছিলাম দেখে চলন বলন একেবারে ঝকঝকে। হেঁটে যান মনে হয় ছুটছেন।' আরো বলেছেন– 'গান্ধীর ক্যারেকটারই আমাকে টেনেছিল বেশি, শুধু ওর পলিটিকস নয়।'

সুভাষ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'সুভাষ এখানে এলে নন্দবাবুর বাড়িতে থাকতেন। কী তেজীয়ান লোক। ভারি পছন্দ আমার। একবার আমার কাজ দেখেছিলেন কিছু।' বইয়ের পাতায় ভালোভালো মূল্যবোধগুলো যখন জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, কথা বলে, উপদেশ-নির্দেশ দেয় একটা মানুষের জীবনে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। বস্তুত ওইসব বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গ-সান্নিধ্য পাওয়া ক্ষণিকের জন্য হলেও একটা মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। জীবনের মোড়টাই ঘুরে যায়। তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে উৎকৃষ্ট মাত্রা ও মাপে গড়ে দিয়ে যায়। যদিও সেই গ্রহীতার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পুঁজিটি কিন্তু থাকা চাই। যা হল ঐ নেওয়ার ক্ষমতা। নয় তো দুর্যোধনের মত মায়াবী কৃষ্ণ দেখাই হয়। অর্জুনের সাফল্যকে ঘরে তোলা যায় না।

রামকিঙ্কর ঐ নেওয়ার ক্ষমতায় রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মঞ্চশিল্পের ভাবনাকে আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি তাঁদের ভাবনাকে তাঁর সহজাত বোধশক্তি, কল্পনা ও সৃজনশীলতার অনুভূতি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে বুঝেছিলেন। নন্দলালের মঞ্চ পরিকল্পনা

বিষয়ে বলেছেন– 'মঞ্চশিল্পে তাঁর অভিনবত্ব দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। যুঁই ফুলের কুঁড়ির মালা দিয়ে সমস্ত মঞ্চের আঙ্গিক করা, ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখা যায়। তাঁর পরিকল্পিত রবীন্দ্রনাথের নাটকের সমস্ত মঞ্চ ও সাজসজ্জা আমার মনে একটি সৌন্দর্যবোধের বেদনা জাগিয়েছে।' রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ভাবনা রামকিঙ্কর পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের বই এর পাতায়। তিনি বলেছেন– 'রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেরই মঞ্চ একটা ভাববার ব্যাপার। বিশেষভাবে ঐ শেষের দিকের নাটক। যেগুলো ঠিক নাটকের দলে পড়ে না। এর মঞ্চও ঠিক সাধারণ মঞ্চ হবে না। কেমন হবে তার কিছু সাজেশন ওঁরই দেওয়া। দেখবে বইয়ে যে সব সাজেশন আছে এখানে ওখানে।'

মঞ্চসজ্জায় রামকিঙ্করের অভিনবত্ব তাঁর ছাপচিত্র ও নাট্য-পরিচালনার মত আরেকবার আমাদের চমকিত করে। ১৯৪৬ সালে সিংহসদনে অভিনীত 'বাঁশরী' নাটক থেকে শুরু করে শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', রাজশেখর বসুর 'ভুশুণ্ডির মাঠ' প্রভৃতি নাটকের মঞ্চসজ্জায় তাঁর অসাধারণ ভাবনার প্রকাশ সে সময়ের শিল্পরসজ্ঞ মানুষদের বিশেষ বিমোহিত করেছিল। যেমন 'ভুশুণ্ডির মাঠ' নাটকে অমাবস্যার রাতের ঘুটঘুটে আঁধারে ইটের পাঁজা এবং তার পশ্চাৎপটে অমবস্যার চাঁদের দৃশ্যে দৃশ্যে কলাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্ধকার থেকে পূর্ণিমার আলোয় উত্তরণের যে আবেশ এবং 'ওথেলো' নাটকে 'দ্বারিক' নামে একটি গথিক প্যাটার্নের বাড়িটির স্থাপত্য শিল্প ও খিলানগুলির সাথে সামঞ্জস্যে তাঁর মঞ্চ তৈরির ভাবনা একটি রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল এবং 'মুক্তধারা' নাটকে কয়েকটি মাত্র রঙিন কাপড়ের সাহায্যে কালার ডাইমেনশনের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট গভীরতা আনা এবং আলোছায়ায় খেলার মাধ্যমে মনুমেন্টাল কোয়ালিটি ফোটানোয় দর্শকেরা সেই রঙের বিস্তারের দিকে তাকিয়ে বিরাট বাধা এবং কালের চাকার ইঙ্গিত অনুভব করেছিলেন। এছাড়া তাঁর অভিনব শিল্পসৌন্দর্য ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'রক্তকরবী', 'অরূপরতন', সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' এবং হিন্দি নাটক 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী'-র মঞ্চ সজ্জায়। নিতান্ত সামান্য উপকরণ দিয়ে প্রাচীন রোমের আভাস ফুটিয়ে ছিলেন 'অ্যানড্রোক্লেস এণ্ড দ্য লায়ন'-এর স্টেজে। দিল্লীতে বর্তমান প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক ইউ.জি.সির বিজ্ঞান মঞ্চের অলংকরণ করেছিলেন তিনি। ইংরাজি নাটক 'পোয়েকেটার্স অফ ইস্পাহান'-এর মঞ্চসজ্জা থেকে মেক আপ ও পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে মঞ্চসজ্জার সাথে পরিচালনা ও অভিনয়ও করেছেন। বিশু পাগলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। এসব তথ্যই সাক্ষী থাকা তৎকালীন গুণীজন-দর্শকের থেকে পাওয়া। যেমন শিল্পী রামানন্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'একটি নাটক একটি মানুষ কীভাবে সারাক্ষণ মনে রাখতে পারে তা নিজেরাই পলে পলে অনুভব করেছি। নিজে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। জানি না কিঙ্করদা আর কোনো নাটকে এমন নিজ পরিচালনায় আর নিজে এক চরিত্রের অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন কি না?' সেখানেও তাঁর চরিত্রটি বেছেছিলেন বিশু পাগলা। আজও নিশ্চয়ই অনেকেই জীবিত আছেন তারাই সঠিক বলতে পারবেন কী অনবদ্যতায় সে অভিনয়ে সেই নাটক সাফল্য পেয়েছিল। 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চসজ্জার বিষয়ে রামকিঙ্কর যে কথা বলেছেন তা অতীব মূল্যবান। তাঁর এই ভাবনার পথ ধরে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মঞ্চশিল্পের ভাবনায় প্রেরণা, রসদ ও নতুনতর কিছু উদ্ভাবনার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারবেন। তিনি বলেছেন– 'রক্তকরবী'র সাথে কারো তুলনাই চলে না। এর মঞ্চ মস্ত একটা একসাইটিং ব্যাপার। ভেবেছিলাম সেটা করে দেখাবো। কিন্তু হলো না। সবটা পারা গেলো না হে। এ নাটকে জাল একটা খুব বড়ো জিনিস। ঐ জালের আড়ালেই থাকে রাজা। মঞ্চে এই জাল থাকবে। অনেকখানি জুড়ে। জালের ওধারে রাজা। তাকে দেখা যাচ্ছে না। আর এধারে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। চলাফেরা করছে অন্য সব পাত্র-পাত্রী। ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু পাগল, নন্দিনীও। তবে সে মাঝে মাঝে যাবে জালের কাছাকাছি আর কেউ না। শুধু ঐ মেয়ে বড়ো সাংঘাতিক মেয়ে। দস্যি মেয়ে। ঐ জালটা কিন্তু হবে খুব মিস্টিরিয়াস ঠিক বোঝা যাবে না সবটা। একটু এ্যাবস্ট্রাক্ট। আর মঞ্চটা হবে কিউবিস্টিক। বুঝলে এ নাটকে মঞ্চও একটা ক্যারেকটার।' রামকিঙ্করের এই মঞ্চ বিষয়ক ভাবনা বা রূপকল্পনা ছবি ভাস্কর্যের মত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাঁর মাথায় আনাগোনা করছে। এজন্য তাঁকে কেউ বিশেষ চিন্তিত বা বইপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করতে দেখেননি কোনোদিন। এমনটাই জানা যায় চাক্ষুষ দেখা বিশিষ্ট মানুষজনদের কাছ থেকে। বস্তুতঃ প্রতিভাধরদের মাথায় সততাই নানান মূল্যবান তত্ত্ব মূর্তি ধরে ঘোরাফেরা করতে থাকে, যেমন করতে থাকে একজন পাগলের মাথায় নানান এলোমেলো চিন্তার জটপাকানো বিষয়। রামকিঙ্কর পাগল ও প্রতিভাধরের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে কিছু মিল এবং তফাতের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন– 'সামঞ্জস্যহীন নানান উদ্ভট ভাবনা চিন্তা তাঁর (একজন পাগল) মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। আর সে গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়– কিন্তু একজন শিল্পী প্রতিনিয়ত একটা মাধ্যমের অনুসন্ধান করে বলে সে কম্যুনিকেট করে, একজন বুঝতে পারে তাঁকে। কিন্তু একজন পাগল লোক এখানেই ব্যর্থ হয়, সে কোন যোগ স্থাপনই করতে পারে না।' যাই হোক রামকিঙ্করের মঞ্চ বিষয়ক আলোচনার ইতি টেনে তাঁর নাটক পর্বের নানান কাহিনীতে আসা যাক। বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক 'মালিনী'। এছাড়া 'রিজিয়া' ও 'কারাগার' নাটকে অভিনয়

করেছেন। বাঁকুড়া ড্রামাটিক ক্লাবের ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালিত নাট্যাভিনয়ে তিনি অংশ নিতেন। এছাড়া নাটকের সিন আঁকা ও পাত্র-পাত্রীদের সাজসজ্জার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপরে। তাঁর লেখা নাটকের একটি ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল বাড়িতে। 'স্বকাল' পত্রিকার সম্পাদক– গ্রাম পানাগড়ের বাসিন্দা প্রকাশ দাসের নিয়ে যাওয়া ছবিগুলোর সাথেই ছিল তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে নাটকের স্ক্রিপ্ট বেপাত্তা। প্রকাশ্যে আর আসতে পারল না। তো সে কথা থাক।

শান্তিনিকেতন পর্বে রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় এবং 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং 'চিরকুমার সভা' নাটকে অভিনয় করেছেন চন্দ্রনাথের ভূমিকায়। অবশ্য এই নাটকে স্বাস্থ্যচারের কাজের তাড়ায় পার্ট মুখস্থ করতে না পারায় সবটাই প্রম্পটারের মুখাপেক্ষী হয়েই কাজ সেরেছিলেন শোনা যায় এবং সে কারণে নাকি খুব হাসির খোরাকও হয়েছিল। যদিও তিনি তা জানতেই পারেননি। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'আমি নাকি পাগল। ও আমার আর এক নেশা। নাটক কি কম করেছি হে? করিয়েছিও নিজে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেই বেশি।. . . দু-একটা অন্য নাটকও করিয়েছি। বিদেশী নাটক।'

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-পরিচালনা তিনি বিশেষ মনোযোগে দেখেছেন, আত্মস্থ করেছেন তাঁর মূল ভাবনার বিষয়কে। যেমন তিনি বলেছেন– 'উনি যখন নাটকটা পড়ে যান তখন সেটা শুনতে পারলেই তো অর্ধেক কাজ হয়ে গেলো হে। তারপর উনি পার্ট বোঝান। বেশি কথা নয়। তোমাকে ঠিক ধরিয়ে দেবেন আর কি। আর মাঝে মাঝে যখন অভিনয় করে দেখান সে তো মস্ত লাভ। উনি কিন্তু কখনো ওঁর মতোই করতে বলেন না। তুমি করবে তোমার মতো। শুধু ধরিয়ে দেবেন, নাটক পরিচালনার বিষয়টিকে।' রামকিঙ্কর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন ব্যাপারটি। বলেছেন– 'নাটক জিনিসটা কী রকম জানো অনেকগুলো ঘোড়াকে একটা গাড়িতে জুতে দিয়ে চালানো। গাড়ি হাঁকানোর জন্য এলেম চাই হে।' রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন সঙ্গীতভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', ইংরাজি নাটক 'পোয়েটেটার্স অফ ইস্পাহান' নাটকে এবং 'রক্তকরবী' ও অবনীন্দ্রনাথ রচিত 'লম্বকর্ণের পালা' নাটকে। বস্তুত এই চারটি নাটক পরিচালনার কথাই জানা যায়।

রামকিঙ্কর তাঁর মূর্তি নির্মাণ ক্ষেত্রের মতো এখানেও সহযোগিতার প্রসারিত হাত দেখতে পাননি। এ ব্যাপারে তাঁর ছাত্র কুণালকান্তি সাহার লেখনী থেকে জেনে নিতে পারি যে, তিনি লিখেছেন– 'রামকিঙ্করদাকে দুটো নাটক করতে দেখেছি। একটি অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণের পালা', অন্যটি ইংরাজি নাটক 'পোয়েটেটার্স অফ ইস্পাহান'। দ্বিতীয় এই নাটকটি করার সময় বিশ্বভারতী থেকে

তাঁকে কোন রকম সাহায্য করতে রাজি না হওয়ায় সেদিন তিনি বলেছিলেন– 'আমি রামকিঙ্কর, রামের বাহন হনুমান– আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল কলাভবনের গাছতলায়। সাধারণ মঞ্চের পিছনে নীলরঙের একটা পর্দা টাঙানো হয়েছিল কেবল। বিজলী বাতির পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছিল হ্যাচাকের। ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক-আশাক চেয়ে চিন্তে তৈরি হয়েছিল নাটকের পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জার সাজ-সরঞ্জাম।'

রামকিঙ্কর তাঁর অভিনীত নাটক বিশু পাগলার চরিত্রে গানও গেয়েছেন। তো রামকিঙ্করের গান গাওয়া ছিল তাঁর শিল্পমনস্কতার আরেক অচ্ছেদ্য দিক। আসলে ছবি ভাস্কর্যের নির্মাণ প্রচেষ্টার সাথে গানের একটা আত্মিক সম্পর্ক থাকেই। তাই রামকিঙ্করের মত একজন শিল্প-ব্যক্তিত্বের কাছে গান যে প্রিয়তর হবেই তাতে কোনো বিতর্ক থাকে না। গানের প্রতি অদম্য ঝোঁক ছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই। ছবি ভাস্কর্যের বিষয়ে যেমন তিনি প্রেরণা পেয়েছেন পাড়ার অনন্ত জ্যাঠার (পাল) ও পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরদের থেকে, তেমনি নাটকের তালিম নিয়েছেন কালীতলা ড্রামাটিক ক্লাবের ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, আর সঙ্গীতে সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রলাল দত্তের কাছ থেকে। তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা বলতে ঐ যাতায়াত ছিলো তাঁর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে। পরবর্তী কালে রাজেন্দ্রলাল দত্তকে লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে তাঁর সঙ্গীতানুরাগের গভীরতা জানতে পারা যায়। তবে আপাতত একটু পিছনে যাওয়া যাক, যখন তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছাত্র হয়ে এলেন এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে মিলিত হলেন, সে দিনের ঘটনা তাঁদেরই একজন প্রভাতমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন– 'ঘরে আমাদেরই পাশে তক্তাপোষে স্থান হল তার। সুকণ্ঠ না হলেও তার খুব গান গাইবার ঝোঁক ছিল। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল গ্রামের দিকে মাঠের মধ্যে তাকে গলা সাধবার পরামর্শ দিতে সে মেনে নিয়েছিল। দৈনিক একবার করে তার দুরাগত কণ্ঠধ্বনি আমরা শুনতে পেতুম।' বাঁকুড়ায় রামকিঙ্করের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের কাছে যাতায়াত হয়ত তেমন কোন তালিম নেওয়া হয়নি তবে, বোঝা যায় কিছু গ্রামার বা রাগের বিষয় বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নিয়েছিলেন যা তিনি ঐ খালি গলায় রেওয়াজের মধ্য দিয়ে আয়ত্তে আনবার প্রয়াস করতেন। ছবি-ভাস্কর্য-সঙ্গীত হল একই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু প্রকাশের রকম-ফেরের বিষয়। তাই আভ্যন্তরীণ যে সুরের অনুরণন রামকিঙ্করের ছিল সেই সুরের স্বতঃস্ফূর্ত রোমন্থনের কারণেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রতনপল্লীর মাটির বাড়িতে থাকাকালীন হৃষীকেশবাবুর মেয়ের বিয়েতে সানাই বাদকের সানাই-এর আলাপ শুদ্ধভাবে গেয়ে সংশোধন করে দিতে দেখেছিলেন হৃষীকেশবাবু। বিয়ের তিনদিন তিনি গাছতলা ছাড়েন নি। এছাড়া

হৃষীকেশ চন্দ মহাশয়ের বাড়িতে আয়োজিত সান্ধ্যকালীন বিভিন্ন গানের আসরে সুরের ভুল-ত্রুটিও রামকিঙ্কর পরের দিন সকালেই গিয়ে বলে আসতেন এবং কাঁপা কাঁপা গলায় গেয়ে শুনিয়েও দিতেন। এমনই ছিল তাঁর সুরের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার টান বা একাত্মতা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। এই গানে তিনি পেয়েছেন জীবনবোধ তথা আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম। তাঁর ছাত্র মিঠারাম ধরমানী বর্ণনা করেছেন– 'মূর্তি শিল্পের স্টুডিওর কাজ সেরে তিনি বাইরে একটি গাছের তলায় বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। কলাভবনের কাছেই একটি কোয়ার্টারে তিনি থাকতেন। মাঝে মধ্যে পূর্ণিমা রাতে তিনি বাইরে বসে এত জোরে গান গাইতেন যে তা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেত। তিনি দুঃখে সুখে গেয়েছেন রবীন্দ্রগান। এই গানই ছিল তাঁর কাছে আশ্রয় স্বরূপ। বহু ক্ষেত্রে দিশা পেয়ে যাওয়া রবীন্দ্রগানের মধ্যে রক্তকরবীর বিশু পাগলার গানই ছিল মূলত– রামকিঙ্করের অন্তর বোধের প্রকাশ– "তোমায় গান শোনাব / তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখি / ওগো ঘুম ভাঙানিয়া / চমক দিয়ে তাই তো ডাক / বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক / ওগো দুঃখ জাগানিয়া।" রবীন্দ্রগানেই তিনি নিজেকে চিনেছিলেনও। তাই বলেছেন গুরুদেবের গান মনে হয় চোখ খুলে দেয়। তাঁর আরেক ছাত্র অমৃতলাল বেগড় লিখেছেন– 'প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্টুডিয়োর বাইরে একটি গাছের তলায় তক্তপোষে বসে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তিনি গাইতেন পরিষ্কার এবং উচ্চস্বরে পূর্ণশক্তি দিয়ে। তাঁর স্বরের আরোহ অবরোহ কলাভবনের নীরব নিস্তব্ধ পরিসরকে মাধুর্যে ভরিয়ে দিত। আমার প্রতিদিনের প্রধান ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল তাঁর সন্ধ্যাকালীন গান। আমি ভাবতাম মানুষের গলা থেকে এ হেন স্বর বের হয় কী করে?'

রামকিঙ্কর যৌবনে ধাক্কা খেয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে। যৌবনের স্বপ্নমেদুর রঙিন দিনে কোনো আকাঙ্ক্ষিত জনকে না পাওয়ার বেদনা তাঁকে তাড়া করেছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি ঐ রবীন্দ্রগানেই তাঁর ঐ স্মৃতির গায়ে হাত বুলিয়েছেন বারবার। আর অবুঝ শিশুর মত কেঁদেছেন। শিল্পী শবরী রায়চৌধুরী লিখেছেন– 'নিজস্ব স্টাইলে গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। এক একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত উনি এমন ভাবে গেয়েছেন যে, রবীন্দ্র ভক্তরাও কেউ এমন গাইতে পারেনি। এইসব গানে এমন প্রাণঢালা দরদ ছিল যেটা আর্টকে ছাপিয়ে গেছে।' সেই কিঙ্করদাকে যখন 'পদ্মভূষণ' দেওয়া হল উনি নিজেই 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী'র তফাৎ করতে পারছেন না। 'কি যে আমাকে দেওয়া হচ্ছে।' একটা গান গাইতে বলা হল। তিনি গাইলেন– "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।" এই গানটা গাইতে খুব ভালোবাসতেন। আর গাইলেই দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসতো জল। রামকিঙ্করের

গান এই লেখকেরও কানে বাজে। সে এক সোনালী স্মৃতি। ছেলেবেলায় রতন পল্লীতে তিন বছর থাকার সুবাদে। রাত্তির তাঁর উদাত্ত গলায় গাওয়া 'নিদারুণ অকরুণার সাথেরে পিরিতি করিলাম না বুঝিয়া।' এবং 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো / এলো আমার মনে / কোন সে কবির ছন্দ বাজে। / ঝরঝর বরিষণে বহুযুগের।' এছাড়া 'ঘর করিলাম বাহির সইরে। / বাহির করিলাম ঘর। / পর করিলাম আপন বন্ধু। / আপন করিলাম পর।' সেদিনের সেই সন্ধ্যাকালীন গান মা বাবার সাথে বসে শুনতে গিয়ে দেখেছি রতনপল্লীর নিঝুম নিঃস্তব্ধ পরিবেশটা কেমন তাঁর উদাত্ত উচ্চগ্রামের গলায় গাওয়া গানে সচকিত হয়ে উঠত। বাঁচার এক অন্য স্বাদ অন্য এক মধুর তাৎপর্য নিয়ে মূর্তমান হয়ে উঠত অন্ধকার চারপাশটা। এই লেখকের কাছে সে এক পরম প্রাপ্তি, ওই বিরল এক প্রতিভার নানান অভিব্যক্তির কোনো বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকাটা।'

তো বাঁকুড়ায় এলেও তিনি তাঁর ছেলেবেলায় বন্ধুদের সাথে গল্প গুজব আড্ডা ও গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝে গানেরও মজলিস বসাতেন। সেইসব গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতই থাকত প্রায় সবকটাই। বাসুদাকে (বাসুদেব চন্দ্র) 'গীতবিতান' আনতে বলতেন। তারপর গাওয়া হত 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' 'এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজি খানি হাতে করে।' 'যদি বারণ করো তবে গাহিব না। যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না'– প্রভৃতি। রামকিঙ্করের এই সঙ্গীতপ্রীতি বিষয়ক আলোচনায় তাঁর ছাত্র দিনকর কৌশিকের কিছু অভিজ্ঞতার কথা না জানলে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ের গভীরতার সঠিক হদিশ পাওয়া যাবে না বা কিছু খামতি থেকে যাবে।

যেমন দিনকর কৌশিকের বিবরণ থেকে জানা যায় কলাভবনের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় দিনকর কৌশিক মহাশয়ের জায়গা হয়েছিল সঙ্গীতভবনে। বিখ্যাত মারাঠী সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বা ভীমরাও শাস্ত্রীর কথা মনে রেখে সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখতেই দিনকর কৌশিকের সঙ্গীতভবনে যোগদানের কথা ভেবে নিয়ে রামকিঙ্কর তাঁর কাছে এসেছিলেন 'তোড়ী' রাগ বিষয়ে কিছু শোনার জন্য। দিনকর কৌশিক লিখেছেন,. . . 'মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন আমি 'তোড়ী' রাগ জানি কিনা। খুব সংশয়ের সঙ্গে গুনগুনিয়ে আমি তাঁকে এই রাগিণীর কিছুটা শোনালাম। কিঙ্করদা ভীষণ আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। এবং মুহূর্তেই অদ্ভুত এক আনন্দে তাঁর সারা মুখ ছেয়ে যেতে দেখলাম। তিনি তাঁর গম্ভীর উদাত্ত গলায় উঁচু সুরে গেয়ে উঠলেন– 'রজনীর শেষ তারা। আঁধারের আধো ঘুমে/ বাণী তব রেখে যাও।' কিছুক্ষণ তিনি গাইলেন এবং এক সময় তাঁর ভিজে আসা চকচকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোড়ী' রাগ সম্বন্ধে গুরুদেবের গভীর জ্ঞান ছিল এবং এই গান ঐ সুরের চমৎকার মেজাজকে অবিস্মরণীয় করে

রেখেছে। এই রাগ প্রথম সূর্যের আলোয় প্রকাশিত ভোরের বন্দনা গান করে এবং যার মধ্যে পাওয়া যায় জীবন ও দৃঢ়তার বাণী। গুরুদেবের গানের মধ্যে একটা চমৎকার বন্দিশ আছে।'

এছাড়া দিনকর কৌশিকের অন্য আরেকটি বর্ণনায় বোঝা যায় রামকিঙ্করের সুরের অনুভূতি কতটা ব্যাপকতর থাকায় তিনি বিদেশের উঁচু পর্দার গুরুগম্ভীর গায়কীতে সহমত বা একাত্ম হতে পেরেছিলেন। তো সত্যজিৎ রায় সে সময় কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। বাখ, মোজার্ট, বিটোফেন, পল রবসন, শালপিয়ান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের গান সত্যজিৎ কতিপয় শ্রোতা সমভিব্যহারে শুনতেন। শ্রোতারা ছিলেন ডঃ অ্যালেক্স আরনসন, সকলো সুরিয়া, পৃথ্বীশ নিয়োগী, রামকিঙ্কর, দিনকর কৌশিক এবং সত্যজিৎ স্বয়ং। দিনকর কৌশিক লিখেছেন– 'তখন কেউ লক্ষ্য করে থাকবেন যে কী ভীষণ এক গভীর আগ্রহ আর অনুভূতির সঙ্গে কিঙ্করদা এইসব ইউরোপীয়ান সঙ্গীতজ্ঞের রেকর্ড বাজাবারে অনুরোধ নিয়ে মাঝে মধ্যেই নিজের আসন ছেড়ে উঠে আসতেন। এই সমস্ত পশ্চিমী ওস্তাদের গম্ভীর কণ্ঠের গান তাঁর উপর একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করত। তিনি প্রায়ই মিন মিনে গলায় গাওয়া গুরুদেবের গানগুলিকে সমালোচনা করে বলতেন– 'নাভিমূল থেকে রবসনের গান উঠে আসে। তাঁর সমস্ত শরীর কণ্ঠকে অনুরণিত করে তোলে। অন্যদিকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছিমছাম গায়কেরা মিহি কণ্ঠে গান গেয়ে যান। তাঁদের লাউডস্পিকার বা অন্যান্য সহযোগী বস্তুর দরকার হয়। কী অদ্ভুত পার্থক্য!'

দিনকর কৌশিক মহাশয় আরো লিখেছেন– 'আমি মনে করি তিনি বাঁকুড়ায় কখনই বাখ, মোজার্ট অথবা 'তোড়ি' রাগ শোনেননি। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি সেগুলির প্রতি সাড়া দিতে পারতেন।'

রামকিঙ্করের অন্তর্নিহিত শিল্পচেতনার গাঢ়ত্বের যে অনুরণন, ছন্দের যে প্রগাঢ় চেতনা, মনুমেন্টালি সদৃশ রূপকল্পনার বোধ– সেই বিশেষত্বের অনুরূপ উদাত্ত উচ্চগ্রামের ও গুরুগম্ভীর ভরাট গলার খোঁজ তিনি পেয়েছিলেন পশ্চিমী ওস্তাদ গায়কদের কাছে। আর সুরের বাঁধা গণ্ডী পেরিয়ে ক্লাসিকাল গানের যে ইনফিনিটিকে ধরার চেষ্টা– সেখানেই তিনি তাঁর বাঁধনহীন মানসিকতায় একটা সাযুজ্য অনুভব করে তার ভক্ত হয়ে পরেছিলেন। ঠিক যেমন তাঁর ছবি ও ভাস্কর্য গ্রামারের যাবতীয় কঠিন বাঁধন খুলে ফেলে অ্যাবস্ট্রাকটের ভাবনায় পুরোপুরি ফ্রিডমের দিকে চলে গেছে বহু ক্ষেত্রেই। শবরী রায়চৌধুরী লিখেছেন– 'ক্লাসিকাল গানে ওঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিঙ্করদার ভিতর ফর্ম, স্ট্রেংথ, স্ট্রাকচারের যে কোয়ালিটি বা ফিগার আছে, সে ধরনের গান হলে খুব উপভোগ করতেন। এ সম্বন্ধে অনেককিছু বলেছেন।' অনেকবার বলেছেন– 'তোমার কাছে ভগনার আছে ভাগনার? ভাগনার

আমার খুব ভালো লাগে। ভাগনারের মিউজিক দারুণ। সত্যজিৎ আমাকে অনেক শুনিয়েছে। তুমি আমায় একটু ভাগনার শোনাও।'

মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে ঐ রকম ভল্যুমে গেয়েও ফেলতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম যে দুই সম্রাজ্ঞী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রের গায়কীতে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মেলবন্ধনের অনুভূতি। তিনি বলেছেন– 'সুচিত্রা আর মোহর আমাকে গান শুনিয়েছে খুব। আমাকে ভালো লাগার গান কত যে শুনেছি ওদের গলায়। বেশ গলা ওদের। খাসা গলা। আর গায় কী তন্ময় হয়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীত ওদের গলায় বাসা বেঁধেছে।'

বাঁকুড়ায় থাকাকালীন ছেলেবেলায় সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবাদে ক্লাসিকাল গানের রাগ-রাগিণীর সাথে পরিচয় ছিল তাঁর। তাঁর সহজাত প্রবল বোধ শক্তি দ্বারা যে সব মনের কোণে অধিগত করেছিলেন অনুমান করা যায়, যেহেতু প্রতিভাধরেরা অল্প বয়সেই ক্ষুরধার মেধা ও পরিণত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হয়ে থাকেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় তাঁর যে সময়ের আঁকা 'লবকুশ সীতা', রাধাকৃষ্ণের ওয়াটার কালার ছবি এবং ভারতমাতা ও হাঁসের পিঠে বসে উড়ে যাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ড্রপসিন দেখলেই। তো পরবর্তী কালে তিনি পূর্বোক্ত ঘটনা, দিনকর কৌশিকের কাছে 'তোড়ি' রাগ বিষয়ে জানতে চাওয়ার মত ক্লাসিক সঙ্গীতের বিষয়ে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ গুণীজনের কাছে গিয়েছেন অনুমান করা যায়, যেমন বাঁকুড়ার রাজেন্দ্রলালের কাছে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং সঙ্গীতের নানান বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনাও হয়েছে। যার দু-একটি প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত এসবই তিনি করেছেন নিজের অনুসন্ধিৎসু মনের তৃপ্তি মেটানোর প্রয়োজনে, যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর অগোচরে যেভাবে তিনি উনপঞ্চাশ সাল থকে একান্ন পরপর ক'বছর প্যারিসের প্রদর্শনীতে ছবি ও মূর্তি পাঠিয়েছেন। এবং পিকাসো, মাতিসের সঙ্গেও তাঁর ছবি টাঙানো হয়েছে। তো সে হল রামকিঙ্করের আরেক অজানা অধ্যায়। এখন এখানে শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলালের সাথে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার কয়েকটা উক্তি তুলে ধরা যাক। তিনি ১৮.০২.৬২ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিতে লিখেছেন–

শ্রদ্ধেয় রাজেনদা,

. . .যেটা বলা হয় নাই সেটাই এই চিঠিতে লিখছি। ১. Staff Notetion অনেকের ধারণা Notetion -এ প্রত্যেক form ধরা পড়ে। সেটা আমাদের সাধারণ Notetion-এ ধরা পড়ে না। ২. আপনি সেদিন গোঁসাইজির গানটি গাইলেন তার স্বরলিপি একমাত্র Staff Notetion এ সম্ভব সব Veriation নিয়ে। মানে কথা আমাদের তথাকথিত Notetion একটি মোটামুটি Form দেওয়া হয়। Staff

Notetion আরও ভেতরে যায়। Up ward case Down Ward Case গীতিকারী জোর এবং কম বড়ো লাইন ইত্যাদি। ৩. এই সম্বন্ধ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনার অভিজ্ঞতা এবং চেতনা সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ নাই। আমার অনুরোধ হচ্ছে আপনি যদি এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দেন। Staff Notetion টার একটা ব্যবস্থা করেন দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য. . .। ইতি রামকিঙ্কর।

অন্য আরেক চিঠিতে লিখলেন–

শ্রদ্ধেয় শ্রী রাজেনদাদা

. . .Staff Notetion সম্বন্ধে যেটা লিখেছিলাম সেটা একটু বিস্তারিত ভাবে লিখতে গেলে যা দাঁড়ায় আমার মতে সেটা হচ্ছে গায়কীর কথার যেটা আমাদের সাধারণ স্বরলিপিতে সাধারণত থাকে না। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া হচ্ছে। তাল থেকে স্বর থাকে কিন্তু গায়কীর আভাস থাকে না। Staff Notetion-এ এটার একটা মোটামুটি আভাস থাকে। এর মধ্যে আরো কিছু চিহ্ন থাকে তাতে করে একটা ব্যবস্থা হয়। সেই জন্য আজকাল রবীন্দ্রনাথের গানেরও Staff Notetion-এর দরকার হচ্ছে। সেদিন ওখানে গুরুজির (গোঁসাইজির) যে গানখানি শুনলেন তার গায়কী কী অদ্ভুত। সেটা স্বরলিপিতে আসে? এটা Original মানে গায়ক যেটা গাইছেন তার নিজের ভাবে এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশী Composare-রা সেটাই রেখে গেয়েছেন তাদের স্বরলিপিতে। এটাই আমার বক্তব্য ছিল। ...

আপনার স্নেহের রামকিঙ্কর।

রামকিঙ্করের সঙ্গীত প্রীতির এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা ছবি, ভাস্কর্য, নাটক ও মঞ্চ ভাবনার গাঢ়তার মত এ বিষয়েও বোধের এক বিশেষ মাত্রায় যে তাঁর অবস্থান ছিল তা জানতে পারি। সুর ও ছন্দের এ হেন সুবিস্তৃত উপলব্ধিই তাঁকে সুস্থ সংস্কৃতির দিকেই পরিচালিত করেছিল। আর এটাই স্বাভাবিক। যেমন এ ব্যাপারে সুউচ্চ চূড়ায় আসীন রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল সাহিত্য-সমাজের দর্পণ হলেও সমাজের অনাচার ব্যাভিচার প্রভৃতি পচাগলা দিকগুলিকে যতদুর সম্ভব এড়িয়ে গঠনমূলক ভাবনাই মানুষের কাছে পরিবেশন করা। কিন্তু আজকের দিনে যন্ত্রসর্বস্ব পৃথিবীতে যন্ত্রবৎ অধিকাংশ মানুষের কাছে যথার্থ সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মনে হয়। কিন্তু সুস্থ-সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব গঠনে রুচিশীল শিল্প সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রয়োজন অপরিহার্য যা মানুষকে গড়ে তোলে, বিবর্তিত করে। মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে দেয়।

তাই রামকিঙ্করও শিল্পী, সঙ্গীতকার ও সাহিত্যিকদের আহ্বান জানিয়েছেন। যেহেতু সুরকে বিদায় দিলে অ-সুরের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তাই মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় সুসংস্কৃতির নির্মাণ ও প্রসার একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে গানের

বোধ হয় চট্‌জলদি একটা ভূমিকা আছে। তিনি তাঁর গভীর প্রত্যয় থেকে উঠে আসা এক সাংঘাতিক কথা আমাদের শুনিয়েছেন। বলেছেন– 'গান না গাইলে বাঁচবে কী করে? আজকের এই উগ্র উন্মত্ত ও ডামাডোলের পৃথিবীতে গান একটা বিরাট আশ্রয় বইকি!' সত্যি কী গভীর দর্শন রামকিঙ্করের।

বহুমুখী প্রতিভায় উদ্ভাসিত রামকিঙ্কর যে ছবি ভাস্কর্যের মত গানের প্রতিও বিশেষ মনস্ক ছিলেন তা বোঝা যায়। বস্তুত যেখানেই তিনি মনোযোগী হয়েছেন সেখানেই একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে তার উচ্চতর মাত্রার খোঁজে নিরন্তর প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে, তেমনি ছবিতে। কিন্তু মাধ্যম হিসেবে ভাস্কর্য যেহেতু ছবির থেকে অনেক বেশি দুরুহ এবং কষ্টসাধ্য, যেখানে ওজন, মাপ, মাত্রা ও শক্তি এই সমস্ত ভাস্কর্যের গুণগুলির মুখোমুখি হয়ে উপায় এবং উপাদানের নিপুণতার মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত করতে হয়, প্রকৃত পক্ষে সেখানেই অমানুষিক পরিশ্রম ও সহজাত উচ্চগ্রামের বোধশক্তিতে রামকিঙ্করের একশ ভাগ সাফল্যে উত্তীর্ণ হওয়াতেই তাঁর নানান বৈচিত্র ও বিষয়ের নিজস্ব ঘরানার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবির জগৎ ম্লান হয়ে পড়েছে, যদিও তাঁর বহু বহু ছবি বলে দেয় তিনি কালজয়ী চিত্রীও। ছবির বিষয় ও বৈচিত্রের খোঁজে তিনি শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামগুলি ছাড়াও বেরিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন প্রদেশে। প্রথমদিকে তিনি ওয়াশ এবং টেম্পারার কাজ করেছেন। কিন্তু ওয়াশের বাঁধা পথে তিনি চলেননি। সেখানে তিনি অবনীন্দ্র এবং নন্দলাল থেকে বেরিয়ে এক পৃথক আমেজ এনেছেন। তাঁর ছাত্র অমৃতলাল বেগড়ের বক্তব্য থেকে জানা যায় শান্তিনিকেতন থেকে মাসোজী চলে গেলে ওয়াশ পেন্টিং ক্লাসের দায়িত্ব রামকিঙ্করকে দেওয়া হয়। অমৃতলাল বলেছেন–'তিনি ওয়াশ পেন্টিংও শেখাতেন সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে। শীতের সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন খেজুর বনে গুড় তৈরির বিষয় নিয়ে ছবি করতেন রঙের মাধ্যমে অনেক ঘসামাজা করে শেষে নিজের টুথ ব্রাশ ব্যবহার করেছেন তাঁর মনের মতো effect আনার জন্য। তাঁর ছাত্র সুখেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন– 'হঠাৎ একদিন মাস্টারমশাই কিঙ্করদার কাছে Wash technique-এর ছবি করার জন্য বললেন। আমরা শুনেও অবাক কেন না আমরা সবাই কিঙ্করদাকে জানতাম বড়ো ভাস্কর হিসেবে...। তার পরদিন থেকেই কিঙ্করদার কাছে ছবি করার সুযোগ পেলাম। তার ওয়াশ ছবির মধ্যে অন্য আরেক ঘরানার ছোঁয়া। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল থেকে একেবারে অন্য বৈচিত্রের ভরা এক নতুন Style।' এ কথার প্রমাণ আমরা আরো দেখতে পাই শিমুল-গাছের তলায় দণ্ডায়মান সাঁওতাল প্রেমিক-প্রেমিকার ছবিতে। যেখানে বসন্তের পরিবেশকে তার সমগ্রতায় দর্শকের সামনে তিনি ধরে এনে হাজির করেছেন। হাকুসাই নামে একজন প্রাচীন জাপানের



রামকিঙ্করের মাতা সম্পূর্ণা দেবী (কাগজের উপর জলছবি) .৫ x ২৫.৬ সেন্টিমিটার



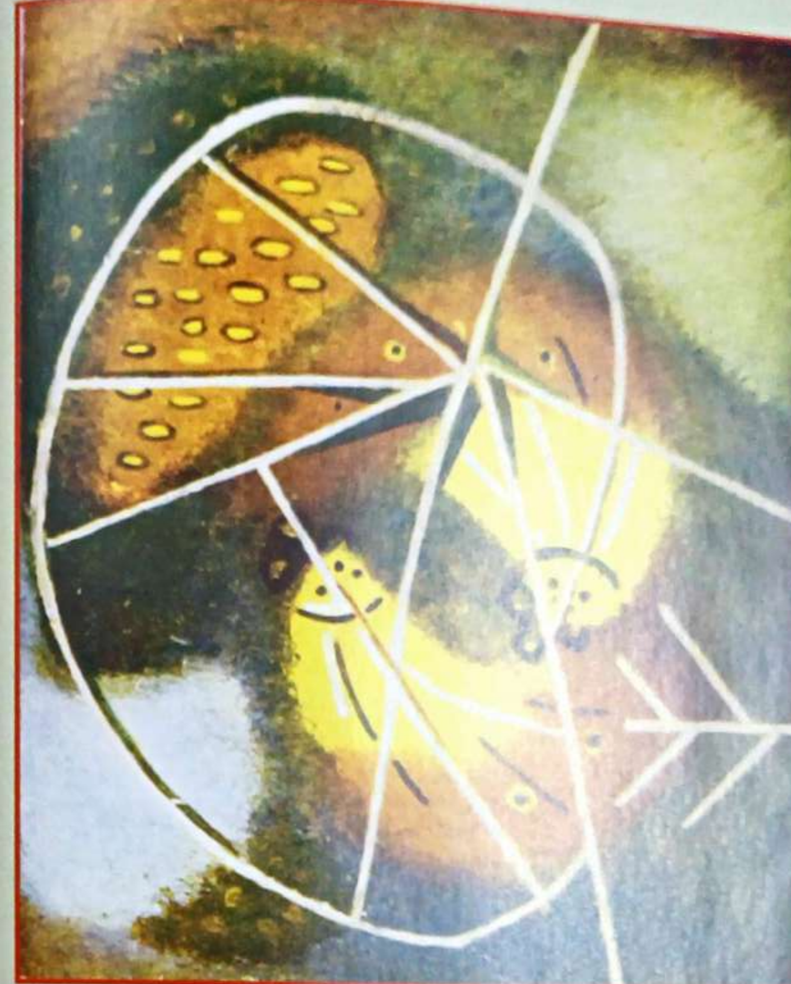
অনামা (ঝড়ের পরে), চারের দশকে আঁকা, তৈলচিত্র



মেয়ে ও কুকুর। পুর্ব্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত ভাদ্র ১৩৫৫



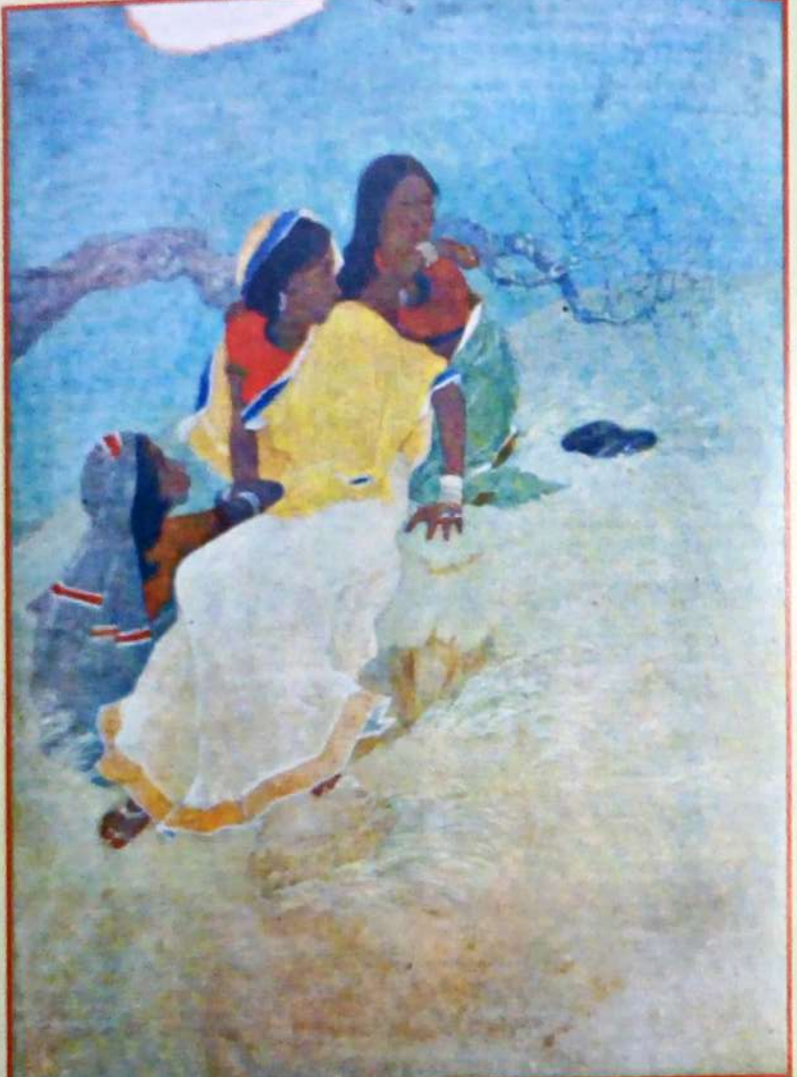
পুনর্মিলন।। গীতগোবিন্দ।। জলরঙ, প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯২০



শীত।। ভূচিত্র



মিস মিলওয়ার্ড-এর ক্লাসরুম
বাঁদিক থেকে রামকিঙ্কর দ্বিতীয়



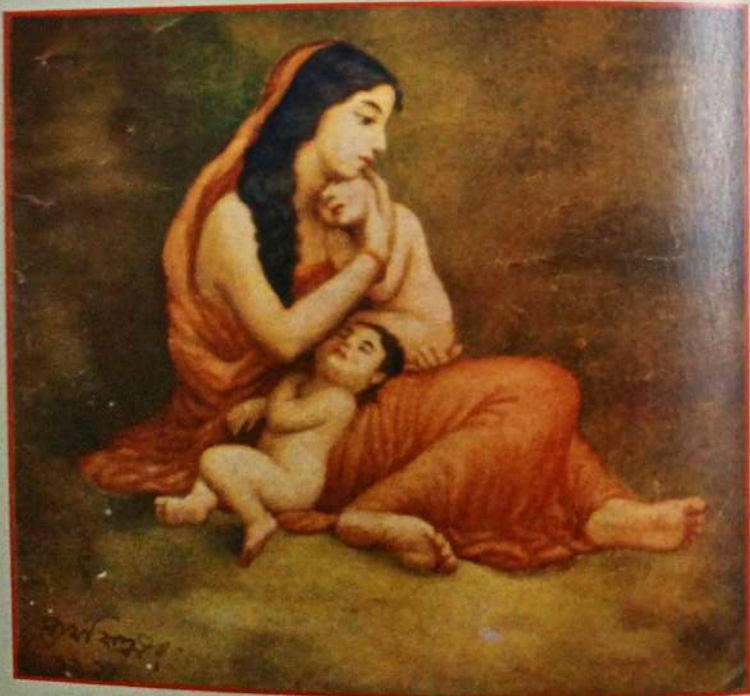
অনামা।। তারিখহীন।। কাগজের উপর জলরঙ



বিনোদিনী, তৈলচিত্র, ১৯৪৮



শিক্ষক রামকিঙ্কর : মডেল নিয়ে কাজ করা শিক্ষা দিচ্ছেন, মূর্তি হাতে পিছনে রবি পাল ও অন্যান্য ছাত্ররা।



প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত। লব, কুশ ও সীতা

প্রখ্যাত শিল্পী যিনি পাহাড় এবং সমুদ্রের ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শী ছিলন, তিনি বলেছেন– 'যে চলতে পারে না সে দৌড়বে কী করে? যে দৌড়তে পারে না সে নাচবে কী? Drawing হল ছবি আঁকায় চলার মতো। আঙ্গিকের নৈপুণ্যে দৌড়ানো। আর সার্থক ছবি হল নাচ অর্থাৎ রূপ ও রসের সর্বাঙ্গ সুন্দর ছন্দ।' রামকিঙ্করের ছবিতে বলা বাহুল্য সেই চলা, দৌড়ানো এবং নাচ আছে, যে কথা আজ শিল্পরসিক গবেষকমহলে স্বীকৃত সত্য। নন্দলাল বলেছেন– 'যে খুঁড়িয়ে চলে, সে যদি বলে আমি খুঁড়িয়ে চলছি না। এটা আমার নাচের ছন্দ, তাহলে মানবো কি করে? জানি নৃত্যের ছন্দ আয়ত্ত করা হাঁটা থেকে অনেক উঁচুস্তরের জিনিস। আমি বলব আগে কয়েক পা সোজা হেঁটে দেখাও। তারপর মেনে নেব তুমি খোঁড়া নও। সত্যিই নৃত্যে পারদর্শী। কিঙ্করের কাজে হাঁটাও আছে। আবার নাচের ভঙ্গীও আছে।'

গাছপালা আকাশ, মাটি, ঋতুবদল, দিনের প্রতিটি প্রহর ও মুহূর্ত, মানুষজন ও তার কাজকর্ম, আবেগ ও নানান ভাবের প্রকাশ রামকিঙ্করের দেখেছেন তাঁর গভীর শৈল্পিক দৃষ্টিতে। বাস্তব আর শিল্প এই যে দুই আলাদা জগৎ সেখানে বাস্তবকে অত্যন্ত নিপুণতায় শিল্পে উত্তরণের কৌশল ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত মহিমাময় শিল্প অবলোকনের বিশেষ পারদর্শীতাও তাকে সমগ্র ভাবে চয়নের ক্ষমতাই যেন ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র নিয়তি। শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– 'বাস্তব বস্তুকে প্রদক্ষিণ ও তা পটে এসে পড়ার সময়ের মধ্যেই স্টাডি ড্রইংয়ে রূপান্তর হয়ে এক অসাধারণ রূপে নিজেকে উচ্ছল করে সোচ্চার হত।' আরও বলেছেন– 'কিঙ্করদার চটজলদি কাজগুলিকে স্কেচ বলে পরিচিতি দিলেও এগুলি সবই পূর্ণ চিত্রের মর্যাদার উত্তীর্ণ। এগুলিকে খসড়া কাজও বলা চলে না।' রামকিঙ্কর চিত্রী হিসেবে কতদূর সফল তা প্রকৃত শিল্পীর চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যায়। তাঁর কাজের তীক্ষ্ণতা, বলিষ্ঠতা, সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাব, গতির প্রাচুর্য এবং আবেগ, বৈচিত্র আর নানান ভাবনার প্রয়োগ দর্শকের চোখের শিরায় টান ধরিয়ে দেয়, টনটন করে ওঠে– মনে হয় কী অমানুষিক কাজ! এত বিষয় ও বৈচিত্রের সমাহারের সাথে নানান ইজমের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহ্যকে অটুট রেখেই। তথাপি তিনি চিত্রী হিসেবে যোগ্য মর্যাদায় আসতে পারলেন না। যদিও অসামান্য চিত্রী হিসেবেও তাঁর নাম মহাকালের খাতায় লেখা হয়ে গেছে। তাই আগামী প্রজন্ম চিত্রী রামকিঙ্করকে যে খুঁজে বের করবেই তা বুঝতেই বিভিন্ন মনীষী শিল্পীদের উদ্ধৃতি তুলে ধরার এই উদ্যোগ। যেমন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– '. . . চাক্ষুষ স্থূলরূপকে অতিক্রম করে বিভাসিত হয়েছে অন্তররূপের, যেখানে বিষয়ের কুশীলবেরা প্রাণ নিয়েই নড়াচড়া করেছে।' এছাড়া তাঁর আরেক বক্তব্য 'কালো

কালির কাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব– বস্তুর প্রতি শিল্পীর একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মননের ছায়াপথ।'

রামকিঙ্করের স্কেচ ও সাদাকালোর রেখাভিত্তিক কাজ এবং পূর্ণ জলরঙের কাজগুলিতে বহুবিধ বিষয় ভাব ও করণ-কৌশলের সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। কখনো বর্ণ প্রয়োগের পর তীক্ষ্ণ কালো রেখার প্রয়োগ, তো আবার কখনো কালো দিয়ে এঁকে, পরে বর্ণের প্রলেপ। কখনো রঙ সোজা টিউব থেকে কাগজ আবার কখনো রঙের কেকগুলি জলে ডুবিয়ে কিংবা প্রয়োজন মাফিক কাগজ ভিজিয়ে কেক কালার ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তুলির পিছনের ডাঁটিটি কালির দোয়াতে ডুবিয়ে সরাসরি কাজ। যার ফলে এসেছে প্রচণ্ড গতি এবং তীক্ষ্ণতার আমেজ। বর্ণ সংমিশ্রণের চাইতে মূল বর্ণকে রক্ষা করেছেন বেশিরভাগ। কারণ তিনি বলতেন– '. . .না হলে সব মিলেমিশে একটা থার্ড কালার হবে, যেটা জবরজঙ্গ হয়।'

তবে অন্যরকমও দেখা গেছে যেখানে রঙ আলাদা আলাদা অস্তিত্বে জেগে না উঠে একসঙ্গে মিলে মিশে রহস্যময়তা তৈরি করেছে। বর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আকারের ডৌলগুলিকে সুনিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা গতিকে ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, কিউবিজম, ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম ভাবনার প্রয়োগে বক্তব্যকে আধুনিক রূপভাবনায় প্রকাশ এবং কখনো আবার মিনি-মাইজেশনের পথে এগিয়ে তিনি চলে গেছেন বিমূর্তের জগতে। বাস্তবগন্ধী অতিনাটকীয় মাধুর্যের নিছক বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত ছবিকে ছুঁড়ে ফেলেছেন তিনি। দুর্দম আবেগ ও সচেতনতার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বহুস্তর অতিক্রম করে তাঁর ছবি পরিণত হয়েছে, আবার কখনো আবেগে ভেসেও গেছেন– যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর আবেগকে সংযত করেছেন। বাস্তব কখনো রূপকে, আবার কখনো রূপকথার রূপান্তরিত হয়েছে। সৌন্দর্য ও ভয়াবহতার যুগলবন্দীতে তার ছবির ভাবনা কোথাও তো আবার অনৈসর্গিক মূর্তিতে রূপায়িত হতে দেখা যায় এই বাস্তবের রক্তমাংসের মানুষই। এসবই রামকিঙ্করের চিত্রকলার অসাধারণত্বের নমুনার সামান্য বিবরণ মাত্র।

এছাড়া আরও আছে, যেমন কে. জি. সুব্রামণিয়ামের কথা বা ব্যাখ্যা তুলে ধরা যায়। তার আগে বলে নিই কলাভবন প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে পাশ্চাত্যের শিল্প চেতনার অসাধারণত্বকে স্বীকার বা বৈরীতা কোনোটাই ছিল না সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের, বরং তা অন্যভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন তাঁরা সে সব এবং অনুসরণ করেছেন নিজেদের স্বীকায়তাকে। কে. জি. সুব্রামণিয়াম এ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'ইম্প্রেশনিজম বা কিউবিজম থেকে তারা (কলাভবনের শিল্পীরা) রস আহরণ করেছে ঠিকই কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে তা সিঞ্চন করেছে এক্সপ্রেশনিজমে। নিছক অনুসরণ নয় পুরোপুরি আত্তীকরণ যা করেছেন রামকিঙ্করও।' কিন্তু তিনি

বলেছেন '. . .রামকিঙ্করের চেতনা কিউবিজমের অবজেক্ট স্পেসের গণ্ডীতেই কেবলমাত্র আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। তিনি সেখান থেকে এগিয়ে গেছেন গভীরতর জগতে, অবজেক্ট স্পেসের রূপরীতি বিশ্লেষণ করেছেন, ভেঙেছেন, জন্ম দিয়েছেন তাদের নবরূপের নতুন ভঙ্গিমা ও দিশার। বস্তুত রামকিঙ্কর আমাদের যা দিয়ে গেছেন একজন প্রতিভাধর শিল্পীর মনের অবেচতন ও অচেতন স্তরের সূক্ষ্মতম চেতনা ও বোধের বহিঃপ্রকাশ তা। সেখানে নেই কোনো ফাঁকি কিংবা গোঁজামিল। বলতে গেলে একেবারে নির্ভেজাল ও খাঁটি জিনিস। শিল্প ও রামকিঙ্কর যেন সমার্থক। যাঁরা, তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন রামকিঙ্করের সাদামাটা পোশাক-পরিচ্ছদ ও চেহারার অন্তরালে বিরাজ করত এক অতি লৌকিক সত্তা। তাঁকে শুধু মনীষী বললে সবটা বলা হয় না, ঋষিও বলতে হয়। একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যেহেতু নিজের চোখে দীর্ঘদিনের দেখার অভিজ্ঞতাও তো আছে।

'কি একাগ্রতা কি মনন। বারবার মগ্ন হয়ে পড়া। প্রতিনিয়তই অপছন্দ তাঁকে ব্যস্ত করে চঞ্চল করে তুলত। আমাদের সামনেই গড়ে উঠতে তো দেখেছি ঐ কালজয়ী মূর্তিযুগল (যক্ষযক্ষী)– এছাড়া আরো অনেক সৃষ্টি যা এমন ভাবেই এমন মগ্নতার মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।'– বলেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা রামকিঙ্করকে কতটুকু বুঝেছি কিংবা বোঝবার মত মানসিকতাই কি আমাদের আছে? বরং নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা অথবা কৌশলে হেয় প্রতিপন্ন করার কারসাজি করেই চলেছি আমরা। কিন্তু অনুভবী মানুষ যাঁরা আছেন, তাঁরা তো তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তি ও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠার কথা নানান উদাহরণ সহ তুলে ধরেছেন, কিন্তু আমরা শিক্ষিত হচ্ছি কই? তাই আবারও বলতে হয় রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– 'মানুষটির সম্পর্কে যে ভাবে আমাদের ভাবনা কাজ করছে তা কেবলই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও হেয় করেই চলেছি।' বস্তুত সমকালের এটাই দোষ– যা আবার রামকিঙ্করের বেলায় পূর্ণগ্রাসের আকারেই দেখা যাচ্ছে। তাই এই সময়ে দাঁড়িয়ে রামকিঙ্করের যথার্থ পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখতে পাওয়া সুদূর-পরাহতই বলতে হয়। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই ফিরে আসতে হয়, যেখানে তিনি বলেছেন– 'এ কিঙ্করদা বুঝতে পঞ্চাশ বছর সময় নিল। আরো বোঝা তো আছে। যতদিন কাটছে ততই বুঝছি সাধারণ মানুষের কাছে ঐ অসাধারণ মানুষটির সত্যিকারের ছবি এখনো পৌছায়নি।'

বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের গৌরব যে দুই দুর্ধর্ষ প্রতিভা বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর দু'জনেই ছিলেন পরস্পরের কাজের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। যেমন রামকিঙ্কর বলেছেন– 'বিনোদ খুব বড় দরের আর্টিস্ট অনেকে তেমন টের পায়নি। প্রথমটার হয়ত পাওয়া শক্ত।' বিনোদবিহারী রামকিঙ্করের শিল্প প্রতিভা বিষয়ে

বলেছেন– 'আমাদের কিঙ্করদা ট্যালেন্টেড বললে অপমান করা হয়, ও হলো জিনিয়াস। পৃথিবীতেই এমন শিল্পী হাতে গোনা যায়।'

কে. জি. সুব্রামণিয়াম লিখেছেন– 'তাঁর ক্ষমতা, ভিন্নতা, কাজের ভিতরের জটিলতা আরো অনেক বেশি বিচার এবং বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।. . . এত বহুমুখী প্রতিভা এবং চরিত্র নিয়ে এইরকম শিল্পী আমরা আর সহজে ফিরে পাবে না।' আরো বলেছেন– 'তিনি খুব বেশিরকম ভাবে মানুষই ছিলেন কিন্তু চিরাচরিত পার্থিব মানুষের একটু উপরেই চলে গিয়েছিলেন তিনি।'

পরিশেষে রামকিঙ্করের সমগ্র শিল্প-ভাবনায় বাঁকুড়ার অনন্ত পাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-নন্দলাল ও বিদেশী শিক্ষকদের সান্নিধ্য, এছাড়া বহু বইপত্র থেকে বিদেশী ছবি ও ভাস্কর্যের করণ-কৌশল, চিন্তাভাবনা দেখা ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিজের সহজাত গাঢ় বোধ দিয়ে নানান টেকনিক স্টাইল , ট্রিটমেন্ট, এপ্লিকেশন ইত্যাদি বিভিন্ন করণ-কৌশল অধিগত করে পরিশেষে যে স্বতন্ত্র হওয়ার ভাবনায় নিজস্ব শৈলী, টেকনিক নানান রূপকল্পের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে অধিগত জ্ঞান ও নিজস্ব নতুনভাবনাকে এক সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং চূড়ান্ত ভাবে সফল হয়েছেন– সেই শিল্পী ভাবনার তুরীয় স্তরে পৌছে তিনি বুঝেছিলেন শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে রহস্যময়ী মিথ্যামায়া। কিন্তু জীবনকে তা ভরপুর ও সার্থক করে তোলে। বুঝেছিলেন 'আর্ট মূলতঃ যুক্তিবিহীন, কারণবিহীন, চিরদিনের ডিস-স্যাটিফ্যাকশন অহৈতুকী।' অহৈতুকী বলতে তাঁর ভাবনা অনুযায়ী বলা যায় ছবি ও মূর্তিতে যে অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণকে ধরার চেষ্টা তথা সীমার মাঝে অসীমের মুখদর্শন। যেমন তাঁর বিমূর্ত কাজ 'বাতিদান' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন– 'নারী মূর্তি একপাশে দেখা যাবে এবং সেই নারী মূর্তির সবটা নেই কিন্তু সবটা না থাকলেও বোঝা যায়। এইরকম ভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কতকগুলো ফ্রীডম আসছে, যেগুলো সাধারণ কাজে নেই। এই ফ্রীডম ঠিকঠাক ভাবে প্রয়োগ করলে একটা অন্য ফর্ম আসছে। যেন চেনা যাচ্ছে না অথচ চেনা চেনা লাগছে। নতুন ডাইমেনশন এসে যায়। মিস্টিক ভাব আসে। অহেতুক ভাবটা বাড়ছে।'

রামকিঙ্করের ছবিতেও মূর্তিতে যা আছে তা হল মূলতঃ প্রকৃতির বাস্তব স্থূল রূপ দেখার সাথে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, এসথেটিক ট্রেনিং, আবেগ, অনুভূতি, নৈঃসর্গিক সচেতনতা ও পারম্পরিক শিল্পের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ মহেঞ্জোদাড়ো থেকে বা তিন হাজার বি.সি. থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ট্রাডিশনাল শিল্পের অভিজ্ঞতার মিলিত রূপ– তাই তাঁর এই দেখার মধ্যে ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্নের কোনো সংকীর্ণতা নেই, থাকতে পারে না এবং সেই হেতু রামকিঙ্করও কোনো ভাগাভাগি দেখতে পাননি। তিনি ঐ সবের মিলিত রূপকে একটি

'অহৈতুকীর' প্রকাশ বলে ধরেছেন তাকে একটি ইউনিটিও বলা চলে– যা পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কোনো শিল্পীর কাছেই এসে ধরা দিতে পারে ধ্রুবকের মতো একই গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যেহেতু প্রকৃতিই হল সেরা শিল্পী রামকিঙ্কর তাই তাঁর প্রখর মেধা ও অনুভব দিয়ে ঐ প্রকৃতি থেকেই মুখ্যত সবকিছুই পেয়েছেন। রামকিঙ্কর বলেছেন– 'প্রকৃতির যে 'ডিজাইন' তার ভেতরে 'স্বতঃপ্রসূত প্রকাশ', ক্রিয়েটিভিটি আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিসকভারি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, শব্দ সব তার ভেতর থেকেই।'

শিল্পবোধের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত রামকিঙ্করকে যখন প্রশ্নের আকারে চূড়ান্ত উপলব্ধির কথা তুলে ধরা হল– সব মাধ্যমের মধ্যে আর্টই একমাত্র মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে মানুষ সহজে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টাকে চিনতে পারে। তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তিনি সেই পরম অনুভূতির প্রশ্নোত্তরে বলেছেন– 'হ্যাঁ, বেশ দামি প্রশ্ন। আবার সেই অনুভূতি, জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ সব মিলিয়ে একটি 'অহৈতুকীর' প্রকাশ। যে জন্যে আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকও বেহালা বাজাতেন। দা ভিঞ্চির মতো ম্যাথেমেটিসিয়ান, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার ছবি আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।' এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ তুলে ধরা যায়। তিনি বলেছেন– 'শব্দ কেবল সত্যের একটি বিশেষ দিকই প্রকাশ করতে পারে, যেখানে শব্দবাহিত ভাষা প্রবেশ পায় না, চিত্রের ভাষা সেই বিশেষ সত্যে যেতে পারে।'

ঈশ্বরোপসনায় সাধকেরা নিবিষ্ট চিত্তে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন হন, ঠিক তেমনি রূপশিল্পের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের খোঁজে রূপকারদেরও নিজস্ব অধিগত জ্ঞানের সাপেক্ষে ধ্যানের পথে অগ্রসর হয়ে নানান আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে হয়। তাই তো রামকিঙ্কর বলেছেন– 'রবীন্দ্রনাথ যখন রূপ নিয়ে কাজ করছিলেন তখন দেখেছি তিনি নিস্তব্ধ থাকতেন। অথচ শব্দ নিয়ে তিনি প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছেন। কথোপকথনের শিল্প, সঙ্গীতের শিল্প এ দুটোই শাব্দিক। রূপশিল্পের বেলায় চুপচাপ ধ্যান।'

হ্যাঁ রূপশিল্পের বেলায় কিন্তু চুপচাপ ধ্যান। যে কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই ধ্যানই তো হল একমাত্র উপায়। যেমন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

"যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানী ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।
তেষামহঃ সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম।।"



অন্য প্রকাশ দাস

অর্থবল এবং লোকবল না থাকা দুর্বল মানুষদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং তা দেশের মানুষের, বিশেষত বিশিষ্ট মানুষদের গোচরে আনা সত্ত্বেও প্রভাবশালী কারো ক্ষেত্রে তাঁর প্রতারণার বিরুদ্ধে কিছুই যে করা সম্ভব হয় না বা ন্যায় বিচার পাওয়া যে দুরাশার তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলাম আমরা — কালজয়ী চিত্রী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের পরিবারের মানুষজনেরা। হায় রে দুর্ভাগ্য আমাদের! সত্য সত্যই কী বিচিত্র এই দেশ। যে দেশে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে যায়, সেখানে এ ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়া তেমন বড় কোনো ঘটনাই নয়, যদিও সেই সব প্রতারকেরা বিশেষ সম্মানের সাথেই সমাজে চলাফেরা করেন– তাঁদের কোনো বড় কাজের জন্য উপর্যুপরি মাল্যদান এবং পুরস্কারও মেলে– বস্তুত তা পাওয়া উচিতও, কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত কাজটির কোনো শাস্তিই হয় না। পরন্তু বিশিষ্ট গুণীজনেরাও তাঁর ভালো কাজের সাপেক্ষে পাশাপাশি যে মন্দকাজটিকে নেহাৎই ধিক্কারজনক কাজটিকে কোনো গুরুত্ব দিতেই চান না, এমন কী মৌন সমর্থনও থাকে! এহেন এক অভাবিত অভিজ্ঞান নিদারুণ বেদনাদায়ক বটে। তো এমনতর একপেশে একটি মর্মন্তুদ ঘটনার বিষয় তুলে ধরতেই এই কাহিনীর অবতারণা।

বর্ধমান জেলার গ্রাম পানাগড়ের অধিবাসী 'স্বকাল' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ দাস, এক গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের বাড়িতে আসেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী সৌম্যেন অধিকারী মহাশয়ের কাছ থেকে আমাদের ঠিকানা নিয়ে। তিনি আমার বাবা দিবাকর বেইজকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন 'স্বকাল' পত্রিকার প্যাডে লিখে। তাঁর সশরীরে আমাদের বাড়িতে আগমন এবং আমাদের সাথে তাঁর কপট ঘনিষ্ঠতা তৈরি।

তিনি বললেন রামকিঙ্করের উপর একটি বই করতে চান। সেইজন্য বিভিন্ন নথিপত্রের প্রয়োজনে আমাদের বাড়িতে তাঁর আসা-যাওয়া চলতে লাগল। একদিন

বাবার কাছে রক্ষিত দাদু রামকিঙ্কর বেইজের তিনটি স্কেচ খাতা ও চল্লিশটি ওয়াটার কালার ছবি দেখলেন এবং তাঁর মাথায় একটি এ্যালবাম করারও পরিকল্পনার উদয় হল। বাবার কাছ থেকে তিনি ঐ তিনটি স্কেচ খাতা এবং চল্লিশটি ওয়াটার কালার ছবি নিয়ে চলে গেলেন কোনো লিখিত প্রমাণ ছাড়াই। ঐ ছবিগুলির এ্যালবাম প্রকাশ করতে দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে তুলে দিতে আমিও হাত লাগিয়েছিলাম এই ভেবে, যে দাদুর অবিস্মরণীয় কাজগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ পাক। কিন্তু আজ আমাদের আফসোসের পরিসীমা নেই; আবার এ-ও ভাবি মূর্খদের এমন শাস্তি হওয়াই তো উচিত। এখন তাঁর 'রামকিঙ্কর' নতুন সংস্করণের মোটা বইটির পাতায় পাতায় অধিকাংশই তো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া ছবিগুলি। এছাড়া একটি এ্যালবাম যে প্রকাশ করেছেন সেখানেও অধিকাংশ ছবিই এখান থেকে পাওয়া। এছাড়াও অন্য লেখক সম্পাদকের বিভিন্ন বইতেও দেখেছি এই ছবিগুলি। প্রকাশ দাসকে দেওয়া আমাদেরই ছবি, কিন্তু সে সব নাকি বিভিন্ন মানুষের কাছে সংগ্রহ করেছেন এমনই উল্লেখ তাঁদের। ভাবি এই কলির প্রভাব বুঝি বা ষোল আনাই পূর্ণ হতে চলেছে।

তো প্রকাশ দাস বললেন খুব শীগগিরই কাজ হয়ে যাবে এবং কাজ হলেই তিনি সেগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধার সাথেই সেগুলি ফেরত দিয়ে দেবেন এবং এ্যালবামের উপর রয়্যালিটি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সে তো মৌখিক। সেদিন মাননীয় প্রকাশবাবু না জানি মনে মনে বিকট হেসে নিয়েছিলেন। যাই হোক 'রামকিঙ্কর' বইটির বিষয়ে তিনি বাবার মুখ থেকে যা যা শুনলেন টেপে সংগ্রহ করে নিলেন। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়সের গ্রাম্য স্বভাবের সেকেলে মানুষ দিবাকরের মনে প্রকাশবাবু সম্পর্কে কোনো বাঁকা ভাবনার উদয় হয়নি সেদিন। আসলে তিনি যে প্রকাশবাবুর মতো শিক্ষিত ছিলেন না। এছাড়া এই নিজেকেই বা লিটারেটেড বলি কি করে? নইলে কি আর কোনো প্রমাণ না রেখেই অমূল্য ছবিগুলি হাতছাড়া করি! বাঁকুড়ার দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সেদিন ন্যায্য কথাই বলেছিলেন, যেখানে যাবার সেখানেই চলে গেছে। অর্থাৎ ওসব নাকি আমাদের কাছে থাকার নয়।

তো এক্ষেত্রে বলি, রামকিঙ্কর তো আর মূর্খ ছিলেন না– তিনি কিন্তু ভাইপো দিবাকরকে ভালোবেসে তাঁর নিজের বাবা মাকে সেবা ও ভরণ-পোষণ করার ঋণ শোধ করেছিলেন। এছাড়া যে পরিবার থেকে রামকিঙ্কর উঠে এসে দেশকে গৌরবের উচ্চশিখরে তুলে দিলেন, খুব বিস্মিত হতে হয় যে দেশের মানুষের সেই নগণ্য পরিবারটির প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা বোধই নেই? শিল্পরসিক মহলের কোনো দায়ই নেই পরিবারটির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশের কর্ণধারদের দু-একটা চাকরীর জন্য

বলার। আসলে রামকিঙ্কর হলেন প্রকৃতির একটি খেয়াল, একটি আকস্মিক ঘটনা। ফলে এমন ভাবনা জেগে ওঠে যে এই পরিবারটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তো প্রকাশবাবুর কীর্তির কথায় আবার আসা যাক। তিনি ছবিগুলি পাবার পর আসা যাওয়া বন্ধ করলেন। তিনি খুব ব্যস্ত সেগুলি ছাপার ব্যাপারে তাই আসতে পারছেন না ইত্যাদি চিঠিতে জানাতে থাকলেন। অবশেষে 'রামকিঙ্কর' নামে বইটি বের হল। তিনি হঠাৎ একদিন এসে বাবার হাতে একটি বই তুলে দিয়ে ছবিগুলির ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলে, আবারও রয়্যালটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেন। এরপর শুরু হল আমাদের দিন গোনা কখন তিনি ফেরত দেবেন? অবশেষে বাবা প্রমাদ গুনলেন— বোধ হয় আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আরো পরে সিদ্ধান্তে এলেন যে ছবিগুলো গেল। আমরা চরম হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাদের বাঁচাবার সম্বলটুকু চিরদিনের জন্য হারালাম। আসলে দারিদ্রাই যে আমাদের নিয়তি! নইলে অধিকাংশ মানুষ তথা বিশিষ্টজনেরা এমন কী মিডিয়াগুলো পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে নীরব থাকতেই পছন্দ করে কেন?

যাই হোক ছবিগুলো ফেরত চেয়ে প্রকাশ দাসকে যে সব চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যুত্তরে তিনি যে ক'টি ইনল্যাণ্ড এবং পোস্টকার্ড পাঠিয়েছেন আমাকে এবং বাবা দিবাকর বেইজকে— সে সবের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল— ২.০৩.৮৭ তারিখে তিনি আমার এক পত্রের উত্তর লিখলেন— 'তোমাদের বাড়ি থেকে রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিসপত্র, ওগুলোর জন্য কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না।' বাবা তাঁর এই স্তোকবাক্যে কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, কেননা এতদিনে তিনি প্রকাশবাবুকে অনেকটাই চিনে ফেলেছেন। তাই ভীষণ উদ্বিগ্ন বাবা তাঁর চরম বোকামির কথা আমাকে বারবার বলতে আমি চিঠিতে সে কথাই জানাই। ২৫.০৩.৮৭ তারিখে তাঁর উত্তরে তিনি লিখলেন— 'তিনি যেন ছবিগুলির জন্য কোনোরকম উদ্বিগ্ন না হোন, স্কেচখাতার প্রয়োজনীয় স্কেচগুলি প্রায় সবই Block হয়ে গেছে।'

তারপর এক বছর গড়িয়ে গেলে বাবা নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার সাথে বলতে লাগলেন, যে কী অমূল্য ধন যা তিনি কাকাবাবুর কাছে ভালোবাসার উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। সে সব তিনি কাকে বিশ্বাস করে দিয়ে দিলেন। দরিদ্র বাবার দুশ্চিন্তা ছিল যে ছেলেমেয়েরা তবে বাঁচবে কিভাবে? কোনো জমি-জায়গা বা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স না থাকা প্রায় রিক্ত জীর্ণ বাবা দুর্ভাবনায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রকাশ দাসের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ আমি, বাবার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে অত্যন্ত মিনতি করে একটি চিঠি লিখলাম। ১৩.০৬.৮৮ তারিখের চিঠিতে তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন— 'দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলির জন্য উনি যেন কোনরকম উদ্বিগ্ন না

হন। তোমাদের কাছ থেকে আনা জিনিস পত্রগুলির কাজ হয়ে গেছে এবং এগুলি যত্নের সঙ্গেই আছে। অতএব ভাববার কিছু নেই। কয়েকদিন পরে আমি যাচ্ছি তখন ওগুলি নিয়ে যাবো।'

এরপর বাবা যারপর নাই অনুনয় করে একটি চিঠি পাঠালে ১৭.০৭.৮৮ সালে প্রকাশবাবু বাবা দিবাকর বেইজকে লিখলেন— 'ছবিগুলির জন্য কোনরকম চিন্তা করবেন না। যথারীতি শ্রদ্ধার সাথে আপনার বিশ্বাসকে মূল্য দিয়েই ফিরিয়ে দেবো।' ওই একই তারিখে আমাকেও তিনি লিখলেন— 'দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলোর ব্যাপারে যেন কোনরকম দুশ্চিন্তা না করেন। চিন্তিত হবার কথাই। কারণ অনেক দিন তো হলো।' ওই চিঠিতেই তিনি আরো লিখেছেন— 'এরকম মহৎ কাজে তোমাদের সাহায্যে তো বইটি প্রকাশে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বইটি প্রকাশে তোমাদের মহৎ দানের কাছে ঋণী থাকবো।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান নতুন সংস্করণের মোটা ভল্যুমের 'রামকিঙ্কর' বইটিতে মুদ্রিত অধিকাংশই অর্থাৎ তিনের চার অংশই আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া ছবিগুলি। যাই হোক পাঠকগণ এযাবৎ লক্ষ্য করেছেন যে প্রকাশবাবু দিচ্ছি দিচ্ছি বা চিন্তা করবেন না এইসব ধারাবাহিক ভাবে বলে গেছেন। তো এবার আমি দয়া করে ওগুলো দিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে লিখলাম একটি চিঠি। তার উত্তরে ২৭.০৭.৮৮ তারিখে তিনি জানালেন—' বইটিতে যদি আরো কোনো ছবি লাগে এজন্যই ছবিগুলি দিতে দেরি হচ্ছে। দিবাকরদাকে বলো যেন উনি ছবির ব্যাপারে কোনরকম দুশ্চিন্তা না করেন।'

এই চিঠি পাবার পর বাবা শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে আসেন। সে সংবাদ প্রকাশবাবুর কাছে পৌঁছায়। ০৩.০৪.৮৯ তারিখে তিনি লিখলেন— 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে জানতে পারলাম দিবাকরদা এসেছিলেন।' আরো লিখেছেন— 'আমি ১২/১৩ তারিখে তোমাদের ওখানে যাবো। স্কেচের বইটির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা হবে আরো।' এই চিঠি পেয়ে আমি তাঁর পরিকল্পিত এ্যালবামটি এবং 'রামকিঙ্কর' বইটিতে আমাদের দেওয়া ছবির প্রিন্ট ছাপানোর জন্য সেখানেও কিছু রয়ালিটি আমাদের প্রাপ্য জানিয়ে ও সাথে সাথে মূল ছবিগুলি দয়া করে ফেরত দেওয়ার আবারও অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি পাঠালাম। 'রামকিঙ্কর' বইতে তিনি কিছু ছবির প্রিন্ট দেবেন আগেই জানিয়ে ছিলেন। যাই হোক ঠিক এই সময়েই তিনি হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন সঙ্গে 'রামকিঙ্কর' বইটি হাতে নিয়ে। সেটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে সেদিনও সেই একই কথা, মূল ছবিগুলি কিছু দিনের মধ্যেই ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন। এই তার শেষ যাওয়া। বোধ হয় আর বাঁকুড়ামুখোও হননি।

আমাদের জীবনে আলোর শেষ আশাটুকু একটু একটু করে একেবারেই নিভে গেল। যে পরিবার থেকে রামকিঙ্করের উঠে আসা সেই পরিবারটির প্রতি শিল্পরসিক মহলের যে কোনো আগ্রহই নেই বরং উন্নাসিকতাই প্রবল এতদিনে তা বেশ ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছি। কারণ প্রকাশবাবুর এই প্রতারণার কাহিনী বেশ ভালো রকমই তাঁরা জেনে গেছেন তথাপি তো তারা নিশ্চুপ। এখন মনে হয় রামকিঙ্করের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা মুষ্টিমেয় ক'জন ছাড়া অধিকাংশরই নেই। বস্তুত ভারতবর্ষের অভিজাত সম্প্রদায়ের মনে একটা আক্ষেপও থেকে গেছে যে তাঁদের গণ্ডীর মধ্যেই রামকিঙ্করের মত বিস্ময়কর প্রতিভাধরের আবির্ভাব না হওয়ায়। তো থাক সে কথা।

প্রকাশবাবু ২৪.১২.৮৯ তারিখের চিঠিতে লিখলেন– 'আমাদের পোড়া দেশ এতদিন পরেও রামকিঙ্কর নামের ঐ শিল্পী-পুরুষের ছবিগুলি যথাযথ ভাবে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য বা সুরাহায় ছাপানোর ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এখনও আমি ভিখিরির মতো শুধু হন্যে হয়ে আছি। কিভাবে ঐ শিল্পী-পুরুষের ছবিগুলি দেশবাসীর কাছে ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।'

সহৃদয় শিল্পরসিক পাঠকগণ দেখুন দেশবাসীর কাছে ঐ মহান শিল্পী-পুরুষের ছবিগুলি প্রকাশের আলোয় আশার জন্যই তো তাঁকে দেওয়া। কিন্তু তার বদলে তিনি এখনও পর্যন্ত যতগুলি প্রকাশের আলোয় এনেছেন তার চার ভাগের তিনভাগই তো এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছে এবং ছবিগুলি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে গেছে তারই বেশ কিছু প্রমাণও চোখে পড়েছে। ফলে রামকিঙ্করের ছবিতে যে নানান ধারার সমাবেশ দেখতে পেতাম আমরা আগামী প্রজন্মের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যা পথ প্রদর্শক হতে পারত তা তো আর হল না! এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ্য বিষয়– ৭ এপ্রিল ২০০৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রদর্শনীর রিপোর্ট ছাপা হয়। সেটি এখানে তুলে ধরা হল।

রিপোর্ট

রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন প্রকৃতির শিল্পী। সারাজীবন অসংখ্য ভাস্কর্য তৈরির ফাঁকে প্রচুর ছবিও এঁকেছেন। এতদিন ধরে প্রকাশিত না হওয়া তাঁর বত্রিশটি ছবি নিয়ে 'খড়ির গণ্ডীতে' জঙ্গলের ভিতর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল 'আলো বাতাস' সাহিত্য পত্রিকা। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী রবীন মণ্ডল। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল ছবিগুলি? 'আলো বাতাস'-এর সম্পাদক স্বপ্নকমল সরকার জানালেন পানাগড়ের শিল্প সংগ্রাহক প্রকাশ দাসের কাছে ছবিগুলি ছিল। শিল্পীর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সেগুলি বাইরে আনা হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও কমলকুমার মজুমদারের আঁকা বেশ কিছুই অপ্রকাশিত ছবির প্রদর্শনী করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন এই পত্রিকার কর্মীরা।'

এখানে দেখা যায় রিপোর্টার পরিষ্কার লিখেছেন কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল ছবিগুলি? রিপোর্টারকে কেন লিখতে হল কোথায় ছিল ছবিগুলি? প্রশ্নচিহ্নই বা কেন দিলেন? কিন্তু কথাটি বা কেন লিখলেন? যিনি ঐ প্রদর্শনীর আয়োজক ছিলেন 'আলো বাতাস' পত্রিকার সম্পাদক স্বপ্নকমল সরকার, তিনি জানাচ্ছেন– 'পানাগড়ের শিল্প সংগ্রাহক প্রকাশ দাসের কাছে ছবিগুলি ছিল। শিল্পীর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সেগুলি বাইরে আনা হয়েছে।' এখানে প্রশ্ন তিনি কোন বাইরের কথা বলছেন?

আরো এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে স্বয়ং প্রকাশ দাস সম্পাদিত 'স্বকাল' নামক পত্রিকায় যাতে গণেশ হালুই বইটির মুখবন্ধে লিখেছেন– 'দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা এই ড্রইংগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশ্ন এখানেও যে দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা কথাটির অর্থ কী। কোথা থেকে উদ্ধার? কার কাছ থেকে? সেই বেইজ পরিবার?

কিন্তু কোথায় ছিল? বাইরে আনা হয়েছে দীর্ঘ অনুসন্ধানে উদ্ধার করা এবং এতদিন ধরে প্রকাশিত না হওয়া তাঁর বত্রিশটি ছবি নিয়ে 'খড়ির গণ্ডী'-তে জঙ্গলের ভিতর প্রদর্শনীর আয়োজন. . .' কথাগুলি যে সন্দেহের এবং রহস্যজনক তা তো বলে দিতে হবে না। আগামী দিনে রামকিঙ্কর নিয়ে চর্চা হলে ছবি অন্তর্ধান বা প্রতারণার প্রসঙ্গ উঠে আসবেই। আসবে প্রকাশ দাসের কথা। প্রকাশিত হবে ঐ বত্রিশটি ছবি ছাড়া তাঁর নিয়ে যাওয়া আরো অনেকগুলি ছবির বিক্ষিপ্ত ভাবে অন্ধকারের গর্ভে ছড়িয়ে যাওয়ার হতাশাব্যঞ্জক কাহিনী। যার কারণে কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা রামকিঙ্করের আর তৈরি হতে পারল না।

এতগুলো তথ্য দিয়ে পাঠককে অনেকটাই নিশ্চিত করতে পেরেছি মনে করি। এছাড়াও আরো কিছু যোগ করছি যেমন ১৫.০১.২০০৬-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি রিপোর্ট হয়। আমাদের বাড়িতে এসে ঐ রিপোর্টটি কভার করেন। সেটি হুবহু দিলাম। আমাদের দেওয়া নথিপত্র বা প্রমাণের ভিত্তিতে এই রিপোর্টটি বেরোয়।

পাঠক মহাশয়! আমাদের দেওয়া প্রকাশবাবুর চিঠিগুলি ভালোভাবে পড়বেন। তিনি জানতেন না আমাদের চিঠিতে কী লিখে পাঠিয়েছে বা ভুলে গিয়েছিলেন। এছাড়া হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন অগোছালো আমরা সেসব বুঝি বা নষ্টই করে ফেলেছি। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ার মতই তাঁর আসল সত্যটি যে আমাদের কাছে চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বেশ যত্নেই রক্ষিত হয়ে ছিল ভাবলে আমরাই বিস্মিত হই। যাই হোক তাঁর চিঠির বাক্যগুলি পাঠকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশবাবুর বক্তব্যগুলি একবার স্মরণ করবেন। দেখবেন এতবড় শিল্পরসিক শিল্পবোদ্ধা রামকিঙ্করের প্রতি বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধায় নতজানু মানুষটির কথায় এতটাই অসঙ্গতি? মূল্যবোধ! তবে তোমায় কোথায় খুঁজব আমরা? যাই হোক। অতঃপর রিপোর্টটি দেওয়া হল।

রিপোর্ট

রামকিঙ্করের ছবি বেহাত প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া

"ভাস্কর ও চিত্রকর রামকিঙ্কর বেজের চল্লিশটি জলরঙে আঁকা ছবি ও তিনটি স্কেচ খাতা তাঁর পরিবারের বেহাত হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে শিল্পীর উত্তরাধিকারীরা জানিয়েছেন বেশ কিছু বছর আগে পানাগড়ের বাসিন্দা প্রকাশ দাস সেগুলি চেয়ে নিয়ে যান। বহু চেষ্টাতেও তা উদ্ধার করা যায়নি। জেলাশাসক প্রভাতকুমার মিশ্র এ ব্যাপারে তদন্তের আশ্বাস দিলেও অভিযুক্ত প্রকাশবাবুর কাছে কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। পানাগড়ের বাড়ি থেকে প্রকাশবাবু বলেন ছবিগুলি আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু কোন লিখিত নথির ভিত্তিতে নয়। বহুদিন আগের ব্যাপার। কিছু হয়তো ফেরত নিয়েছি, কিছু হয়তো দিইনি। ঠিক মনে নেই। তাঁর বক্তব্য তখন ছবিগুলির দামই বা কী ছিল?

শিল্পীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে জলরঙের ছবিগুলি প্রায় সব আর্ট পেপারের এক চতুর্থাংশে আঁকা। চিত্রকলা সমালোচক শোভন সোম বলেন ছবি না দেখে দাম বোঝা যায় না। তবে জলরঙে আঁকা রামকিঙ্করের রঙিন ছবি ঠিক অবস্থায় থাকলে তার একটির দামই চার লক্ষ টাকার কম নয়। ৯০ সাল নাগাদ লাখ খানেক টাকা দাম ছিল। স্কেচের দাম ৫০ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকার মধ্যে। নিলাম উঠলে অবশ্য দাম অনেক চড়ে যেতে পারে। বছর সাত আট আগে মুম্বইয়ে ওঁর একটি স্কেচ পৌনে দু'লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। চিত্রকর যোগেন চৌধুরী বলেন শিল্পীর ছবির দাম অনেকটা নির্ভর করে প্রচারের উপরে। রামকিঙ্কর যথেষ্ট প্রচার না পেলেও ওঁর ছবির মর্যাদা যথেষ্ট।

শিল্পীর পরিবার সূত্রের খবর বাঁকুড়ার রামানন্দ পল্লীর বাসভবনে থাকার সময়ে

ওই সব স্কেচ ও ছবির বেশির ভাগ আঁকা। ১৯৮৬ সালে অকৃতদার চিত্রকরের ভাইপো দিবাকর বেজের কাছ থেকে প্রকাশবাবু সেগুলি নিয়ে যান। সেই সব ছবি সহ কলকাতার এক প্রকাশনা সংস্থা 'রামকিঙ্কর' ও 'রামকিঙ্করের ড্রয়িং' নামে দুটি বই প্রকাশ করে। দিবাকরবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশবাবুর নামেই ছিল। প্রকাশক রাজীব নিয়োগীর দাবি ছাপার প্লেট তৈরির পর ছবিগুলি প্রকাশকে ফেরত দেওয়া হয়। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বইয়ের সংস্করণও নিঃশেষিত। শিল্পীর পরিবার ছবি ফেরত না পেয়ে থাকলে বা সেগুলি বিক্রি না হয়ে থাকলে প্রকাশের কাছে থাকা উচিত।

দিবাকরবাবুর তিন ছেলে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। রামকিঙ্করের আর এক ভাইপো সাধনকুমার বেজ বলে শিল্পীর শেষ উইল অনুযায়ী দিবাকর বেজ তাঁর ছবি সহ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির আট আনা সত্ত্বাধিকারী। আমি চার আনার আর রাধারাণী গঁড়াই বাকি চার আনার। দীর্ঘ সময় রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিলেন রাধারাণী দেবী। দিবাকরবাবুর এক ছেলে শিবপ্রসাদ বলেন প্রকাশবাবুকে চিঠি দেওয়া হলেই উনি নিশ্চিন্ত করেছেন। পরে আর যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁরা জানাচ্ছেন পানাগড়ে প্রকাশবাবুর বাড়ির ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকে শেষ চিঠি ফেরত এসেছে। ছবিগুলি বিক্রি হয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়েছে কি না সে প্রশ্নও তাঁদের রয়েছে। প্রসঙ্গত রামকিঙ্করের সৃষ্টি জাতীয় সম্পত্তি মর্যাদাভুক্ত। দেশের বাইরে তো বিক্রির নিয়ম নেই। আগামী ২৫ মে রামকিঙ্করের জন্মশতবর্ষের সূচনা। শিল্পীর পরিবার চায় তার আগে যে করে সম্ভব ছবি ও স্কেচগুলি উদ্ধার হোক।"

> এই রিপোর্টটি প্রকাশ হবার পর ০৭.০২.২০০৬-এ 'প্রকাশ দাস ও রামকিঙ্করের ছবি রহস্য' শিরোনামে আমাদের একটি করে চিঠি প্রকাশ হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। সেটি দেওয়া হল– তার আগে জানিয়ে দিই যে প্রকাশবাবু নিজের নৈতিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ২৪.১২.১৯৮৯ ও ২০.০৮.১৯৯০ দুটি চিঠি লেখেন ২৪.১২.১৯৮৯ লিখছেন সেখানে আছে – 'এ্যালবামটির ব্যাপারে তুমি যে টাকার দাব করেছো তা নিশ্চয়ই তোমাদের দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবো।' ২০.০৮.৯০ তারিখে লিখলেন– 'তুমি যে টাকার কথা বলেছিলে সে সব দিয়ে দেব আমি তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন। তোমাদের টাকা দেওয়াটাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।'

এখন 'রামকিঙ্করের ছবি রহস্য' শিরোনামে পূর্বোক্ত যে চিঠিগুলি বেরোয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সেগুলি এখানে পরিবেশিত হল।

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৫ জানুয়ারি 'রামকিঙ্করের ছবি বেহাত— প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার' শিরোনামে বাঁকুড়ার সাংবাদিক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটি অনেকাংশেই অসত্য এবং আমার সম্মানহানিকর। রামকিঙ্করের একটি সাক্ষাৎকার নিই ১১-১০-৭৯ সালে তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনে। সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদিত সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'স্বকাল' পত্রিকার ১৯৮০ সালের সংখ্যায় শিল্পীর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর। এরপর রামকিঙ্করের শিল্পপ্রতিভা যাতে সকলের মধ্যে প্রচারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি ১৯৮৫ সাল বিভিন্ন শিল্পপ্রেমীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাঁর আঁকা অর্ধশতাধিক ছবি ও স্লাইড প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি মফস্‌সল পানাগড়ে। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, গণেশ হালুই, কবি আলোক সরকার প্রমুখ ছিলেন সেখানে।

ওই প্রদর্শনীতে যে সমস্ত ছবি শিল্পপ্রেমীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি, সেগুলি তাঁদের যথাসময়ে ফেরতই দিই। সে সময় পর্যন্ত রামকিঙ্কর বেইজের ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর বেইজ বা তাঁর পুত্র বা তাঁর অন্য কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। অতএব ওই প্রদর্শনীতে তাঁদের কাছে ছবি সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না। রামকিঙ্কর বেইজ ১৯৮০ সালের ২৫ জুলাই মারা যান। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে রামকিঙ্করের জীবন ও শিল্প নিয়ে আমার প্রথম গ্রন্থ রামকিঙ্কর প্রকাশ করি। লেখকেরা সবাই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বা সমালোচক বা শিল্পীর ঘনিষ্টজন। গ্রন্থে দিবাকর বেইজের একটি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এক বেকার যুবকের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও শিল্পপ্রেমী বন্ধুদের সহায়তায় বইটি প্রকাশ পায় মফস্‌সলের একটি ছোট্ট কাগজের তরফ থেকেই। যদিও পরে প্রকাশকের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন কলকাতার এক প্রকাশক। বইটিতে ২০-২২ খানা ছবি রয়েছে। সমস্ত ছবিই নানাসূত্র থেকে সংগৃহীত। তালিকায় ব্যক্তিগত সংগ্রাহক যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছে বিড়লা আকাদেমির মতো প্রতিষ্ঠান। কৃতজ্ঞতা জানাই দিবাকর বেইজের প্রতি যিনি শিল্পীর আঁকা দু-একটি প্রতিলিপি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এবং যা যথাসময়ে তাঁকে ফেরত দিই। দিবাকরবাবু শিল্পীর আঁকা কোনও মূল ছবি দেননি আমাকে। দিবাকরবাবুর পুত্র শিবপ্রসাদ রামকিঙ্করের দুটি সাদা কালো ফোটোগ্রাফ দেন, যার মধ্যে একটি উক্ত গ্রন্থের একেবারে প্রথমেই 'সৃষ্টিমগ্ন রামকিঙ্কর' শিরোনামে ছাপা হয় এবং ওই ফটোগ্রাফটিও তাকে যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হয়। দিবাকরবাবুর প্রতিলিপিগুলি দেওয়ার সময় যেমন আমার কাছে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কোনও কিছু লিখিয়ে নেননি তেমনিই আমিও ফেরত দেওয়ার সময় তাঁর কাছে কিছু লিখিয়ে নিইনি।

রামকিঙ্কর বিষয়ক আমার দ্বিতীয় বই 'রামকিঙ্কর ড্রইং' প্রকাশিত হয় ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ। এই পুস্তকেরও সমস্ত ছবিই সংগৃহীত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানান ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, ললিতকলা আকাদেমি (দিল্লী), কলাভবন, সোমনাথ হোড়, কে. জি. সুব্রামণিয়ম গণেশ হালুই, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), প্রণব দেববর্মণ, দিনকর কৌশিক, পূর্ণেন্দু পত্রী, শিল্পীর দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী তথা অভিভাবক রাধারাণী, দিবাকর বেইজ, শঙ্খ চৌধুরী, অমিত মুখোপাধ্যায়, সৌমেন অধিকারী প্রমুখ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পুস্তকটি প্রকাশনায় নানাভাবে সহায়তা করেন। উক্ত পুস্তকে সকলের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। কোনও মূল ছবি নয়, এই বই প্রকাশের পূর্বে দিবাকর বেইজ দুটি স্কেচের প্রতিলিপি দেন এবং সেগুলিও দিবাকরবাবুর মৃত্যুর পর শিবপ্রসাদকে ফেরত দিই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদের সঙ্গে যে চারটি ছবি ছাপা হয় সেগুলির প্রতিলিপি সৌমেন অধিকারী, শঙ্খ চৌধুরী, দিল্লীর ন্যাশন্যাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট এবং দিনকর কৌশিকের কাছ থেকে সংগৃহীত কোনওটিই শিল্পীর আত্মীয়বর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত নয়। তাঁদের থেকে মূল ছবি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রামকিঙ্করের ড্রইং বইটির সমস্ত ছবিই ছাপা হয় প্রতিলিপি থেকে।

জীবন সায়াহ্নে রোগে জেরবার অসহায় রামকিঙ্করের শেষ উইলটিতে শিল্পীর দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী একমাত্র আপনজন, অভিভাবক রাধারাণীর পরিচয়সূত্রে দীর্ঘ দিনের পরিচারিকা হিসাবে তাঁকে যে চিহ্নিত করা হয়েছে তা কি রুচিসম্মত? আমার সম্পাদিত বই দুটির স্বত্বের ব্যাপারেও উইলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না বা নেই।

আমি আমার পত্রে শিবপ্রসাদকে তাঁর দেওয়া প্রতিলিপি ফেরত দেওয়ার কথাই লিখেছিলাম। এবং তার পরেই তা ফেরত দেওয়া হয়। আমাকে পাঠানো শিবপ্রসাদের রেজিস্ট্রি ডাকযোগের চিঠি আমি ফেরত পাঠাইনি। ডাককর্মী আমার সাক্ষাত না পেয়ে তা ফেরত পাঠাতে পারেন। এবং তা আমার অজ্ঞাতেই হয়েছে। সংবাদটিতে যেমন লেখা হয়েছে সে কথা আমি প্রতিবেদককে কখনও বলিনি, কিছু হয়তো ফেরত দিয়েছি, কিছু হয়তো দিইনি ঠিক মনে নেই। শিবপ্রসাদকে লেখা আমার চিঠিগুলির কথা প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করায় বলি ওর লেখা অনেক চিঠিও আছে আমার কাছে।

কোনও মহৎ শিল্পকর্মই অর্থের অঙ্কে নির্ধারিত নয়। আর রামকিঙ্করের শিল্পকর্ম তো নয়ই। অর্থ নয়, প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে কথাপ্রসঙ্গে এসেছিল রামকিঙ্করের আঁকা ছবির সহজলভ্যতার প্রসঙ্গ বিশেষত সেই ১৯৮৫ সালে। যা

ছিল তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পর। তা না হলে বিভিন্ন শিল্পপ্রেমীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের এতগুলি ছবির প্রদর্শনী করার সুযোগ বা পাই কী করে? আমি যে কথাগুলি বললাম তা অক্ষরে সত্য। এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জানার উক্ত গ্রন্থদুটিতে ছাড়াও আমার হাতে আছে।

প্রকাশ দাস
সম্পাদক : স্বকাল
পানাগড়, বর্ধমান

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে 'রামকিঙ্করের ছবি বেহাত প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার' শিরোনামে সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ দাসের পত্র মারফত জানতে পারলাম রামকিঙ্করের শিল্প প্রতিভাকে সকলের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি ১৯৮৫ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন মফস্সল পানাগড়ে। নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু প্রকাশবাবু ব্যাপারটাকে খানিকটা সূর্যকে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেখার মতো মনে হয় না? তা ছাড়া সে প্রদর্শনী কেবলমাত্র পানাগড়েই তো সীমাবদ্ধ। তা হলে সকলের মধ্যে প্রচার কী ভাবে হয়? আপনি চিঠিতে লিখেছেন সে সময় পর্যন্ত রামকিঙ্কর বেইজের ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর বেইজ যা তাঁর পুত্র বা তাঁর অন্য কোনও পরিচয় ছিল না। অতএব ওই প্রদর্শনীতে ওদের কাছ থেকে কোনও ছবি সংগ্রহের প্রশ্নই ওঠে না। খাঁটি কথা। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদে এ ধরনের কোনও সংবাদই ছাপা হয়নি।

'রামকিঙ্কর' গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৯ সাল! ০২.০৩.১৯৮৭ তারিখে গভীর ভালোবাসা সহ প্রকাশদা আপনি লিখেছেন– 'আমি তোমাদের বাড়ি থেকে রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি এগুলোর জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। কারণ আমার কাছ থেকে ওগুলো নষ্ট হওয়ার বা মারা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজ হলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে আশা করি আমি ওগুলো যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে দেব। আর রামকিঙ্করকে নিয়ে কাজ করতে গেলে ওগুলো তোমাদের কাছে ছাড়া আর কাদের কাছেই বা আশা করতে পারি? কারণ আমার অভিজ্ঞতা বলে তোমরা একটু বড় বুকের মানুষ বলেই আমাকে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমি আশ্চর্য আর অভিভূত।'

আপনি রামকিঙ্করের যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন সে সব নিশ্চয়ই আসবাবপত্র বা তোরঙ্গ নয়। অথচ আপনি লিখেছেন– 'দিবাকরবাবু শিল্পীর আঁকা কোনও মূল ছবি দেননি আমাকে।' 'তিনি নাকি শিল্পীর আঁকা দু'একটি ছবির প্রতিলিপি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, এবং যথাসময়ে তাঁকে আপনি তাও ফেরত দিয়েছেন।' প্রশ্ন কীসের ভিত্তিতে ফেরত দিয়েছিলেন? ওই আশঙ্কা থেকেই আপনি

লিখেছেন– 'দিবাকরবাবু প্রতিলিপিগুলি দেবার সময় আমার কাছে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কোনও কিছু লিখিয়ে নেননি, তেমনই আমিও ফেরত দেওয়ার সময় তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখিয়ে নিইনি।'

আমাদের বাবা রামকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় দিবাকর বেইজ ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত। কিন্তু আপনার মতো রামকিঙ্কর সচেতন মানুষের তো নিশ্চয়ই জানা উচিত তাঁর শিল্পকর্মগুলির আদান-প্রদানের পদ্ধতি। আপনি কিন্তু আমাদের লেখা বিভিন্ন চিঠিতে ছবি বা স্কেচবুক নেওয়ার কথা এক প্রকার লিখিত ভাবেই স্বীকার করে ফেলেছেন। অথচ আপনি বেমালুম বলে দিচ্ছেন দু-একটি প্রতিলিপি নেওয়ার কথা ২৫.০৩.১৯৮৭ তারিখে আপনি লিখেছেন– 'দিবাকরদাকে বলবে যে তিনি যেন ছবিগুলির জন্য কোনও রকম উদ্বিগ্ন না হন। স্কেচখাতার প্রয়োজনীয় স্কেচগুলি প্রায় সবই Block হয়ে গেছে। ১৩.০৬.১৯৮৮ তারিখে আপনি আবার লিখেছেন– 'দিবকারদাকে বলবে ছবিগুলির জন্য উনি যেন কোনও রকম উদ্বিগ্ন না হন। তোত্বমদের কাছ থেকে আনা জিনিসপত্রগুলির কাজ হয়ে গেছে। এবং সেগুলি আমাদ্দর কাছে যত্নের সঙ্গেই আছে। অতএব ভাবনার কছু নেই। কয়েকদিন পর আমি যাচ্ছি, তখন ওগুলি নিয়ে যাব।'

১৭.০৭.১৯৮৮ তারিখে আবার পৃথক পোস্টকার্ড লেখেন। অংশবিশেষ তুলে ধরছি। বাবাকে লিখেছেন– 'ছবিগুলির জন্য কোনওরকম চিন্তা করবেন না, যথারীতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার বিশ্বাসকে মূল্য দিয়েই ফিরিয়ে দেব।' আমাকে লিখেছেন– 'আমাকে দেওয়া দিবকারদার চিঠির উত্তর পাঠালাম। দিবাকরদাকে বলবে ছবিগুলোর ব্যাপারে যেন কোনও দুশ্চিন্তা না করেন। চিন্তিত হওয়ার কথাই কারণ অনেক দিন তো হল।'

২৯.০৭.১৯৮৮ তারিখে লেখা চিঠিতে প্রকাশবাবু জানাচ্ছেন– 'রামকিঙ্কর' নামে আমার বইটির কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ছাপা হয়েছে ১৮৪ পাতা। বইটিতে যদি আরও কোনও ছবি লাগে এজন্যই ছবিগুলি দিতে দেরি হচ্ছে। দিবকারদাকে বলবে যেন উনি ছবির ব্যাপারে কোনও রকম দুশ্চিন্তা না করেন।'

তা হলে দু-একটি প্রতিলিপি নেওয়ার কথা ধোপে টেকে না। ইতিমধ্যেই ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'রামকিঙ্কর' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ওই বছরই ২১.১২.১৯৮৯ তারিখে আপনি লিখেছেন– 'অ্যালবামটির ব্যাপারে তুমি যে টাকার দাবি করেছ তা নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দিয়ে দিতে বাধ্য থাকব।' পুনরায় ২০.০৮.১৯৯০ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন– শিবু তুমি বা তোমরা মোটেই দুশ্চিন্তা করবে না। তুমি যে টাকার কথা বলেছিলে সে সব দিয়ে দেব আমি। তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন তোমাদের টাকা দেওয়াটাও আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে

মনে করি।' কিন্তু না! আসলে আপনি এই সমস্ত স্তোকবাক্য ব্যবহার করেছিলেন এই কারণেই যাতে করে অ্যালবামটি প্রকাশের আগে আমাদের পক্ষে থেকে কোনও উটকো আপত্তি এসে আপনার পরিকল্পনায় জল না ঢেলে দেয়!

আবার চিঠিতে অবাঞ্ছিত ভাবে আপনি রাধারাণী গঁড়াইয়ের প্রসঙ্গ আনলেন। তাঁকে আমরা দিদিমা বলেই জানতাম। এবং আপনার চেয়ে অনেক বেশি দিন তাঁকে দেখেছি। রামকিঙ্কর সম্পাদিত শেষ উইলে তাঁর পরিচয় সূত্রে দীর্ঘদিনের পরিচারিকা হিসাবে তিনি যা চিহ্নিত হয়েছেন তা আপনি গত ১৫ তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদে কোথাও পেয়েছেন নাকি? অথচ সত্যিই দাদু তাঁর শেষ উইলে রাধারাণী গঁড়াইকে দীর্ঘদিনের পরিচারিকা বলেই উল্লেখ করেছেন। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত রামকিঙ্করের উইলের কথা আপনি জানেন এবং জানা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সযত্নে চেপে গিয়েছিলেন! কিন্তু কেন? এখানে উল্লেখ্য রামকিঙ্কর তাঁর সম্পাদিত উইলের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, 'আমার অঙ্কিত অনেক ছবি, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স ও স্কেচ আছে। তাহা ছাড়া আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট আমার অনেক ছবি, ভাস্কর্য, স্কেচ আছে। যাহা আমি তাহাদিগকে উপহার দিই নাই।' প্রকাশবাবু এরপর আপনি কী বলবেন?

এবার আপনার সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর' গ্রন্থে রাধারাণী গঁড়াই প্রসঙ্গে– 'আমি তোমার পাশে আছি' নিবন্ধে আপনি লিখেছেন– 'রামকিঙ্কর যদিও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা শিল্পবোধহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, ঝি হিসাবে জীবন শুরু করা, সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ ও অতি সাধারণ আর সাধাসিধে এক হিন্দু ব্রাত্য মেয়েকে তবুও বরাবরের নিয়ম ভাঙা রামকিঙ্কর প্রথাসিদ্ধ কোন বিবাহের মোড়কে বেঁধে ফেলেননি নিজেকে। আর প্রকাশবাবু জেনে রাখুন স্বত্ব বিষয়টির যথাস্থানেই নিষ্পত্তি হবে। পরিশেষে জানাই বেইজ পরিবারের তরফে গত ১১.১২.২০০৫ তারিখে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ রেজিস্ট্রি ডাকে রামকিঙ্করের ড্রইং বইটির প্রকাশ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ-কে একটি চিঠি পাঠানো হয়। প্রকাশক মশাই সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার ঠিক আগের দিন তাদের লেটারপ্যাডে একটি চিঠি লেখেন যা আমরা গত ২০.০১.২০০৬ তারিখে পাই।

শিবপ্রসাদ বেইজ, হরপ্রসাদ বেইজ ও শান্তিময় বেইজ
বাঁকুড়া

প্রতিবেদকের জবাব

আমি সংবাদ লিখেছি সেখানে আমার মতামতের কোনও জায়গা নেই। বাঁকুড়ার জেলাশাসকের কাছে রামকিঙ্কর বেজের পরিবার যে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার ভিত্তিতে যে সব তথ্য বক্তব্য পাওয়া গিয়েছে তাই সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে

মাত্র। প্রকাশবাবু যা দাবি করেছে : তা কতটা সত্যি তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে ওই সব ছবির ব্যাপারে শিল্পীর পরিবারকে তার লেখা চিঠিগুলি পড়লে ধারণা কিন্তু অন্য রকম হয়।

রামকিঙ্করের শেষ সম্পাদিত উইল অনুযায়ী পরিচিতদের কাছে ছড়িয়ে থাকা তাঁর শিল্পকর্মের সবই তিনি দান করেননি। যে কারণে রামকিঙ্করের মৃত্যুর পরে বিশ্বভারতী তাঁর শিল্পকর্মগুলির কিছু আইন মোতাবেক কিনেছিলেন। প্রকাশবাবু কিন্তু ছবি কেনেননি। শিল্পী বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কেউ যে তাঁকে সে সব উপহার হিসাবেও দেননি তা তাঁর চিঠিতেই পরিষ্কার। তবে তিনি ছবি নিয়েছিলেন না ছবির প্রতিলিপি তা রামকিঙ্করের উত্তরাধিকারীরাই ভাল বলতে পারবেন। আরও একটা কথা। প্রতিবেদনে কোথাও রাধারাণী গঁড়াইকে রামকিঙ্করের দীর্ঘদিনের পরিচারিকা বলে উল্লেখ করা হয়নি। বরং ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর এতগুলি প্রমাণের সঙ্গে আরো একটি অকাট্য প্রমাণ দিতে পারছি সেটি হল এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, যাঁরা হলেন 'রামকিঙ্করের ড্রইং' এ্যালবামটির প্রকাশক। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের চিঠি দেওয়া হলে তাঁরা আমাদের জবাব দেন। সে চিঠিটি ইংরাজীতে। সেই চিঠির বাংলায় তর্জমা করলে সহজেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় জলের মত। সেখানে একজায়গায় তাঁরা বলেছেন– 'আমরা আপনার ১২.১২.২০০৫ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে প্রকাশ দাসের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে আমরা 'রামকিঙ্করের ড্রইং' বইটির ৫০০ কপির অল্পসংখ্যক এক সংস্করণ ছাপি সেই সময় তিনি ঐ বইটির ছবির নেগেটিভ তৈরির জন্য ব্যক্তিগত ভাবে পেন্টিংস এবং স্কেচেস নিয়ে আসেন এবং শীঘ্রই সেগুলি নিয়ে যান। সম্পাদক হিসাবে এই বইয়ের বিষয় বস্তুর জন্য সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব কেবলমাত্র তাঁরই. . .।'

এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী পরিষ্কার লিখেছেন পেন্টিংস এবং স্কেচেস নিয়ে আসেন. . . এবার আগের কথায় ফিরে আসি ২০.০৮.৯০ তারিখের চিঠি পাওয়ার অনেক পরে একদিন আমি ওঁর বাড়ি যাই, এ যাওয়া আমার দ্বিতীয় বার যাওয়া। প্রথমবার প্রকাশবাবুর স্বজনদের খাতির আপ্যায়নে নিজেকে বিশেষ কেউকেটো মনে হয়েছিল। কিন্তু এইবার দেখলাম প্রকাশবাবুর বেরিয়ে পড়েছে আসল ঠাট। উপরের বার্নিস-ফার্নিস সব উধাও। অনেক বাকযুদ্ধ। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার মত তখন তাঁর চোখ মুখের আসল ছবি। রামকিঙ্কর যেমন ব্যক্তি মানুষটির ভেতরের রূপটিকে টেনে বের করে আনতেন। সেদিন আমিও ভেতরের রূপটিকে তার সমগ্রতায় বের করে এনেছিলাম। ভাবা যায় না! একই পাত্রে দুই বিপরীত রূপের কী নিবিড় সহাবস্থান। যাই হোক শেষ মেশ তিনি তাঁর শেষ কথাটি বললেন– 'তোমরা যে ভাবে পারো আদায় করে নাও। আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ

রেখে আসিনি।' ভালো ভাবেই বুঝলাম, বেদম ঘা খেয়েই বুঝলাম এতো অন্য প্রকাশ দাস। সেদিন আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার দেখেছিলাম দু'চোখে। পাশে দাঁড়িয়ে এসব ঘটনা দেখতে থাকা একজন বললো– 'আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান নয়তো খুন হয়ে যেতে পারেন।' তাড়াতাড়িই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু বাবা দিবাকর বেইজ সে ধাক্কা সহ্য করতে পারলেন না। স্ট্রোকে মারা গেলেন। এসব বানানো কথা নয়। নির্ভেজাল সত্য ঘটনা। অতগুলো ছবি গেল। বাবাকেও হারালাম। একেবারে নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে পড়লাম আমরা তিনভাই। মামলার কথা ভাবিনি কারণ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রী এবং ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের নাতিরা– আমাদের পাশে যে কেউ নেই। জানি কোন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত মানুষ হলে আমরা চারপাশ থেকে সহযোগিতার বাড়িয়ে দেওয়া হাতগুলি ধরতে পেতাম। কিন্তু না অর্থবল, লোকবল না থাকায় আজও এতবড় একটি প্রতারণার কোনো বিচার এবং শাস্তি হল না। কোনো বড় কাজের যেমন যথাযোগ্য সম্মান পেতে পারে মানুষ তেমনি গর্হিত কাজের তদনুরূপ শাস্তি হওয়াটাই তো বাঞ্ছনীয়। প্রভাবশালীদের ক্ষমার চোখে দেখাটাই বোধ হয় আমাদের দেশের রীতি। তো যাক এই সব হতাশার কথা। আমাদের কয়েকটি বিভিন্ন জায়গায় ইনফরম করার কথা বলি। যেমন– বাঁকুড়া এস. পি.-কে একটি লিখিত পিটিশন দিই। তিনি বর্ধমান এস.পি.-র কাছে চিঠি করেন। এছাড়া জানানো হয় মানবাধিকার কমিশনকেও। ব্যস ওই পর্যন্তই।

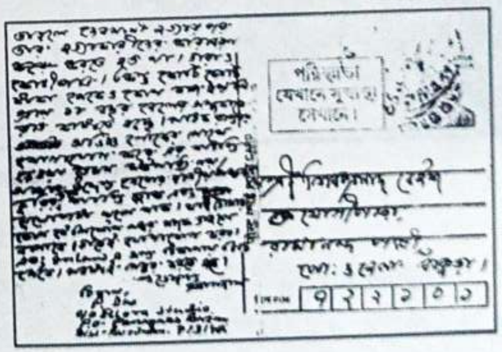
আমার বাবা দিবাকর বেইজের হাতে লেখা টুকরো কাগজটি পড়লেই বোঝা যাবে প্রকাশবাবু কতগুলি ছবি এবং স্কেচ পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন– 'এ্যালবাম করতে দেওয়ার জন্য রামকিঙ্কর বইটির সম্পাদক প্রকাশ দাসকে দেওয়া তিনটি স্কেচ খাতা ও রামকিঙ্করের চল্লিশটি খুচরো ছবি ফেরত দেয়নি। এ্যালবামের জন্য বা রামকিঙ্কর বইটির ওপর তার প্রতিশ্রুত টাকা পয়সা কিছুই দেয়নি।

অবশেষে এতদূর প্রমাণ দেওয়ার পরও পাঠকগণকে একশভাগ নিশ্চিত করতে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে তুলে ধরা হল। তা হলো প্রকাশবাবু সহোদর দুই ভাই যাঁরা প্রকাশবাবুর এহেন আচরণে বিশেষ অপমানিতবোধ করেছিলেন। ফলত– যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। সহযোগিতার কথাও বলেছেন। তাঁরা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন– 'প্রকাশবাবু সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব এবং কিছু ঘটনার বিবরণ যা এখানে পরিবেশিত হল ২৭.০৩.৯৯ তারিখে প্রকাশবাবুর এক ভাই শ্রী প্রভাস দাস লিখলেন– 'আমি প্রকাশ দাসের ভাই এবং বিভাসের বড়, তোমাদের কাছে প্রকাশকে দাদা বলতে লজ্জা হয় তবুও বাধ্য হয়েই বলতে হয়। প্রকাশ দাস যার পেশাই হচ্ছে যে কোন ভাবে ঠকবাজি করে যাওয়া। তবে একটা উচিত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সে শুধু নিজেকে

শিল্পরসিক বলে জাহির করতে চায়। কিন্তু আমি মনে করি সে চোর। কারণ বেশ কিছুদিন হয়ে গেল বাড়িতে একটি দেওয়ালে এক বিশাল টেরাকোটার কাজ করিয়ে পাওনা দেয়নি। সেই শিল্পীকে চোখের জল ফেলে বিদায় নিতে হয়েছে। আমার বাবার মুখে চুনকালি মাখিয়ে প্রথম তোমাদের সাথে এ ব্যবহার করে। গত বছর বাবার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই কুলাঙ্গার সন্তানের জন্য তাঁর আত্মার শান্তি কোনদিনই হবে, আমি মনে করি না। আইনের রাস্তায় এর শাস্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখনও দেশ থেকে আইন শেষ হয়ে যায়নি।. . . আমার বলার উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় সম্পদ চুরির দায়ে শাস্তি হোক এবং মুখোশটা খুলে যাক।' এছাড়া অন্য আরেক চিঠিতে ২২.০১.২০০০ সালে তিনি লিখলেন– 'একদিনের জন্য পানাগড়ে আসুন ও অস্বীকার করলেও আমার কাছে সমস্ত ছবির নেগেটিভ আছে। তেমন দরকার পড়লে দেওয়া যাবে।'

প্রকাশ দাসের অন্য এক ভাই শ্রী বিভাস দাস ২৫.০৪.২০০০ এ তাঁর পাঠানো এক চিঠিতে জানাচ্ছেন– '. . .পরমকরুণাময়ের ইচ্ছায় আজ 'আনন্দবাজার' ও 'বর্তমান' পত্রিকায় রামকিঙ্করের খোয়া যাওয়া ছবির একটা খবর দেখলাম। এইবার আপনি অতি অবশ্যই পাঠকের মতামতে প্রতারক প্রকাশ দাসের কাছে কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন সবিস্তারে জানাবেন। আশা করি এবার আমাদের রাস্তা খুলে যাবে।'

পরিশেষে বলি তাঁর দু-ভাই তাঁকে চোর, প্রতারক, কুলাঙ্গার সন্তান, ঠকবাজ বলেছেন চিঠিতে। বলেছেন জাতীয় সম্পদ চুরির দায়ে শাস্তি হোক। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাও অস্বীকার করলেও আমার কাছে সমস্ত ছবির নেগেটিভ আছে। তেমন দরকার পড়লে দেওয়া যাবে। এরপরও কেন বিশ্ববিখ্যাত এক শিল্পীর অনেক বড় সংখ্যার ছবিগুলি শিল্পীর পরিবারের কাছ থেকে নিয়ে তা আত্মসাৎ করার ঘটনা ধামাচাপাই পড়ে থাকে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবে কী দুর্বলদের জন্য যা কিছু আইন এবং শাস্তির আয়োজন?





কাগজের উপর আঁকা জলরঙের ছবি



তথ্যসূত্র

১. আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র / রামকিঙ্কর বেইজ / মনফকিরা।

২. বিশ্বভারতী / শান্তিনিকেতন।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা।

৪. শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি / সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. শিল্প জিজ্ঞাসা / বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

৬. চিত্রকথা / বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

৭. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী / অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮. রামকিঙ্কর / প্রকাশ দাস।

৯. সমকালীন ভাস্কর্য / মৃণাল ঘোষ।

১০. অনন্য রামকিঙ্কর / রবি পাল।

১১. রামকিঙ্কর / বিশ্বভারতী।

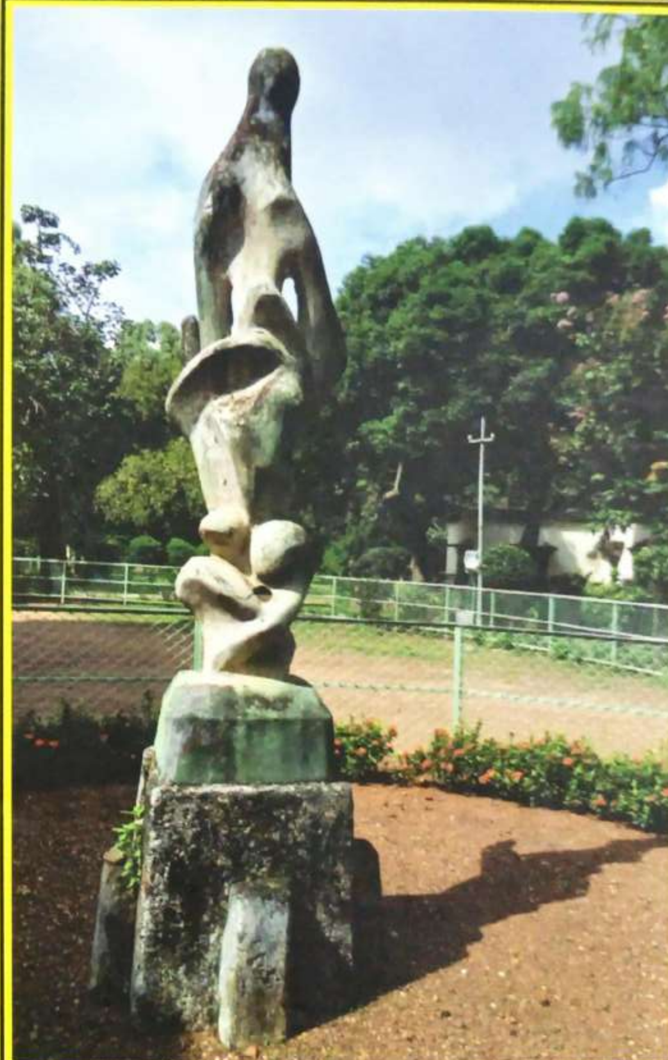
১২. Nandan / Ramkinkar Beij Centenary Number.

১৩. Ramkinkar Beij Centenary Exhibition / Nandan / Kalabhavan.



রামকিঙ্কর বেইজ-এর কাগজের উপর ড্রইং

প্রসঙ্গ ঃ রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা



শিবপ্রসাদ বেইজ

প্রসঙ্গ ঃ রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা

শিবপ্রসাদ বেইজ



ভারতীয় শিল্পকলায় আধুনিকতার প্রধান পুরুষ রামকিঙ্কর বেইজ। প্রান্তিক শহর বাঁকুড়ার এক অনাদৃত নিম্নবর্গের পরিবারে তাঁর জন্ম। শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর জীবনের যাত্রাপথ সুদূর প্রসারী হয়ে উঠেছিল। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর সাহচর্য্য রামকিঙ্করের শিল্পী মানসে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। তাঁর হাত দিয়ে সূচিত হয় ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের পরিসরে আধুনিক ভাস্কর্যের বৈপ্লবিক উদ্ভাসন। বস্তুত পক্ষে রামকিঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক চিত্রকরদের, বিশেষত ভাস্করদের মন্ত্রগুরু। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর প্রাপ্তির ঘরে জমে উঠেছিল সমবেত অজ্ঞজনেদের তাচ্ছিল্য, অবহেলা এবং অনাদর। জীবিত কালে এমনকী মৃত্যুর পরও প্রতারীত হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও তিনি বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে পড়েননি। আমৃত্যু কাল যাপন করেছেন একজন সৎ মানবিক সংবিত্তির উত্তরাধিকারী শিল্পীর জীবন। সেই ইতিহাসের বিলীয়মান রেখাটিকে খানিকটা বিস্তারে নিয়ে গেছে এই গ্রন্থটি। গ্রন্থকার রামকিঙ্করের নিকটজন– ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর বেইজের পুত্র– শিল্পীকে দেখেছেন পারিবারিক পরিবৃত্তে ঘনিষ্ট ভাবে। সেই দেখা, চেনা এবং বোঝার একটা অভিক্ষেপ এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে– যা রামকিঙ্কর চর্চার ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে আরো বিশদে নিয়ে যাবে।

ISBN : 978-93-87603-44-8

₹. 250.00